নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী



সমরজিৎ কর

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী

সমরজিৎ কর

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

প্রকাশক :

শ্রীরবীন বল

৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৮১

দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৮৩

প্রচ্ছদ : পঞ্চানন মালাকার

সংশোধিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫

সংশোধিত সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৬

নতুন মুদ্রণ 1989

মুদ্রাকর : ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও

১৮৫/১এ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রীট

কলকাতা ১২

মূল্য : ২৫.

অধ্যাপক অরুণ কুমার শর্মা, এফ এন এ শ্রদ্ধাভাজনেষু

সমরজিৎ কর



অ্যালফ্রেড বার্নহার্ড নোবেল ও নোবেল পুরস্কার ঃ

অ্যালফ্রেড বার্নহার্ড নোবেলের জন্ম সুইডেনে, ১৮৩৩ সালে। উদ্ভাবক হিসেবে তাঁর বাবার খ্যাতি ছিল। ইচ্ছে ছিল, শৈশব থেকেই ছেলেকে তিনি মনের মত করে মানুষ করবেন। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল অ্যালফ্রেডের স্বাস্থ্য। তাই শিক্ষার প্রথম পাঠ তাঁকে নিতে হয় বাড়িতে বসেই গৃহশিক্ষকদের কাছে। পরে ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে তিনি অধ্যয়ন করেন সেণ্ট পিটার্সবুর্গে এবং শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত প্রযুক্তি-বিজ্ঞানী জন এরিকসনের অধীনে।

বাবার ডিনামাইটের কারখানা। ডিনামাইটে বিস্ফোরক হিসাবে ব্যবহার করা হত তখন নাইট্রোগ্লিসারিন নামে এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ। অ্যালফ্রেড দেখলেন, অত্যন্ত বিস্ফোরক এই বস্তুটি বহন করাই একটা বড় রকমের সমস্যা। এতটুকু অসতর্ক হলে নাইট্রোগ্লিসারিনপূর্ণ ডিনামাইটে প্রায়ই বিস্ফোরক ঘটত। সমস্যাটি দূর করার জন্যে গবেষণায় হাত দিলেন তিনি। এবং শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করলেন নাইটোগ্লিসারিনকে যদি সাজিমাটি অথবা কাঠের মণ্ডের সঙ্গে মিশিয়ে রাখা যায়, বিস্ফোরণের সম্ভাবনা কম থাকে। পাহাড় পর্বত ভেঙ্গে পথঘাট করতে অথবা খনির কাজ চালাতে দরকার হত ডিনামাইট। ডিনামাইটের বিস্ফোরণে এতদিন কত শ্রমিকই না মারা গেছে। অ্যালফ্রেডের আবিষ্কার এই সমস্যাটি দূর করল রাতারাতি। মানব কল্যাণে তাঁর এই অবদান পৃথিবীতে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁকে বিখ্যাত করে তুলল। পরবর্তীকালে তিনি নানা রকম বিস্ফোরক এবং বিস্ফোরকের পলতে আবিষ্কার করেন।

বিস্ফোরক এবং বাকুর তেলের খনি এনে দিল প্রচুর অর্থ। অর্থ এল। কিন্তু জীবনে তিনি নিঃসঙ্গ। না করলেন বিয়ে, না পেলেন মনের মত বন্ধু। ফলে তাঁর মানসিকতায় এক অদ্ভুত বৈপরীত্য গড়ে ওঠে। নিকটজনকে তিনি দেখতেন ঘৃণা এবং ব্যঙ্গের চোখে, আর মনে মনে ভাবতেন ভবিষ্যৎ মানুষের কল্যাণ।

মৃত্যুর পূর্বে নব্বই লক্ষ ডলারের একটি তহবিল তৈরি করলেন তিনি। সেই সঙ্গে একটি দলিল। দলিলে বলা হল, এই অর্থ থেকে যে সুদ পাওয়া যাবে তা দিয়ে প্রতি বছর মানব-কল্যাণে যাঁরা শ্রেষ্ঠ সহযোগিতা এবং অবদানের নিদর্শন রাখবেন তাঁদের পুরস্কৃত করা হবে। বাৎসরিক সুদ সমান পাঁচ অংশে বিভক্ত করে মোট পুরস্কার দেওয়া হবে পাঁচটি বিষয়ের উপর। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসা এবং শারীরবিজ্ঞান, মানবতাবোধ উদ্রেক করতে সক্ষম এমন কোন শ্রেষ্ঠ সৃজনশীল সাহিত্য কর্ম এবং শান্তি। এই পুরস্কারই নোবেল পুরস্কার রূপে পরিগণিত হল।

ঠিক হল, পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়নের পুরস্কার দুটি দেবেন সুইডিস অ্যাকাডেমি অব্ সায়ান্সেস, শরীর এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর পুরস্কার দেওয়ার দায়িত্ব রইল স্টকহোমের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউটের উপর। সাহিত্যের পুরস্কারটি দেবেন স্টকহোমের অ্যাকাডেমি এবং শান্তির উপর পুরস্কার প্রাপক কে হবেন তা নির্বাচনের ভার রইল নরওয়ের লোকসভা কর্তৃক নির্বাচিত পাঁচজন সদস্যের উপর।

১৮৯৬ সালে নোবেল পরলোকে গমন করলেন। আর জানুয়ারী ১৮৯৭ সালে নোবেলের দলিলটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা ক্ষুব্ধ হলেন। এ নিয়ে যথেষ্ট বিতণ্ডা এবং আদালতও হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হেরে গেলেন তাঁরা। এর তিন বছর পর জুন, ১৯০০ সালে স্থাপিত হল নোবেল ফাউণ্ডেশন। নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তন হল ১৯০১ সালে। ১০ ডিসেম্বর নোবেলের মৃত্যু দিবস। ঠিক হল, প্রতি বছর এই ১০ ডিসেম্বর তারিখে প্রাপকদের হাতে নোবেল পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। সেই থেকে এই নিয়ম এখনও বজায় রয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯০১ সালে পদার্থবিজ্ঞানের প্রথম নোবেল পুরস্কারটি পেয়েছিলেন একস রশ্মির আবিষ্কারক ভিলহেল্ম কনরাড রয়েন্টগেন।

দলিলে বলা হয়েছে, একমাত্র জীবিত কৃতীজনের হাতেই যেন নোবেল পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এবং একই বিষয়ের উপর পুরস্কার তিন জনের বেশি কাউকে দেওয়া হবে না। পুরস্কার ঘোষণার আগে প্রতি বছর শরৎকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ৬৫০ জন বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠান হয় অনুরোধ পত্র। তাঁদের মধ্যে থাকেন রয়েল সুইডিস অ্যাকাডেমি অব্ সায়ান্সের সদস্যবৃন্দ, নোবেল কমিটির পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়ন শাখার সদস্যবৃন্দ, অতীতে পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়নে যাঁরা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাঁরা, সুইডেনের আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়ন বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দ, এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং গবেষণাগারের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। ওঁদের মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে থেকে পুরস্কারের জন্যে নির্বাচনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন 'নোবেল কমিটি'। 'খুবই শক্ত কাজ,' মন্তব্য করেছেন নোবেল কমিটির জনৈক সদস্য। 'কৃতিত্বের দিক দিয়ে কে শ্রেষ্ঠতম সেটা ব্যাখ্যা করা শক্ত। অতএব বিকল্প পথ যেটা আমাদের খোলা থাকে সেটা হল, যাচাই করে দেখা, কে সর্বাঙ্গীণভাবে এই পুরস্কারটি পেতে পারেন।'

বর্তমান গ্রন্থে ১৯৬৯ থেকে ১৯৮০ সাল, এই বারো বছরে বিজ্ঞানে যাঁরা নোবেল পুরস্কারে বৃত হয়েছেন, তাঁদের অবদানই সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। উদ্দেশ্য সাম্প্রতিক কালে যারা পুরস্কৃত হয়েছেন পাঠক-পাঠিকাদের তাঁদের কাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। আধুনিক বিজ্ঞানে তাঁদের অবদান এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। কয়েকটি ছাড়া এই গ্রন্থে সঙ্কলিত বেশিরভাগ রচনাই 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান গ্রন্থে কিছুটা পরিমার্জিত করে সেই রচনাগুলিও সংযোজিত হল।

প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, শৈব্যার প্রকাশক আমার স্নেহভাজন শ্রী রবীন বলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তিনি নিয়মিত চাপ না দিলে রচনাগুলি হয়ত আমি ফেলেই রাখতাম। সংকলনটি প্রকাশের ব্যাপারে তিনিই অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই সঙ্গে কলকাতার সাহা ইনসটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের গ্রন্থাগারিক শ্রী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছেও আমি ঋণী। বিভিন্ন সময়ে গ্রন্থটির উপাদান সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন।

পাঠক-পাঠিকাদের ভাল লাগলে আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

রবীন্দ্রনগর, ডানকুনি, হুগলী। সমরজিৎ কর

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে যে 'নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী'র সমস্ত কপি নিঃশেষিত হবে, ভাবতে পারি নি। দ্বিতীয় সংস্করণে কিছুটা পরিমার্জন করেছি। সেই সঙ্গে যুক্ত করেছি ১৯৮১ ও '৮২ সালে যাঁরা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের অবদান। আশা করি, পরিমার্জিত এই সংস্করণ পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আরও ভাল লাগবে।

জানুয়ারি, ১৯৮৩ সমরজিৎ কর

সংশোধিত সংস্করণ প্রসঙ্গে

ইতিমধ্যে আরও দুটি বছর পার হয়ে গেছে। নোবেল পুরস্কারে বৃত হয়েছেন আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী যাদের জীবন ও গবেষণার কথা আলোচনা না করলে এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ হবে না। পাঠক ও প্রকাশকের তাগিদে ১৯৮৩ ও '৮৪ সালের নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীদের কথা যুক্ত হল, যা অনিবার্যভাবেই পাঠক-পাঠিকাদের ভাল লাগবে বলে আমার বিশ্বাস।

সমরজিৎ কর

সূচীপত্র



নোবেল পুরস্কার ১৯৬৯

পদার্থ বিজ্ঞান

কোন কোন পদার্থবিজ্ঞানীর ভূমিকা যেন জ্যোতিষীর মত। গবেষণা বলতে সাধারণ মানুষ বোঝে জটিল যন্ত্রপাতি। সেই সব যন্ত্রপাতির সাহায্যে চলবে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তারপর সিদ্ধান্ত। আর সেই সিদ্ধান্ত থেকেই তো সৃষ্টি এক একটি তত্ত্বের। অজানা ঘটনাবলী কী হতে পারে, সার্থক জ্যোতিষের মতই আগ বাড়িয়ে বলে দিতে সমর্থ হয়েছেন তাঁরা। তত্ত্ব তৈরী করেছেন আগে, তত্ত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে পরে।

যেমন, আইনস্টাইন। ১৯০৫ সালে শুধু অঙ্ক এবং ছক কষে সৃষ্টি করলেন তিনি তাঁর আপেক্ষিকবাদ। এই তত্ত্বে বলা হলো, আলোক রশ্মি মাধ্যাকর্ষণের টানে প্রভাবিত হয়। সাধারণ অবস্থায় আলো সরল রেখায় গমন করলেও, মাধ্যাকর্ষণের টানে তার গতিপথ বেঁকে যায়। প্রচলিত বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণায় এ ধরনের তত্ত্ব অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়েছিল। প্রচণ্ড বিতর্কের ঝড় সইতে হয়েছিল আইনস্টাইনকে। যদিও পরীক্ষালব্ধ ফলাফল ছাড়াই এ সম্পর্কে স্থির নিশ্চয় ছিলেন তিনি। এই তত্ত্বের বাস্তবতা প্রমাণ করার জন্যে বিজ্ঞানীদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল ১৯১৯ পর্যন্ত। ওই বছর আর্থার এডিংটন প্রমাণ করলেন, আইনস্টাইন যা বলেছেন, সেটা ঠিক। অথবা লুই দ্য ব্রগলি। তিনিও ওই কাগজ পেনসিলের সাহায্যেই একটি তত্ত্ব দাঁড় করান। এই তত্ত্বে বলা হয়, শুধু আলো এবং শব্দ নয়, সাধারণ বস্তু বলতে আমরা যা বুঝি, তার মধ্যেও তরঙ্গ সৃষ্টিকারী ধর্ম বর্তমান। অর্থাৎ বস্তুও তরঙ্গের মত আচরণ করতে পারে। তত্ত্বটি আবিষ্কারের তিন বছর পর তার বাস্তবতা প্রমাণ করেন সি. জে. ডেভিসন এবং এল. গেরমার। ভলভগ্যাং পাউলি নিউট্রন কণার অস্তিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন, পি. এ. এম. ডিরাক বলেছিলেন অ্যান্টি-পারটিকল্ বা প্রতি বস্তুকণার সম্ভাব্যতার কথা। অথবা এইচ. ইউকাওয়ার তত্ত্বে পাই মেসন নামক পারমাণবিক কণার বাস্তব রূপ। সবই প্রায় জ্যোতিষী গণনার মত। 'এমনটি হবে'—ওঁরা বলেছেন আগে। তা যে সত্য পরবর্তীকালে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। বলা বাহুল্য;

পদার্থ বিজ্ঞানে অসাধারণ কৃতিত্বের দরুন ১৯৬৯ সালে যিনি নোবেল পুরস্কার অর্জনে সমর্থ হন, গবেষণার এই ধারা তাঁর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তিনি অধ্যাপক মারে গেলমান।

নোবেল পুরস্কারের কথা যখন ঘোষণা করা হলো, মারে গেল-মানের তখন বয়েস চল্লিশ বছর মাত্র। ক্যালিফোর্নিয়া ইনসটিটিউট অভ্ টেকনোলজির পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক। ইতিমধ্যে বিশ্ববিশ্রুত। নোবেল কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়ঃ বিক্ষিপ্ত-ভাবে এ পর্যন্ত যে সব পারমাণবিক কণার সন্ধান পাওয়া গেছে, গেল-মানের তত্ত্ব এবং বিশ্লেষণ তাদের শ্রেণী-বিভাগ করতে সাহায্য করেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন পারমাণবিক কণার পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া এবং সম্পর্কের উপর নতুন ভাবে আলোকপাতও করেছেন তিনি। এই অসামান্য কৃতিত্বের জন্যেই মারে গেল-মানকে নোবেল পুরস্কারে বৃত করা হলো।

গেল-মানের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখেছিলেন ডঃ জেরাল্ড এল. উইক্ প্রখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা 'নিউ সায়ানটিস্ট'-এ। প্রবন্ধটির শিরোনাম 'স্ট্রেঞ্জনেস, কোয়ার্ক'স অ্যান্ড এইট ফোল্ড্ ওয়ে'। 'নিউ সায়ানটিস্টের' ৬ নভেম্বর, ১৯৬৯ সংখ্যায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধে ডঃ উইক্ মন্তব্য করেন, গেল-মানের কৃতিত্ব, 'স্ট্রংফোর্স' বা প্রবল বল সমন্বিত ক্ষেত্রে যে সব পারমাণবিক কণা বিক্রিয়া করার ক্ষমতা রাখে, তাদের তিনি চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর তত্ত্ব ওই সব কণিকার সংগতিপূর্ণ চরিত্র বা 'সিমেট্রি' সম্পর্কে বলিষ্ঠতর ব্যাখ্যো যুগিয়েছে। সন্ধান দিতে সমর্থ হয়েছে 'ওমেগা মাইনাস' নামক এক ধরনের পারমাণবিক কণার। "This work is lebelled the 'principle of unitary symmetry' or 'SU (3 symmetry' or the 'eight fold way'। এই 'eight fold way' বা অষ্টমার্গ আবিষ্কারের পূর্বে একশ'রও বেশি পারমাণবিক কণার সন্ধান দিয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। গেল-মানের তত্ত্ব ওই সব কণাদের শ্রেণী বিভাগ করতে সমর্থ হয়েছে। এই শ্রেণী-বিভাগ পরে অনাবিষ্কৃত পারমাণবিক কণার অস্তিত্ব এবং তাদের অজ্ঞাত চরিত্র সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করার পথ দেখিয়েছে।

'স্ট্রংফোর্স' বা প্রবল বল বলতে আমরা কী বুঝি? পারমাণবিক কণা বলতেই বা কাদের বোঝায়? এবং সবচেয়ে বড় কথা, অষ্টমার্গের সঙ্গে পারমাণবিক কণাগুলির সম্পর্কই বা কী?

পদার্থবিজ্ঞানীরা মনে করেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ বস্তু কণা থেকে শুরু করে গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতির সৃষ্টি, রূপান্তর, কার্যকারণ এবং ধ্বংসের মূলে কাজ করে চার রকম বল বা ফোর্স। এরা হলো, মাধ্যাকর্ষণ, উইক ফোর্স বা দুর্বল বল, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক বা তড়িৎ চৌম্বক বল এবং স্ট্রংফোর্স বা প্রবল বল। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক যে আকর্ষণ বল কাজ করে, তাকে বলা হয় মাধ্যাকর্ষণ। এই বল আছে বলেই, একটি ঢিলকে ঊর্ধ্বাকাশে উৎক্ষেপ করলে আবার তা পৃথিবীর বুকে নেমে আসে। গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রের আবর্তন থেকে শুরু করে সমুদ্রের বুকে জোয়ার-ভাটা সৃষ্টি—মাধ্যাকর্ষণ বলই এ সবের জন্য দায়ী। যদিও চারটি বলের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ বলই

দুর্বলতম। বিদ্যুৎ এবং চৌম্বক শক্তির পারস্পরিক সমন্বয়ে যে বলের সৃষ্টি তাকে বলা হয় তড়িৎ-চৌম্বক বল। আলো, বেতার তরঙ্গ প্রভৃতি সৃষ্টির পেছনে এই বলটি কাজ করে। আবার যে বলের প্রতিক্রিয়ায় কোন মৌলিক পদার্থ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছুটা শক্তি ক্ষরণ করে স্থিতিশীল মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়, তাকে বলা হয় 'উইক ফোর্স' বা দুর্বল বল। যেমন ধরুন, থোরিয়াম থেকে বিটা রশ্মি বা ইলেকট্রন ক্ষরিত হয় এবং সেই ক্ষরণের ফলে থোরিয়াম রূপান্তরিত হয়ে তৈরি করে এক ধরনের আইসোটোপ। নাম প্যালাডিয়াম। দুর্বল বলের দরুনই এমনটি ঘটে থাকে।

তুলনায় স্ট্রংফোর্স বা প্রবল বলের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী। এই বলটির অস্তিত্ব একমাত্র পরমাণুর নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরেই ধরা পড়ে। এই বলের প্রভাবেই নিউক্লিয়াসের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন কণা। সব কয়টি বলের মধ্যে এটিই প্রবলতম বল। পারমাণবিক শক্তির মূলে এই বলটিই কাজ করে।

স্বতঃসিদ্ধের মতই এক সময় ধরে নেওয়া হয়েছিল, পরমাণুই পদার্থের অভিন্ন অবস্থা। পরমাণুকে কখনও ভাঙ্গা যায় না। এবং ভাঙ্গলে পদার্থের কোন অস্তিত্ব বজায় থাকে না। পরবর্তীকালে জানা গেল, এই তথ্য ভুল। জানা গেল, পরমাণু পদার্থের অখণ্ড দশা নয়। আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা দিয়ে তৈরি মৌলিক পদার্থের এক একটি পরমাণু। এই কণিকারা হলো ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন। ইলেকট্রন ঋণাত্মক বিদ্যুৎধর্মী কণা। এর ওজন আছে, নির্দিষ্ট আধান আছে। পরমাণুর চেহারাটা সৌরমণ্ডলের মত। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস যেমন সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রে থাকে সূর্য। সূর্যকে কেন্দ্র করে যেমন গ্রহগুলি পরিক্রমণ করে, ঠিক তেমনি নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে নিউক্লিয়াসের চার পাশে পরিক্রমণ করে ইলেকট্রন। প্রোটন এবং নিউট্রন থাকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে। প্রোটনে থাকে ধনাত্মক বিদ্যুৎ আধান। তুলনায় নিউট্রন বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ কণা। ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রনের ওজন আছে। ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন—এদের সবাইকেই বলা হয় পারমাণবিক কণা। এই সব কণা আবিষ্কারের পর, বিজ্ঞানীরা মনে করলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ মৌলিক পদার্থ সৃষ্টির পেছনে কাজ করে এই তিনটি কণা। নির্দিষ্ট সংখ্যক ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রনের সমন্বয়ে তৈরি হয় এক একটি মৌলিক পদার্থ।

কিন্তু, না। বস্তু জগতের মূল উপাদান যে শুধু ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন নয়, সেটা জানা গেল পরে। ১৯২৯ সালে নোবেল বিজ্ঞানী পি. এম. ডিরাক তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রমাণ করলেন, পরমাণুর মধ্যে আরও এক ধরনের কণা থাকা সম্ভব। যার ভর ইলেকট্রনের ভরের অনুরূপ। যেটুকু অমিল সেটা হলো, ইলেকট্রনে থাকে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ আধান, কিন্তু ওই শেষোক্ত কণায় থাকে ধনাত্মক বিদ্যুৎ আধান। চরিত্রে এই কণা যেন ইলেকট্রনেরই প্রতিবিম্ব। ডিরাক এই কণার নাম দিলেন 'অ্যান্টিপারটিকল' বা প্রতি-পারমাণবিক কণা।

ডিরাকের তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার পর পদার্থবিজ্ঞানী মহলে তুমুল বিতর্কের ঝড়

উঠেছিল। অনেকে তখন মন্তব্য করেছিলেন, ডিরাকের এই ধারণা একটা পাগলামী ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু ১৯৩১ সালে বিতর্কের উপর যবনিকা পড়লো। ওই বছর প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের সাহায্যে মার্কিন বিজ্ঞানী কার্ল অ্যানডারসন প্রমাণ করলেন, ডিরাক ভুল করেন নি। ইলেকট্রনের প্রতি-পারমাণবিক কণার অস্তিত্ব মিথ্যে নয়। এই কণাটির নাম দেওয়া হয় 'পজিট্রন'। পরবর্তীকালে আরও একাধিক প্রতি-পারমাণবিক কণা আবিষ্কৃত হয়েছে। দেখা গেল প্রোটনেরও প্রতি পারমাণবিক কণা আছে। যার নাম রাখা হলো 'অ্যান্টি-প্রোটন'। প্রোটনে থাকে ধনাত্মক বিদ্যুৎ আধান, আর অ্যান্টি-প্রোটনে থাকে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ আধান। পাওয়া গেল অ্যান্টি-নিউট্রন এবং আরো নানা রকম অ্যান্টি-পারটিকল্।

বস্তুত পরমাণু যে অখন্ডনীয় নয়, সে সম্পর্কে পরীক্ষালব্ধ প্রমাণটি দাঁড় করান প্রখ্যাত বৃটিশ বিজ্ঞানী আরনেস্ট রাদারফোর্ড। সেটা ১৯১১ সাল। ওই বছর নিজের গবেষণাগারে পরীক্ষা চালিয়ে তিনি প্রমাণ করেন, পরমাণুর কেন্দ্রে আছে নিউক্লিয়াস। আর সেই নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে তার চার পাশে পরিক্রমণ করে ইলেকট্রন কণা। পরবর্তীকালে দেখা গেল নিউক্লিয়াসও 'একম্ অদ্বিতীয়ম' নয়, নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে আরও দু'ধরনের কণা। প্রোটন এবং নিউট্রন। এবং অবশেষে আবিষ্কৃত হলো, প্রোটন এবং নিউট্রনও মৌলিক কণা নয়। এরা সৃষ্ট হয়েছে আরও নানা রকম কণার মিলনে। তাদের বলা হয় মৌল কণা অথবা 'এলিমেন্টারি পারটিকল্স'। উল্লেখ করা যেতে পারে গত কয়েক দশকে একশ'রও বেশি মৌলিক কণা আবিষ্কৃত হয়েছে।

এই আবিষ্কার পদার্থবিজ্ঞানীদের কৌতূহলী করে তুললো। প্রশ্ন উঠলো তখন ঃ এই যদি অবস্থা গিয়ে দাঁড়ায়, অখন্ডের মাঝখানে যদি থাকে সহস্রের অস্তিত্ব, তাহলে মূল অস্তিত্বটির স্বরূপটি কেমন দাঁড়াবে ? ইলেকট্রন যে মৌলিক কণা, তাকে ভাঙ্গা যায় না, এটা প্রমাণিত হলো। কিন্তু প্রোটন এবং নিউট্রন ? অথবা অনুরূপ অন্য কোন কণা—যাদের আমরা অখন্ডনীয় নয় বলে দেখতে পাচ্ছি, তাদের মূল স্বরূপটি কেমন ? এমন কি কোন অখন্ডনীয় কিছু আবিষ্কার করা যায় না যাকে সামনে রেখে আমরা বলতে পারি—হ্যাঁ, এই হলো সৃষ্টির আদিস্বরূপ। একম্ অদ্বিতীয়ম্ ? এই একম্ অদ্বিতীয়ম থেকেই বিশ্বব্রহ্মান্ডের তাবৎ বস্তু জগৎ সৃষ্ট হয়েছে ?

উত্তর একটা পাওয়া গেল। উত্তর দিলেন দুজন। ১৯৬২ সালে। ওঁদের মধ্যে একজন মারে গেল-মান। ক্যালিফোর্নিয়া ইনসটিটিউট অভ্ টেকনোলজির অধ্যাপক। অপর জন তেল-আভিভ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ইউভাল নেমান। ১৯৬২ সালে তাঁরা পৃথক পৃথক ভাবে একটি তত্ত্ব দাঁড় করালেন। এই তত্ত্বে বলা হলো, প্রোটন এবং নিউট্রনের মত কণারা মুখ্যতঃ তিন রকম মৌলিক কণা দিয়ে তৈরি। গেল-মান কণাগুলির নাম রাখলেন 'কোয়ার্ক্স'। তাঁর মতে কোয়ার্ক্স সরলতম মৌল কণা। বলা বাহুল্য এদের মধ্যে অ্যান্টি-কোয়ার্ক্সও পড়ে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, কণা-পদার্থবিজ্ঞানীরা পারমাণবিক কণাগুলিকে ব্যাপক-

ভাবে দ্বটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। প্রথমটির নাম 'হ্যাড্রনস'। প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি এই 'হ্যাড্রনস' শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। এই সব কণা 'স্ট্রংফোর্স' বা প্রবল-বলের সান্নিধ্যে প্রতিক্রিয়া করে। দ্বিতীয় শ্রেণীটির নাম 'লেপটনস'। এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে ইলেকট্রন এবং ইলেকট্রন-নিউট্রিনো, মিউওন এবং মিউওন-নিউট্রনো ; এবং এ ছাড়া এদের চারটি অ্যান্টি-পারটিকল্‌। প্রবল-বল জনিত ক্ষেত্রের মধ্যে লেপটন কণারা কোন পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া করে না। প্রতিক্রিয়া করে তড়িৎ-চৌম্বক বলের সান্নিধ্যে।

বিজ্ঞানীরা অবশ্য আরও দ্বই রকম কণার সন্ধান দিয়েছেন, তত্ত্বের উপর নির্ভর করে। এরাও লেপটনেরই মত স্ট্রং-ফোর্স-এ নিষ্ক্রিয়। এরা হলো দ্বই রকম নিউট্রিনো। এরা স্ট্রং-ফোর্স এবং তড়িৎ-চৌম্বক বল কোনটির দ্বারাই প্রভাবিত হয় না, একমাত্র দ্বর্বল-বল বা উইক-ফোর্সের মধ্যে পড়লে এরা প্রতিক্রিয়া করতে পারে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, লেপটনরা মৌল-কণা। যেমন, ধর্ন, ইলেকট্রন। প্রচন্ড শক্তি দিয়ে আঘাত করেও (যা পারটিকল্‌ অ্যাকসেলেটার বা ত্বারক যন্ত্রের সাহায্যে করা হয়ে থাকে) ইলেকট্রন কণাকে ভাঙ্গা সম্ভব হয় নি। অমন অবস্থাতেও ইলেকট্রন কণারা এক বিন্দ্ব আধানের মতই আচরণ করে। তাদের ভেতরে অন্য কোন সামগ্রী আছে বলে দেখা যায় নি।

তুলনায় হ্যাড্রন কণাদের গঠন ভঙ্গিমাকে জটিল বলেই মনে হয়েছে। প্রথমত, এরা আয়তনে লেপটনের চেয়ে অনেক বড়। এক একটি হ্যাড্রন কণার ব্যাস ১০-১৩ সেণ্টিমিটার। দ্বিতীয়ত, প্রোটন এবং অ্যাণ্টি-প্রোটন ছাড়া অবশিষ্ট হ্যাড্রন কণাদের অস্তিত্ব খ্বই অস্থায়ী। স্বতঃস্ফ্র্তভাবে শক্তি ক্ষরণ করে তারা র্পান্তরিত হয় নানা রকম কণায়। এদের মধ্যে আছে ইলেকট্রন, নিউট্রিনো, ফোটন (আলোক কণা) প্রভৃতি।

হ্যাড্রনকেও আবার শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে। মোট তিনটি শ্রেণী। যাদের বলা হচ্ছে এক একটি পরিবার। পরিবারগ্বলির নাম বেরিওনস্‌, অ্যাণ্টি-বেরিওনস্‌ এবং মেসনস্‌। বেরিওন পরিবারের মধ্যে পড়ে প্রোটন এবং নিউট্রন। মেসনস-এর মধ্যে পাইওন প্রভৃতি কণারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এই সব কণার বৈদ্যুতিক আধানের দশা বা 'চাজ' স্টেট'-এর কথা কল্পনা করে হ্যাড্রন কণাদের তিনটি সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। বেরিওন-এর ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটি হল +১ ; অ্যাণ্টি-বেরিওনের ক্ষেত্রে −১ এবং মেসনের ক্ষেত্রে ০ (শ্ন্য)।

হ্যাড্রনগ্বলিকে প্থক করা হলো আর এক ধরনের ছোট ছোট পরিবার হিসেবে। যাদের নাম দেওয়া হলো 'চাজ' মালটিপ্লেট্‌স'। ধরে নেওয়া হলো প্রতিটি মালটিপ্লেটের মধ্যে থাকবে এমন ধরনের কণা, যাদের ভর মোটাম্বটি ভাবে সমান। সমস্ত ধর্ম, যেমন আবর্তন-বেগ, শক্তি প্রভৃতিও হবে একই রকম। একমাত্র তড়িৎ-আধানের দিক দিয়ে তারা একে অন্য থেকে প্থক হতে পারে। এক একটি মালটিপ্লেটের সদস্য সংখ্যা ১, ২, ৩ অথবা ৪ হতে পারে। যেমন ধর্ন প্রোটন এবং নিউট্রন। এই দ্বইটি কণা

মিলিতভাবে তৈরি করে একটি 'মালটিপ্লেট'। যাকে 'ডাবলেট'ও বলা হয়। আবার পাইওন বলতে বোঝাবে একটি 'ট্রিপলেট'।

১৯৬২ সালে মারে গেল-মান এবং ইউভাল নেমান পৃথক পৃথকভাবে উপস্থাপন করলেন আর এক ধরনের মালটিপ্লেট যাদের বলা হলো 'সুপার-মালটিপ্লেটস'। আসলে মালটিপ্লেটগুলিকেই নতুন ভাবে বিন্যাস করলেন তাঁরা সুপার-মালটিপ্লেট হিসেবে। এক্ষেত্রে হ্যাড্রন কণাদের সমধর্মীগুণ ছাড়াও, তাদের পারস্পরিক তড়িৎ আধান এবং পৃথক পৃথক ধর্মের কথাও ধরা হলো। এ ধরনের শ্রেণী বিন্যাস করতে গিয়ে ধরে নিতে হয় আটটি 'কোয়াণ্টাম নাম্বার' বা কোয়াণ্টাম সংখ্যা। যাদের ওঁরা বললেন 'এইট ফোল্ড ওয়ে' বা অষ্টমার্গ। মৌল-কণাদের সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে এই ধরনের কল্পনাকে গেল-মান তুলনা করেন বৌদ্ধ শাস্ত্রের সেই অষ্টমার্গেরই সঙ্গে। সেই আটটি উপদেশ। ভিক্ষুদের প্রতি ভগবান বুদ্ধের উপদেশ ঃ হে ভিক্ষুবৃন্দ, যে আটটি পথ অবলম্বন করলে মানুষ পরম সত্যে উপনীত হয় এবং মোক্ষ লাভ করে তারা হলো ঃ সৎ আকাঙ্ক্ষা, সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য, সৎ কর্ম; সৎ জীবন, সৎ চেষ্টা, সৎ মন এবং সৎ অভিনিবেশ। গেল-মান এবং নেমানের এই অষ্টমার্গ তত্ত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন 'লি গ্রুপ' (Lie group) এবং লি বীজগণিত। এই বীজগণিতের আবিষ্কর্তা নরওয়ের গণিতজ্ঞ সোফাস লি (১৯ শতাব্দী)। লি গ্রুপের যে অংশ তত্ত্ব তৈরি করতে সাহায্য করেছে তার নাম SU(3) ম্যাট্রিক্স। এই তত্ত্বে বলা হলো যাবতীয় হ্যাড্রন কণা SU(3) গ্রুপের দ্বারা সূচিত করা সম্ভব। প্রতিটি পরিবারে থাকবে একটি, তিনটি, ছয়টি, আটটি, দশটি অথবা তারও বেশি ভিন্ন ভিন্ন কণা। বলা হলো, 'এইট ফোল্ড ওয়ের' মধ্যে সমস্ত হ্যাড্রন কণা পড়বে। তাদের প্রত্যেকের ভর হবে সমান। 'সমান' শব্দটির সামনে পরে 'প্রায়' কথাটা জুড়ে দেওয়ার অবশ্য প্রয়োজন রয়েছে।

১৯৬২ সালে এই অষ্টমার্গের উপরে নির্ভর করে গেল-মান এবং জর্জ জ্বিবিগ (Zweig) পৃথক পৃথক ভাবে নতুন একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করলেন। এই প্রস্তাবে বলা হলো, যাবতীয় হ্যাড্রন এমন তিন রকম কণা দিয়ে তৈরি, চরিত্রের দিক দিয়ে যারা অনেক বেশি মৌলিকত্ব দাবি করতে পারে। গেল-মান এই কণাগুলির নাম রাখলেন 'কোয়ার্কস'। ধরে নেওয়া হলো কোয়ার্করা ঠিক প্রোটন, নিউট্রনের মত মামুলি পরিবার ভুক্ত নয়। কোয়ার্কদের নিজস্ব একটি পরিবার আছে। এই পরিবারে আছে তিনটি কোয়ার্ক। অবশ্য তিনটি অ্যাণ্টি-কোয়ার্ক সমন্বিত অপর একটি পরিবারের কথাও এই সঙ্গে ধরে নেওয়া হলো।

সবই তত্ত্বের ব্যাপার। পরীক্ষা লব্ধ প্রমাণ নেই। প্রমাণ একমাত্র আঙ্কিক যুক্তি। প্রশ্ন দাঁড়ালো ঃ কেমন দাঁড়াবে এই কোয়ার্ক কণাদের চরিত্র ?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হলো, কোয়ার্কের চরিত্র বিচিত্র। এতদিন আধান সমন্বিত যে সব কণাদের বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হয়েছেন, দেখা গেছে, তাদের আধানের পরিমাণ, হয় একটি ইলেকট্রনের আধানের সমান, অথবা একটি ইলেকট্রনে যতটা আধান থাকে তার ২, ৩ প্রভৃতির গুণিতক। সেখানে ভগ্নাংশ পরিমাণ আধানের

অস্তিত্ব ধরা পড়ে নি। কিন্তু কোয়ার্ক কণায় ইলেকট্রনের ভগ্নাংশ পরিমাণ আধানের অস্তিত্বের কথা ধরে নেওয়া হলো। গেল মান তিনটি কোয়ার্ক কণাকে চিহ্নিত করলেন ইংরেজী ভাষার তিনটি বর্ণের দ্বারা। এরা হলো u, d এবং s। u বলতে up, d বলতে down এবং s বলতে ধরে নেওয়া হলো side ways. অর্থাৎ কণাগুলি ওই ভাবে অবস্থান করে।

গেল-মান বললেন, এই তিনটি কোয়ার্ক কণা দিয়েই তৈরি যাবতীয় হ্যাড্রন কণা। বললেন, মেসন কণা তৈরি একটা কোয়ার্ক এবং একটি অ্যান্টি কোয়ার্ক-এর সমন্বয়ে। সমস্ত বেরিওন তৈরি হয়েছে তিনটি কোয়ার্কের মিলনে। অ্যান্টি-বেরিওনস্ সৃষ্টির মূলে রয়েছে তিনটি অ্যান্টি-কোয়ার্ক কণা। গেল-মানের এই তত্ত্ব ওই সময় পর্যন্ত আবিষ্কৃত যাবতীয় হ্যাড্রন কণার সৃষ্টি রহস্যকে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছিল।

আগেই বলেছি, যাবতীয় হ্যাড্রন কণাকে তিনটি পরিবারে বিভক্ত করা হয়েছে। বেরিওন্স, অ্যান্টি-বেরিওন্স এবং মেসন্স; এবং এদের চার্জ-স্টেট বা বৈদ্যুতিক আধান-রূপটি প্রকাশ করা হয় তিনটি সংখ্যার সাহায্যে। সংখ্যা তিনটি যথাক্রমে +১, —১ এবং ০। ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম : হ্যাড্রন কণারা ভগ্নাংশ আধান সমন্বিত কণা কোয়ার্ক এবং অ্যান্টিকোয়ার্ক দিয়ে তৈরি। তত্ত্ব অনুযায়ী হ্যাড্রন কণাদের কারোর মধ্যে আধান থাকবে +১, কারোর মধ্যে −১ অথবা কারোর মধ্যে ০। যদি এক একটি হ্যাড্রন কণা দুই বা তিনটি ভগ্নাংশ আধান সমন্বিত কণা দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে, তা হলে মিলিত অবস্থায় তাদের মোট আধানের মান নিশ্চয় +১, −১ এবং ০ হবে? যদি তা না হয়, বস্তুর শক্তি অবিনাশিতা সূত্র বা 'ল অভ্ কনজারভেশন অভ্ এনার্জি' বিঘ্নিত হবে।

এ কথা ভেবে গেল-মান কোয়ার্ক কণাদের ক্ষেত্রেও কল্পনা করে নিলেন বিশেষ মানের বেরিওন সংখ্যা। তিনি বললেন, প্রতিটি কোয়ার্কের বেরিওন সংখ্যা $\frac{১}{৩}$ এবং প্রতিটি অ্যান্টি কোয়ার্কের বেরিওন সংখ্যা $-\frac{১}{৩}$। অতএব এ ক্ষেত্রে যখনই কোয়ার্ক কণারা মিলিত হয়ে একটি হ্যাড্রন কণা সৃষ্টি করবে তখন সেই হ্যাড্রনের বেরিওন সংখ্যা দাঁড়াবে কোয়ার্ক কণাদের বেরিওন সংখ্যার যোগ ফলের সমান। যেমন বেরিওন কণা সৃষ্টির জন্যে দরকার তিনটি কোয়ার্ক। এই তিনটি কোয়ার্কের প্রত্যেকের বেরিওন সংখ্যা $\frac{১}{৩}$, $\frac{১}{৩}$ এবং $\frac{১}{৩}$। অতএব তারা মিলিত হয়ে যখন একটি বেরিওন কণা সৃষ্টি করবে তখন ওই কণার বেরিওন সংখ্যা হবে $\frac{১}{৩}+\frac{১}{৩}+\frac{১}{৩}$ অর্থাৎ +১। ঠিক তেমনি একটি অ্যান্টি বেরিওন কণা তৈরি হয় তিনটি অ্যান্টি-কোয়ার্কের মিলনে, এক্ষেত্রে অ্যান্টি-বেরিওনের বেরিওন হবে $(-\frac{১}{৩}+(-\frac{১}{৩})+(-\frac{১}{৩}$ অর্থাৎ −১। একটি মেসন কণা তৈরি হয় একটি কোয়ার্ক এবং একটি অ্যান্টি-কোয়ার্কের মিলনে। অতএব মেসনের বেরিওন সংখ্যা দাঁড়ালো $(+\frac{১}{৩})+(-\frac{১}{৩})$ অর্থাৎ ০।

গেল-মান বললেন, u কোয়ার্কের বিদ্যুৎ আধানের পরিমাণ $+\frac{২}{৩}$ এবং d কোয়ার্কের বিদ্যুৎ আধানের পরিমাণ $-\frac{১}{৩}$। ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ হ্যাড্রন কণা এই u এবং d-র সাহায্যে প্রকাশ করা যায়।

যেমন ধরুন, প্রোটন। একটি প্রোটনে আছে দুইটি u কোয়ার্ক এবং একটি d কোয়ার্ক। অতএব প্রোটনের গঠনটি আমরা 'uud' দ্বারা প্রকাশ করতে পারি। এ ক্ষেত্রে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে প্রোটনের মোট বিদ্যুৎ আধান ($\frac{2}{3}+\frac{2}{3}-\frac{1}{3}$) অর্থাৎ +১ এর সমান। প্রোটন হ্যাড্রন পরিবারের মধ্যে পড়ে। যার বেরিওন সংখ্যা হচ্ছে +১। উল্লেখ্য, s কোয়ার্ক এর প্রয়োজন হয় একমাত্র বিশেষ এক ধরনের কণার জন্যে। এই কণাদের বলা হয় 'স্ট্রেঞ্জ পারটিকলস'। একটি 'স্ট্রেঞ্জ' কণায় থাকে কম করেও একটি s কোয়ার্ক অথবা তার অ্যান্টি কোয়ার্ক।

অর্থাৎ ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো এই রকম ঃ s এক একটি মৌলিক কণা। যেন রসায়ন শাস্ত্রের এক একটি মৌলিক পদার্থ। গেল-মান তাঁর 'অষ্টমার্গ' তত্ত্ব এবং কোয়ার্ক কণার সাহায্যে মৌল-কণাদের পারস্পরিক বিক্রিয়া এবং চরিত্রের একটি যুক্তি-নির্ভর ব্যাখ্যা যোগাতে সমর্থ হলেন। এবং সেই ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে তৈরি করলেন অভূতপূর্ব একটি 'সারণী' বা 'টেবল্'। এই 'টেবল্' সোভিয়েত বিজ্ঞানী দিমিত্রি মেনডেলিভ এর 'পিরিওডিক টেবল্'-এর সঙ্গে হয়ত তুলনা করা যায়। ১৮৬৯ সাল পর্যন্ত আবিষ্কৃত তাবৎ মৌলিক পদার্থের ভর এবং রাসায়নিক গুণাবলী অনুসারে মেনডেলিভ তাঁর পিরিওডিক টেবল-এ মৌলিক পদার্থগুলিকে পর্যায়ক্রমে সাজিয়েছিলেন তাঁর ওই সারণীতে। এই সারণীর সাহায্যে তিনি বহু অনাবিষ্কৃত মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব এবং চরিত্র সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করতে সমর্থ হন। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে গেল-মানের আবিষ্কারও যেন সেই রকম। তখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত তাবৎ পারমাণবিক কণাদের তিনি শ্রেণীবদ্ধ করতে সমর্থ হন। বিভিন্ন চরিত্রের দিকে নজর রেখে কণাগুলি সাজিয়ে মেনডেলিভের মতই তৈরি করেন একটি 'সারণী'। এই 'সারণীর' সাহায্যে তখনও পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত বহু পারমাণবিক কণার অস্তিত্ব এবং তাদের সম্ভাব্য চরিত্র সম্পর্কে অনেক তথ্য অনুমান করা সম্ভব হয়। উল্লেখ্য, ১৯৬৯ পর্যন্ত ১০০-রও বেশি পারমাণবিক কণার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। এই সংখ্যা এখন আরও বেড়েছে।

গেল-মান ১৯৫২ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন মেসাচ্যুসেটস ইনসটিটিউট অভ্ টেকনোলজি থেকে। পরে তিনি যোগ দেন ক্যালিফোর্নিয়া ইনসটিটিউট অভ্ টেকনোলজিতে। সে আর এক মাহেন্দ্রযোগ। এখানে তিনি সান্নিধ্য লাভ করলেন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন পদার্থবিজ্ঞানী রিচার্ড পি ফাইনম্যান-এর, যিনি ১৯৬৫ সালে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন। গেল-মানের জীবনে ফাইনম্যান এক অনবদ্য অনুপ্রেরণা।

১৯৫৮ সালে ফাইনম্যান এবং গেল-মান যুগ্মভাবে প্রথম প্রস্তাব করলেন নতুন একটি তত্ত্বের। 'থিওরি অভ্ উইক্ ইন্টারঅ্যাকশন' বা দুর্বল-প্রতিক্রিয়া তত্ত্ব। এই তত্ত্বে বলা হলো, মৌল কণা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শক্তি ক্ষরণ করে (বিটা রশ্মি হিসেবে) স্থিতিশীল মৌলকণায় রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে এই তত্ত্ব নিউট্রিনো বিষয়ক গবেষণায় সাহায্য করেছে। গেল-মান পারমাণবিক কণা সংশ্লিষ্ট 'দুর্বল-চৌম্বক বল'

বা 'উইক ম্যাগনেটিক ফোর্স' সম্পর্কেও নতুন তত্ত্ব দাঁড় করান। তিনি এবং জাপানী পদার্থ বিজ্ঞানী এস· ওকুবো পৃথক পৃথকভাবে মৌলকণার ভর নির্ণয়ের পদ্ধতি আবিষ্কারের ব্যাপারেও কাজ করেন। পরে এই গবেষণা 'গেল-মান ওকুবো মাস ফরমুলা' তৈরি করতে সাহায্য করেছিল।

গেল-মানের অসামান্য কৃতিত্ব 'ওমেগা মাইনাস' নামে এক শ্রেণীর মৌলকণার অস্তিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যৎ-বাণী। এদের মধ্যে পড়ে ডেল্টা, সিগমা এবং জাই-কণা। এই সব কণার ভর অপেক্ষাকৃত বেশী। এদের ভারী কণিকাও বলা হয়ে থাকে। নিজস্ব তত্ত্বের উপর নির্ভর করে তিনি ওই সব কণার ভর, আবর্তন, বৈদ্যুতিক আধান প্রভৃতি সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণীও করেন। গোড়ায় এ সব নিয়ে প্রচুর বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, ১৯৬৪ সালে ব্রুকহেভেন ন্যাশনাল ল্যাবোরেটারির গবেষকরা পরীক্ষা করে 'ওমেগা মাইনাস' কণার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে সমর্থ হন। এর পরই মৌল-কণা বিষয়ক তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী হিসেবে গেল-মানের বিজয়বার্তা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়লো।

'কোয়াক' কণার বাস্তবতাও স্বীকার করেছেন অনেকে। পরে, 'জাই' কণাও আবিষ্কৃত হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে এ নিয়ে আলোচনা করবো।

কণা-পদার্থবিজ্ঞানে একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন মারে গেল-মান। তাঁর তত্ত্ব উত্তরকালে কণা বিষয়ক গবেষণায় বলিষ্ঠ ইন্ধন যোগাতে সমর্থ হয়েছে।

রসায়ন

কথায় বলে রূপ আর গুণ, এরা যেন পরস্পর ভাই ভাই। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও এমন অভিজ্ঞতা কার নেই? চেহারার সঙ্গে চরিত্রের মিল, এতো হামেশাই আমরা দেখতে পাই। কথাটা প্রাণীদের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, কোন যৌগিক পদার্থের বেলাতেও তাই। যৌগিক পদার্থের আকৃতি এবং প্রকৃতির মধ্যেও রয়েছে যথেষ্ট সাদৃশ্য। ১৯৬৯ সালে রসায়ন শাস্ত্রে যারা নোবেল পুরস্কার পান, গবেষণা ক্ষেত্রে তাঁদের কৃতিত্বের মূল কথাটি হয়ত এটাই।

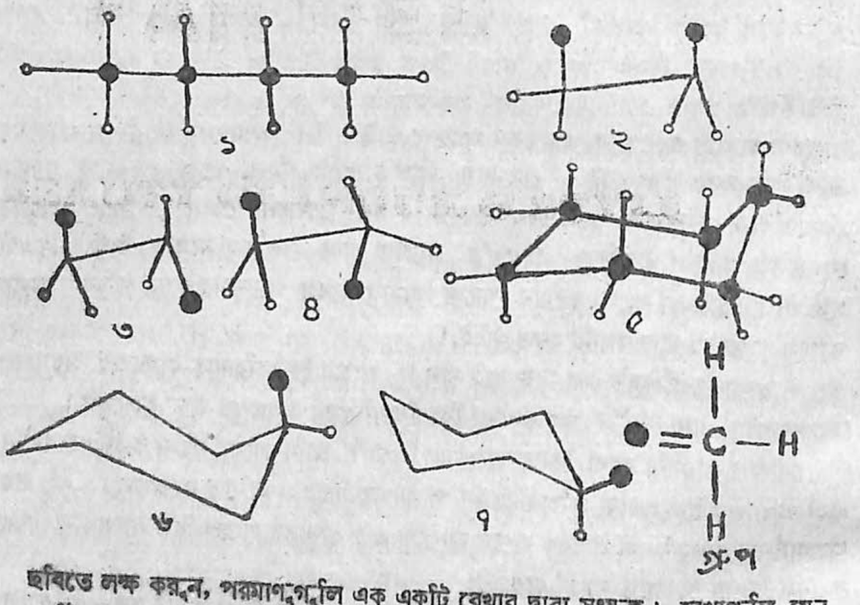
পুরস্কার পেয়েছেন এক সঙ্গে দুই জন। লণ্ডন ইম্পিরিয়াল কলেজের অধ্যাপক ডেরেক এইচ আর বার্টন এবং ওসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অড্ হাৎসেল।

নোবেল কমিটির বক্তব্য, 'কনফরমেশনাল থিওরী' আবিষ্কারের জন্যে অধ্যাপক বার্টন এবং অধ্যাপক হাৎসেলকে তাঁরা নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন। এই তত্ত্ব অরগ্যানিক মলেকুল বা জৈবিক অণুর আকৃতি এবং চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর যথাযথ ব্যাখ্যা যোগাতে সমর্থ হয়েছে।

'কনফরমেশনাল থিওরি', বাংলায় যাকে হয়ত বলা চলে অনুরূপী তত্ত্ব—এর মানে কী?

খুব সাধারণ একটি উদাহরণ দিয়েই ব্যাপারটা বোঝান যেতে পারে। ধরুন হাইড্রোকার্বনের কথা। হাইড্রোকার্বন এক শ্রেণীর জৈব রাসায়নিক যোগ। কার্বন এবং হাইড্রোজেন পরমাণু পরস্পর মিলিত হয়েই তৈরি করে এই শ্রেণীর যোগ। এদের মধ্যে পড়ে মিথেন, ইথেন, বিউটেন, প্রভৃতি। উদাহরণ স্বরূপ বিউটেনের কথা ধরা যাক। বিউটেন অণুর মধ্যে থাকে চারটে কার্বন পরমাণু এবং দশটি হাইড্রোজেন পরমাণু। সাধারণভাবে বিউটেনের গঠনটি প্রকাশ করা হয় ১ নং চিত্রের সাহায্যে।

এ ক্ষেত্রে লক্ষ করুন, চারটে কার্বন পরমাণু কেমন পর পর জুড়ে রয়েছে। আর তাদের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে দশটি হাইড্রোজেন পরমাণু। ঠিক কথা। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, বিউটেনের এটা খুবই সরল চেহারা। কোন শিল্পী একজন মানুষের ছক আঁকলে শুধু এটুকু যেমন বোঝা যায়, সে মানুষের ছক এঁকেছে, কিন্তু মানুষটির পরিপূর্ণ রূপটি কেমন, তার চোখ, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং চলতে গেলে তার ভঙ্গীমাটি কেমন দাঁড়ায়, সে সব তথ্য সেই ছক থেকে যেমন বোঝা যায় না, রসায়নবিদদের কাছে বিউটেনের এমন সরল রূপটিও তেমনি। এ ধরনের আণবিক গঠনের ছবি থেকে শুধু এইটুকু বোঝা যায়, বিউটেন অণুর মধ্যে থাকে চারটে কার্বন এবং দশটি হাইড্রোজেন পরমাণু; কার্বন পরমাণুগুলি একই সরলরেখায় পর পর জুড়ে রয়েছে। মাঝের দুইটি কার্বন পরমাণুর উভয়পার্শ্বে জুড়ে থাকে যথাক্রমে দুটি করে হাইড্রোজেন পরমাণু; এবং দুই প্রান্তের দুইটি কার্বন পরমাণুর সঙ্গে জুড়ে থাকে তিনটি করে হাইড্রোজেন পরমাণু।



ছবিতে লক্ষ করুন, পরমাণুগুলি এক একটি রেখার দ্বারা সংযুক্ত। রেখাগুলি যেন এক একটি হাত। এই হাতগুলি দিয়েই কার্বন পরমাণুগুলি যেন হাইড্রোজেন পরমাণুদের ধরে রেখেছে। রসায়নবিদরা অণুর গঠন সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে একটি ইংরেজি

শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। শব্দটি হচ্ছে 'বণ্ড'। ওই হাতগুলি এই বণ্ডের সঙ্গে কল্পনা করা হয়েছে।

তা না হয় হলো। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে এই, কার্বন বণ্ড যে সব হাইড্রোজেন পরমাণুকে ধরে রয়েছে, তারা কি পুরোপুরি নিশ্চলভাবে একই অবস্থায় অবস্থান করে?

কথাটা আর একটু সরল করা যাক। ধরুন, আপনার মূল দেহটি একটি কার্বন পরমাণু। আপনার দুটি হাত দুইটি বণ্ড। এবার কল্পনা করুন, দুই হাতে আপনি দুইটি বোঝা তুলে নিলেন। বোঝা দুটি যেন হাইড্রোজেন পরমাণু। বোঝা তুলে নেওয়ার পর, হয়ত আপনি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলেন, অথবা চলতে শুরু করলেন। এমন অবস্থায় আপনি কি মনে করেন, আপনার বোঝাগুলি ঠিক যে ভাবে আপনি বহন করছেন, হাতের সঙ্গে সব সময় সেই ভাবেই তারা একই অবস্থায় ঝুলে থাকবে? না, সেটা কখনও হয় না। হাঁটার তালে তালে আপনার বাহু দুটি আন্দোলিত হবে। এবং সেই সঙ্গে বোঝা দুটিও কখনও সামনের দিকে, কখনও পেছনের দিকে। অথবা কখনও নিচের দিকে বা উপরের দিকে আন্দোলিত হবে।

হ্যাঁ, ওই বিউটেন অণুর ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে। সাধারণ ছকের গঠনে আমরা শুধু দেখি, কার্বন পরমাণুর সঙ্গে এক একটি হাইড্রোজেন পরমাণু যেন এক একটি বণ্ডের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে। কিন্তু, কার্বন বণ্ডগুলি প্রয়োজনে যে কার্বন পরমাণুর চারপাশে আবর্তন করতে পারে, অথবা তাদের বেঁকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, আবর্তনের সময় অথবা বেঁকে গেলে মূল অণুটির আকৃতিটি কেমন দাঁড়ায় ১নং চিত্রের গঠন ভঙ্গিমায় এ সবের কিছুই ধরা পড়ে না। একই অণুর গঠন এ ভাবে চিন্তা করলে কত রকম দাঁড়াতে পারে ২, ৩ এবং ৪ নং চিত্রের সাহায্যে তা দেখান হলো। লক্ষ করুন, এ ক্ষেত্রে একটি কার্বন পরমাণু অপর একটি কার্বন পরমাণুর সংগে জুড়ে রয়েছে। কিন্তু আবর্তনের দরুন তাদের পারস্পরিক অবস্থান কেমন পালটে গেছে। বণ্ডের আবর্তনের দরুন একই অণুর বিভিন্ন গঠন চিত্রকেই বলা হয় 'কনফরমেশনস' বা অনুরূপী চিত্র। বলাবাহুল্য, যে কোন অণুর এমন চিত্ররূপ বহুবিধ হতে পারে। এবং সেটা নির্ভর করে বণ্ডের আবর্তনের উপর। তবে যে যে ধরনের গঠন চিত্রে শক্তির ভারসাম্য বজায় রয়েছে বলে মনে হয়, সেই সব অনুরূপী চিত্রই গ্রহণ যোগ্য।

যেমন ২নং চিত্রটি লক্ষ করুন। দুটি ভারী কার্বন গ্রুপ কেমন মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভারসাম্যের ব্যাঘাত ঘটছে বলেই মনে হবে। ৩ নং চিত্রেও এই ব্যাঘাত স্পষ্টতর। কিন্তু ৪ নং চিত্রটি দেখুন, একটি গ্রুপ উপরে, অপরটি নীচে, যেন উভয় গ্রুপ পরস্পরকে 'ব্যালান্স' করলো। এ ক্ষেত্রে ৪ নং গঠন চিত্র অনেক বেশি বাস্তব।

যৌগিক পদার্থের আণবিক গঠনকে এইভাবে প্রতিভাত করায় অনেক বেশি লাভবান হলেন জৈব রসায়নবিদ্‌রা। যেমন ধরুন, 'সাইক্লোহেকসেন' নামক রাসায়নিক যৌগের ব্যাপারটা (৫ নং চিত্র)। এ ক্ষেত্রে কার্বন পরমাণুগুলি বণ্ডের সাহায্যে 'আংটির' মত জুড়ে থাকে ; বিউটেনের বেলায় পর পর জুড়ে যেমন শৃংখলের চেহারা দাঁড়ায়

তেমনটি নয়। কনফরমেশন তত্ত্ব সাইক্লোহেকসেন অণুর চরিত্র জানতে সাহায্য করেছে। এবং তার উপর নির্ভর করেই কম খরচে এই বস্তুটির বাণিজ্যিক উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়াও জানা গেছে এমন অনেক অণুর গঠন এবং চরিত্র রহস্য জীববিজ্ঞানের দিক দিয়ে যা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এদের মধ্যে আছে অ্যালকোলয়েডস, স্টেরয়েডস এবং কারবোহাইড্রেটস।

১৯৪৩ সালে অধ্যাপক হাৎসেল দেখালেন, যে সব বন্ড হাইড্রোজেনের অভিমুখী তাদের চরিত্র দুই রকম হতে পারে। এক, হয় তারা 'অ্যাকসিয়াল' বা উল্লম্ব অবস্থায় থাকবে ; দুই, তারা 'ইকুয়েটোরিয়াল' বা আনুভূমিক ভাবে অবস্থান করতে পারে। ব্যাপারটা ৫ নং ছবির সাহায্যে দেখান যেতে পারে। ছবির ডান পাশে লক্ষ করুন। একটি হাইড্রোজেন জুড়ে রয়েছে উল্লম্বভাবে অবস্থানরত একটি বন্ডের সঙ্গে। অপর একটি হাইড্রোজেন আনুভূমিক বন্ডের সঙ্গে। হাৎসেল দেখালেন এই দুইটি হাইড্রোজেন একটি গ্রুপের দ্বারা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব। প্রতিস্থাপনের পর অবস্হাটা কেমন দাঁড়াবে সেটা ৬ নং এবং ৭ নং ছবির সাহায্যে দেখান হলো।

১৯৪০-এর দশকে নাৎসেল একাধিক সরল-সাইক্লোহেকসেন যৌগ নিয়ে পরীক্ষা করে প্রমাণ করলেন, আনুভূমিক বন্ডের সঙ্গে যুক্ত হাইড্রোজেন কোন গ্রুপের দ্বারা প্রতিস্হাপন করলে যে সব যৌগ পাওয়া যাবে, সেই সব যৌগ, উলম্ব ভাবে অবস্হানরত বন্ডের সঙ্গে যুক্ত হাইড্রোজেন গ্রুপের দ্বারা প্রতিস্থাপন করলে যে সব যৌগ তৈরি হয়, তাদের চেয়ে স্থিতিশীল। কারণটা এই সব যৌগের ত্রিমাত্রিক গঠনের দিকে চাইলেই বোঝা যাবে। ৭ নং ছবিটি দেখুন। এ ক্ষেত্রে গ্রুপটি আনুভূমিক ভাবে অবস্থান করছে। এমন অবস্থায় ভারী এই গ্রুপের উপর আশপাশের পরমাণুর বিকর্ষণজনিত বলের মাত্রা অপেক্ষাকৃত অনেক কম। এর জন্যেই এ ধরনের গঠন সমন্বিত যৌগ সহজে তার স্থিতিসাম্য হারাতে পারে না। বলা বাহুল্য, এ ধরনের অঙ্গুরীয় গঠন বা রিং-স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যেতে পারে, কোন একটি নির্দিষ্ট বন্ডের চার পাশে যদি এই যৌগটি আবর্তন করে তা হলে আমরা দুই রকমের অবস্থার সামনে উপনীত হতে পারি। ৬ নং এবং ৭ নং গঠন দুটি নিজেদের দুই ভাবে বিন্যস্ত করতে পারে। ৬ নং চিত্রের গ্রুপটি নিচের দিকে আসতে পারে এবং ৭ নং গ্রুপটি বাঁ দিকের প্রান্তে আসতে পারে। কী ভাবে আসবে সেটাই ব্যাখ্যা করেছে 'কনফরমেশনাল তত্ত্ব'। অবশ্য কোন রিং-এর একাধিক বিন্দুতে যদি বড় রকমের গ্রুপ যুক্ত হয় সে ক্ষেত্রে অবস্থাটা কিছুটা জটিল হয়।

হাৎসেলের এই অবদান প্রথম দিকে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় নি। ১৯৫০ দশকেও তাঁর এই তত্ত্ব বিজ্ঞানী মহলে যে যথেষ্ট সমাদর পায়নি, তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে।

কনফরমেশনাল তত্ত্ব নিয়ে এমন যখন অবস্হা, সেই সময় আসরে নামলেন অধ্যাপক বার্টন। তিনি দেখালেন, কোন অণুর ভৌতিক এবং রাসায়নিক ধর্ম তার আণবিক গঠন এবং অণুর মধ্যে উপস্হিত বিভিন্ন পরমাণুর অবস্হান এবং অবস্হার উপর নির্ভর করে। ইংরেজিতে এদের একত্রিত করে বলা হয় 'কনফরমেশন'। জৈব-রসায়নে এই

তত্ত্ব একটি বড় রকমের উত্তরণ। বার্টন দেখালেন, এই তত্ত্ব কম করেও দুটি দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক, এই তত্ত্ব একাধিক জৈব রাসায়নিক যোগ সংশ্লেষণে সাহায্য করেছে। দুই, এই তত্ত্বের সাহায্যে আগে থেকেই বুঝে নেওয়া সম্ভব কোন অণুর মধ্যে পরমাণু এবং গ্রুপগুলির অবস্থান কী ধরনের হলে, সেই অণুর স্থায়িত্ব বজায় থাকবে। এ ব্যাপারে অণুর ত্রিমাত্রিক গঠন বৈচিত্র্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সব চেয়ে বেশি।

হাৎসেল এবং বার্টনের এই আবিষ্কার রসায়ন শিল্পকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছে। তাঁদের তত্ত্বের উপর নির্ভর করে নানা রকম অ্যালকালয়েড, স্টেরয়েড এবং কার্বহাইড্রেট সংশ্লেষণ এবং উৎপাদন করা সহজতর হয়েছে। সম্ভব হয়েছে কম খরচে নানা রকম অ্যালকালয়েড এবং স্টেরয়েড উৎপাদন।

শারীর এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান

আপনি একটি কমলালেবু নিলেন।

লেবুটি দুটি অংশে কেটে ফেলুন। তারপর যতটা সম্ভব ঠেসে লেবুর ওই অংশ দুটির রস নিংড়ে একটি গেলাসে রাখুন।

অপেক্ষা করুন এবার। যতক্ষণ ইচ্ছে, আপত্তি নেই।

ছোট্ট একটি প্রশ্ন করবো আপনাকে। বলুন তো, কমলালেবু থেকে নিষিক্ত ওই রসের প্রতিটি অণু পরস্পর মিলিত হয়ে পরিপূর্ণ একটি কমলা লেবু আবার কি তৈরি করতে পারবে?

প্রশ্নটি শুনে হয়ত রে রে করে উঠবেন আপনারা। বলবেন, মশাই, এবার আপনার মাথাটি বিগড়েছে। প্রাণী অথবা উদ্ভিদের কোন অংশকে ওই ভাবে পৃথক করলে, সেই পৃথক অংশগুলি জুড়ে আগের অবস্থায় কি কখনও ফিরিয়ে আনা যায়? একি লোহা কি তামার টুকরো? হ্যাঁ, কোন ধাতুর পিণ্ডকে ভেঙ্গে আপনি গুঁড়ো করতে পারেন। আবার দরকার হলে, ওই গুঁড়ো সমবেত করে গলিয়ে আবার পিণ্ড তৈরি করতে পারেন। কিন্তু তাই বলে প্রাণিজ অথবা উদ্ভিজ কোন কিছুকে ভেঙে, পরে আবার পুনর্বিন্যাস করা, এ কখনও হয় নাকি?

বেশ, তাহলে ধরুন এক ধরনের ভাইরাসের কথা। যে ভাইরাস তামাক গাছে ধসা রোগ সৃষ্টি করে। অনেকেই হয়ত জানেন, ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার চেয়েও বহুগুণ ক্ষুদ্র জীবাণু। বিশেষ পরিবেশে ভাইরাস ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়। তারপর অনুকূল পরিস্থিতিতে ওই সব টুকরো মিলিত হয়ে সৃষ্টি করে সেই ভাইরাসের পূর্ণ দেহ। নতুন এই ভাইরাসেরও রোগ সংক্রামণের ক্ষমতা থাকে।

যে ভাইরাসটির কথা বললাম, তার ইংরাজি নাম 'টোবাকো মোজেইক ভাইরাস'। এর শরীরের মূল উপাদান বলতে আছে জটিল একটি অণু—নাম রাইবো নিউক্লেয়িক অ্যাসিড বা 'আর এন এ'। আর এই 'আর এন এ'কে চাদরের মত ঘিরে রাখে কয়েক হাজার প্রোটিন অণু।

মজার ব্যাপার এই, কি কমলালেবু, কি ভাইরাস যাই হোক না কেন, এদের সৃষ্টির মূলে যার ভূমিকা প্রধান, তার নাম জিন। বিভিন্ন প্রাণী এবং উদ্ভিদের জিন নিজস্ব ভঙ্গীতে কাজ করে। জিন যেন একটি অভিধান। একটি অভিধানে থাকে সহস্র সহস্র শব্দ। সেই শব্দগুলিকেই তো চয়ন করে রচনা করা হয় অর্থবহুল এক একটি বাক্য। পরে সেই সব বাক্য সাজিয়ে রচিত হয় গ্রন্থ। গ্রন্থগুলির পুনর্মুদ্রণ করা হয়। এবং এ ক্ষেত্রে রামায়ণের পুনর্মুদ্রণ করলে একটি রামায়ণই পাওয়া যায়, মহাভারত নয়।

ব্যাপারটা জিনের বেলাতেও খাটে। মানুষের জিন থেকে মানুষই তৈরি হবে, অন্য প্রাণী নয়। সাপের জিন থেকে সাপ, আম গাছের জিন থেকে আম গাছ, ইত্যাদি। সাধারণভাবে একেই তো বলে বংশগতি।

প্রশ্ন এই, জীব জগতের এই যে বংশগতি, একে বহন করছে কে? বংশগতিকে আকাঙ্ক্ষিত পথে চালিত করার দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত? জিনের মধ্যে আছে নানা রকম জৈবিক অণু—প্রোটিন, নিউক্লেয়িক অ্যাসিড অথবা ডি-অক্সি রাইবো নিউক্লেয়িক অ্যাসিড বা 'ডি এন এ', প্রভৃতি। বংশগতিকে বহন করার ব্যাপারে এই সব রাসায়নিক অণুর মধ্যে কার ভূমিকা প্রধান?

আমরা বলছি জীবন সংকেত বা জেনেটিক কোড। আর ওই জিনের মধ্যেই থাকে সেই সংকেত। এই জেনেটিক কোডই তো ঠিক করে দেয় কে মানুষ হবে, কে হবে আম গাছ অথবা ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস। বংশগতির এই চরিত্রটি সংরক্ষণ করার দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত? পূর্বপুরুষের কাছ থেকে কীভাবে বংশগতি উত্তর পুরুষের মধ্যে বর্তায়?

মানুষের চিরায়ত এই প্রশ্নেরই মিলিতভাবে উত্তর যুগিয়েছেন তিন জন বিজ্ঞানী। ম্যাকস্ ডেলব্রুক, অ্যালফ্রেড হারশে এবং সালভাদোর লুরিয়া। তিরিশের দশকের শেষার্ধে। নোবেল কমিটি এই অনবদ্য অবদানের জন্যেই এই তিন বিজ্ঞানীকে মিলিতভাবে ১৯৬৯ সালের শারীর এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান শাখার নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

হ্যাঁ, ১৯৩০ দশকের কথা। বলা যেতে পারে ওই সময়ই পদার্থ বিজ্ঞানীরা প্রথম জীববিজ্ঞানের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী হয়ে উঠলেন। এ ছাড়া আরও একটি ব্যাপার দেখা দিল। এতদিন বংশগতি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে মটরশুঁটি, মাছি, ছত্রাক, প্রভৃতি উচ্চতর জীব নিয়েই বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামিয়ে এসেছেন। কিন্তু বংশগতির রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে কিছু সংখ্যক উৎসাহী বিজ্ঞানী এবার আরও সরলতর জীব নিয়ে অনুসন্ধানের কাজে হাত দিলেন। এই সব জীবের মধ্যে পড়ে এক ধরনের ভাইরাস। যাদের বলা হয় ব্যাকটেরিওফাজ। নাম T_1, T_2, T_3 প্রভৃতি। প্রাণী

দেহের ইনটেসটাইন বা অন্ত্রের মধ্যে এক শ্রেণীর ভাইরাস বাস করে (মানুষের অন্ত্রেও)। এদের নাম এসকোরিশিয়া কোলি বা সংক্ষেপে ই. কোলি (Escherichia Coli বা E. Coli)। এই ই. কোলির দেহের মধ্যেই পাওয়া যায় ওই ব্যাকটেরিয়াফাজদের। বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, শারীরবৃত্তের দিক দিয়ে এই সব প্রাণী অন্যান্য প্রাণীর মত জটিল নয়, অথচ প্রাণের মৌলিক ধর্ম বা পদ্ধতিগুলির সবই পাওয়া যাবে এদের মধ্যে। তাদের সাহায্যে কোন্ জীব কীভাবে নিজের মধ্যে তার বংশগতির চরিত্রগুলি রাখে এবং ওই চরিত্রগুলি কীভাবে তার বংশধরদের মধ্যে পরিবাহিত করে—সে সম্পর্কে সঠিক তথ্যাবলী জানার কাজটি সহজতর করা যাবে।

ধরা যাক ব্যাকটেরিওফাজ বা ফাজ ভাইরাস T_4 এর কথা। এই ভাইরাসের মধ্যে আছে ডি এন এ। 'জেনেটিক ইনফরমেশন' বা বংশগতিকে পরিবাহিত করার যাবতীয় কলা কৌশল অথবা উপাদান ধরা যাক ওই 'ডি এন এ'র মধ্যেই আছে। তা না হয় হলো। কিন্তু মুশকিল দেখা দিল আর এক দিক থেকে। একটি ভাইরাস থেকে অপর একটি ভাইরাস সৃষ্টি, অর্থাৎ সাধারণভাবে যাকে বলা হয় বংশবৃদ্ধি—সেটা করতে গেলে দরকার বিশেষ ধরনের কতকগুলি ব্যবস্থাপনা। T_4 ভাইরাসের দেহে এ ধরনের কোন এনজাইম বা ব্যবস্থাপনা কিছুই নেই। যার অর্থ, T_4 ভাইরাস নিজস্ব ক্ষমতায় বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। উল্লেখ্য, এনজাইম এক শ্রেণীর জৈব রাসায়নিক যৌগ। জীবদেহের অভ্যন্তরেই তৈরি হয়ে থাকে। ক্যাটালিস্ট্ বা অনুঘটক হিসেবে এরা শরীরের রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে।

দেখা গেল T_4 ভাইরাসের শরীর বলতে 'ডি এন এ'। আর সেই ডি এন এ-কে রক্ষা করার জন্যে ডি এন এ-র চারপাশে ঘিরে থাকে প্রোটিনের একটি আবরণ। ই কোলি ব্যাকটেরিয়ার দেহে এসে আক্রমণ করার পর, এই ভাইরাস ইনজেকশন করার মত শুধু তার ডি এন এ-কেই ব্যাকটেরিয়ার শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়, বাইরে পড়ে থাকে তার প্রোটিনের চাদর। আর যে মুহূর্তে ওই ডি এন এ ওই ব্যাকটেরিয়ার শরীরে গিয়ে হাজির হয়, তখনই শুরু হয় আসল খেলা। ই কোলির নিজস্ব বিপাকীয় কাজকর্মের উপর নির্মমভাবে কর্তৃত্ব করতে শুরু করে দেয় ওই ডি এন এ। তার এনজাইম এবং তার ব্যবস্থাপনার সাহায্য নিয়ে নতুন ফাজ কণা (শিশু ব্যাকটেরিওফাজ। এ ক্ষেত্রে T_4 শিশু) সৃষ্টির কাজ শুরু হয় তখন। আর প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই দেখা যায়, ই. কোলির দেহটি ফেটে গেছে। সেই ফাটলের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসছে একশ বা তারও বেশি নতুন T_4 ভাইরাস। বেরিয়ে আসার পর ওই ভাইরাস আবার নতুন কোন ই কোলি ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করার জন্যে ছুটোছুটি শুরু করে দেয়।

T_4 বা অন্যান্য ফাজ ভাইরাসের দ্বারা সংক্রমণের পর ই. কোলির দেহের মধ্যে যে সব ঘটনাবলী ঘটে সেই সব ঘটনা সম্পর্কে সর্বপ্রথম নির্ভরযোগ্য এবং বিশদ তথ্যাবলী যুগিয়েছেন ডেলব্রুক, হারশে এবং লুরিয়া। আর তাঁদের এই গবেষণার মূল কেন্দ্র ছিল পাসাডেনার ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অভ্ টেকনোলজি এবং লং আইল্যান্ডের

কোল্ড স্প্রিং এ অবস্থিত ল্যাবোরেটারি অভ্ কোয়ান্টিটেটিভ বাইওলজি। এই গবেষণা সর্বপ্রথম T_4 ভাইরাসের সর্বাধুনিক মানচিত্র রচনা করতে সাহায্য করেছে। এবং সেই ব্যাকটেরিয়া কোষের অভ্যন্তরে জেনেটিক কোড বা ডি এন এ' র ভূমিকা এবং প্রোটিন অণু সংশ্লেষণের পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে নতুন তথ্যাবলী জানতেও সাহায্য করেছে। পরবর্তীকালে এ নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন কেমব্রিজ (ম্যাসাচুসেটস্), কেমব্রিজ (ইংলন্ড), প্যারিস প্রভৃতি অঞ্চলের বিজ্ঞানীরা। কিন্তু শেষোক্ত ওই বিজ্ঞানীদের মূল অনুপ্রেরণা খুঁজতে গেলে তিন জনের নামই বলা যায়। ডেলব্রুক হারশে এবং লুরিয়া।

ম্যাক্স ডেলব্রুক। বাবা বিশিষ্ট জার্মান ঐতিহাসিক হানস্ ডেলব্রুক। ম্যাক্স মূলত পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র। প্রখ্যাত নোবেল বিজ্ঞানী নিলস্ বোর-এর কাছে তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানে তাঁর হাতে খড়ি। পরে হঠাৎ তিনি আগ্রহী হয়ে উঠলেন জীববিজ্ঞানের ব্যাপারে। তাঁর মনে হলো, জীবের বংশগতি নিয়ে অনুসন্ধান চালালে হয়ত তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের অনেক অজানা তথ্য এবং সূত্রের সন্ধান পাবেন।

কিন্তু বাস্তবে ম্যাকসের অভিজ্ঞতাটি দাঁড়ালো ঠিক তার বিপরীত। তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান, নিজের বিশ্বাসকে বাস্তবে পরিণত করার জন্যে তিনি একটি গবেষক দলও তৈরি করলেন। আর এই দলটি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চালাতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন, জীব-বিজ্ঞান থেকে পদার্থ-বিজ্ঞানের নতুন তথ্য জানবেন কি, বরং জীববিজ্ঞানের যাবতীয় ঘটনাবলীই রসায়ন এবং পদার্থ বিজ্ঞানের এ যাবৎ আবিষ্কৃত তাবৎ সূত্রই তো মেনে চলে।

ম্যাকস্ ডেলব্রুক এবার শুরু করলেন সরলতম জীব নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ। সরলতম জীব বলতে এখানে ভাইরাসকেই বোঝানো হচ্ছে। ম্যাকস্ এবং ইমোরি এলিস নামে আর একজন বিজ্ঞানী ব্যাকটেরিয়া আক্রমণকারী ভাইরাসের সংক্রমণ করার পদ্ধতি এবং তাদের বৃদ্ধি নিয়ে মৌলিক গবেষণা করেন। যে সব ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার দেহে সংক্রমণ ঘটায় তাদের বলা হয় ব্যাকটেরিওফাজ। বংশগতির যথাযথ কায়দা কানুন জানার মধ্যে কোন কোন বিজ্ঞানী ইতিমধ্যে ব্যাকটেরিওফাজদের আদর্শ জীব হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ডেলব্রুক এবং লুরিয়া সমবেত ভাবে পরীক্ষা করে প্রমাণ করলেন, ফাজ্ ভাইরাসরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'মিউটেশন' করে। অর্থাৎ তাদের দেহও বহুবিভক্ত হয় এবং নতুন জীব কণা সৃষ্টি করে। মাছি, মানুষ প্রভৃতি উচ্চতর প্রাণীর মত ভাইরাসগুলির মধ্যেও প্রজননগত চরিত্র বর্তমান।

অপারিসীম ব্যক্তিত্বের অধিকারী ডেলব্রুক নিজের ধ্যান ধারণা প্রচার করতে শুরু করলেন পদার্থ বিজ্ঞানীদের মধ্যে এরপর। উদ্দেশ্য পদার্থ বিজ্ঞানী এবং রসায়নবিদরা জীববিজ্ঞানের রহস্য উদ্ঘাটনে আত্মনিয়োগ করুন। কোল্ড হারবারে প্রতি বছর গরমের সময় তিনি একটি স্কুলও খুলে বসলেন, যার নাম রাখা হলো 'ফাজ স্কুল'। এখানে বছরে কুড়ি জনের মত বিজ্ঞানীকে ফাজ জীববিজ্ঞানের উপর প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা

করা হয়। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ডেলব্রুক বলতেন, পরীক্ষালব্ধ ফলাফল যা পেলে সেটাই সব কথা নয়। আরও পরীক্ষা কর, আরও পরিচ্ছন্নভাবে চিন্তা কর, আরও বেশি চিন্তা কর। কারণ চরিত্রে তিনি সর্বদাই একজন নির্ভিক সমালোচক। মনে পড়ে; একবার একটা আলোচনাচক্রে উপস্থিত রয়েছেন ডেলব্রুক। জনৈক বক্তা একটি তত্ত্ব নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। তাঁর বক্তৃতার মাঝামাঝি অবস্থায় হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন ডেলব্রুক। বক্তাকে উদ্দেশ করে বললেন, মহাশয়, এতক্ষণ আপনি যা উপস্থাপন করলেন, সেটা ঠিক পরিষ্কার হয় নি। দয়া করে আপনি আবার গোড়া থেকে শুরু করুন। ভদ্রলোক কী আর করেন। আবার গোড়া থেকে শুরু করলেন তাঁর বক্তৃতা।

তরুণ অণু-জীববিজ্ঞানীদের বা মলেকিউলার বাইওলজিস্টদের কাছে ডেলব্রুকের ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ্ টেকনোলজির গবেষণাগারটি হয়ে দাঁড়ালো মক্কার মত। তাঁর তত্ত্বাবধানে এখানে যে ধরনের গবেষণা শুরু হয়, এর আগে অনেকের কাছেই সে সব অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল।

অ্যালফ্রেড হারশের জন্ম নিউ ইংলণ্ডে। জীবনের তিরিশটি বছর তিনি অতিবাহিত করেছেন কোল্ড স্প্রিং হারবারের শান্ত সবুজ পরিবেশে। শান্ত প্রকৃতির হারশে স্বভাবে লাজুক। সভাসমিতি, আত্মপ্রচার সব সময় এড়িয়ে চলেন। গরমের সময় কোল্ড স্প্রিং হারবার যখন অসংখ্য বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান-সভায় মুখরিত হয়ে উঠত, সে সব এড়িয়ে তিনি প্রায়ই চলে যেতেন দূরাঞ্চলের কোন নিভৃত জায়গায়। জলযানে। ফিরতেন সেপ্টেম্বরে। ভিড়ভাট্টা কমে গেলে।

অ্যালফ্রেড হারশে মূলত 'ইমিউনোলজিস্ট' বা রোগ প্রতিরোধক বিষয়ক বিজ্ঞানী। ভাইরাস এবং তাদের প্রতিরোধকারী কণা অ্যান্টিবডির পারস্পরিক বিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তিনি ফাজ ভাইরাসের ব্যাপারে আকৃষ্ট হন। ১৯৪০ দশকের গোড়ায় ডেলব্রুক এবং লুরিয়ার সংস্পর্শে এসে তিনি ব্যাপারটা নিয়ে আরও বেশি মাথা ঘামাতে শুরু করেন। তিনি বুঝতে পারলেন ডেলব্রুক এবং লুরিয়া যে সব ফাজ মিউটান্ট (ভাইরাসের সন্তান সন্ততি) তৈরি করছেন, জীবাণুদের প্রজননগত চরিত্রাবলী বোঝার ব্যাপারে তারা সাহায্য করতে পারে। পরে ফাজ ভাইরাসের পারস্পরিক মিলন ঘটিয়ে কয়েকটি মৌলিক গবেষণার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। অতঃপর হারশে সংক্রামিত জীবকোষের শারীরবৃত্ত নিয়ে গবেষণায় মনোনিবেশ করেন।

হারশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান T ভাইরাস নিয়ে তাঁর যুগান্তকারী পরীক্ষা। সেটা ১৯৫২ সাল। এই পরীক্ষায় তাঁর সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন মার্থ চেজ।

পরীক্ষার জন্যে হারশে এবং চেজ্ ই. কোলি ব্যাকটেরিয়ার সাহায্য নিলেন। আর সঙ্গে নিলেন T/2 ফাজ ভাইরাস। ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের সাহায্যে এর আগেই প্রমাণ করা গিয়েছিল, বিশেষ ধরনের এই ভাইরাসের শারীরিক গঠন খুবই সাধারণ। এদের শরীর মোড়া থাকে প্রোটিনের আবরণে। সেই আবরণের মধ্যে থাকে ডি এন এ।

পরীক্ষার জন্যে প্রথমে তাঁরা নিলেন কিছু সংখ্যক ই. কোলি। একটি পাত্রের মধ্যে নেওয়া হলো বিশেষ ধরনের মাধ্যম। এই মাধ্যমের মধ্যে রইল তেজস্ক্রিয় গন্ধক S^{35}।

এবার ব্যাকটেরিয়াগুলি ওই মাধ্যমের মধ্যে রেখে তাদের পালন করা হলো। মজার ব্যাপার এই, গন্ধক প্রোটিনের একটি উপাদান। অতএব তেজস্ক্রিয় গন্ধক মিশ্রিত মাধ্যমে থাকার দরুন অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাকটেরিয়ার দেহের প্রোটিন অণুগুলির সঙ্গে জুড়ে গেল তেজস্ক্রিয় গন্ধক। ধরা যাক তেজস্ক্রিয় গন্ধক সমন্বিত এই ব্যাকটেরিয়া গোষ্ঠীকে বলা হলো গ্রুপ 'এ'।

এবার গ্রুপ 'এ'-র ওই ব্যাকটেরিয়াগুলিকে সংক্রামিত করা হলো T/2 ভাইরাসের সাহায্যে। ধরে নেওয়া যাক, সংক্রমণের পর T/2 ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো এবং সেখানে বংশবৃদ্ধি করার পর ব্যাকটেরিয়ার দেহকে বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এল বাইরে। যেহেতু ব্যাকটেরিয়ার প্রোটিন অণুগুলির মধ্যে তখন তেজস্ক্রিয় গন্ধক রয়েছে, অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে, যে সব ভাইরাস তাদের শরীরের মধ্যে তৈরি হয়েছে, তাদের প্রোটিনের মধ্যেও থাকবে তেজস্ক্রিয় গন্ধক।

এবার আরও একদল ই. কোলি ব্যাকটেরিয়া নিলেন হারশে এবং চেজ্। এই ব্যাকটেরিয়া গোষ্ঠীর নাম দেওয়া হলো গ্রুপ-বি'। গ্রুপ বি'-র ব্যাকটেরিয়াগুলিকে এর পর পালন করা হলো আর একটি মাধ্যমে যার মধ্যে ছিল তেজস্ক্রিয় ফসফরাস P^{32}। এবার ফসফরাস কিন্তু ব্যাকটেরিয়া কোষের প্রোটিনের সঙ্গে মিলিত হবে না। পরিবর্তে মিলিত হবে তাদের নিউক্লেয়িক অ্যাসিডের সঙ্গে। কারণ ফসফরাস নিউক্লেয়িক অ্যাসিডের অন্যতম উপাদান। এ ক্ষেত্রে ওই নিউক্লেয়িক অ্যাসিড হলো ডি এন এ বা আর এন এ। অর্থাৎ ডাই অকসি রাইবো নিউক্লেয়িক অ্যাসিড বা রাইবো নিউক্লেয়িক অ্যাসিড।

গ্রুপ-বি এর ব্যাকটেরিয়াদের এর পর T/2 ভাইরাসের সাহায্যে সংক্রামিত করা হলো। সংক্রমণের পর ব্যাকটেরিয়ার দেহের অভ্যন্তরে তারা বংশ বিস্তার করল এবং যথানিয়ত ব্যাকটেরিয়াগুলিকে বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এলো বাইরে। এ ক্ষেত্রে T/2 ফাজ ভাইরাসের প্রোটিনের মধ্যে তেজস্ক্রিয় ফসফরাসের থাকার কথা নয়, তেজস্ক্রিয় ফসফরাস থাকবে তাদের ডি এন এ-র মধ্যে।

এইভাবে হারশে এবং চেজ দু'রকম T/2 ভাইরাস উৎপাদন করলেন। এক ধরনের ভাইরাস, যার নাম দেওয়া হলো গ্রুপ এ ভাইরাস। এদের দেহের প্রোটিনে রইল তেজস্ক্রিয় গন্ধক। অপর দলের নাম দেওয়া হলো গ্রুপ-বি ভাইরাস। শেষোক্ত এই ভাইরাসদের শুধুমাত্র ডি এন এ র মধ্যে রইল তেজস্ক্রিয় ফসফরাস।

এবার শুরু হলো এক নাটকীয় ঘটনা। হারশে এবং চেজ্ ই. কোলির নতুন নমুনা নিয়ে তার সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন তেজস্ক্রিয় গন্ধক সমন্বিত প্রোটিনবাহী গ্রুপ এ ভাইরাস। স্বভাবতঃই ওই ভাইরাসগুলি ই. কোলিদের আক্রমণ করবে। করলোও তাই। আক্রমণের কয়েক মিনিট পর যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়াগুলির গা ভালো করে ধুয়ে নেওয়া হলো। ধুয়ে নেওয়ার পর যে দ্রবণ পড়ে রইলো, সেই দ্রবণকে রাখা হলো পৃথক একটি পরীক্ষা নলে। আর ব্যাকটেরিয়া কোষগুলি রাখা হলো অপর একটি পরীক্ষা নলে।

হারশে এবং চেজ পরীক্ষা নলদুটি পরীক্ষা করলেন। পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন, দ্রবণের নলটি তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছড়াচ্ছে। যার অর্থ দ্রবণের নলটির মধ্যে আছে তেজস্ক্রিয় গন্ধক। এবং যেহেতু গন্ধকের থাকার কথা প্রোটিনের সঙ্গে জুড়ে, অতএব ওই দ্রবণে আক্রমণকারী ভাইরাসের প্রোটিন অংশ জমে রয়েছে। পরিবর্তে ব্যাকটেরিয়া কোষ পূর্ণ পরীক্ষা নল থেকে বিকিরণ পাওয়া গেল না। যার অর্থ, সংক্রমণের সময় T/2 ভাইরাসের উপর জড়ানো প্রোটিন ব্যাকটেরিয়া কোষের মধ্যে প্রবেশ করে নি। করলে, সেখান থেকেও বিকিরণ দেখা দিত।

গ্রুপ বি ভাইরাস নিয়েও অনুরূপ পরীক্ষা চালালেন হারশে এবং চেজ্। ব্যাকটেরিয়ার নতুন নমুনা নিয়ে তার মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হলো এই ভাইরাস। ভাইরাসগুলি তাদের আক্রমণ করল। কয়েক মিনিট পর আক্রান্ত ব্যাকটেরিয়ার দেহগুলি ধুয়ে যে দ্রবণ পাওয়া গেল সেই দ্রবণকে রাখা হলো একটি পরীক্ষা নলে। আর অবশিষ্ট ব্যাকটেরিয়া কোষদের অপর একটি পরীক্ষা নলে স্থানান্তরিত করা হলো।

এবার দেখা গেল, যে নলটির মধ্যে দ্রবণ ছিলো, সেখানে তেজস্ক্রিয়তার তেমন কোন লক্ষণই নেই। পরিবর্তে ব্যাকটেরিয়া কোষওয়ালা নল থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে তেজস্ক্রিয় রশ্মি। যার অর্থ, গ্রুপ বি-র ভাইরাসদের একমাত্র ডি এন এ-ই (কারণ তাদের মধ্যে ছিল তেজস্ক্রিয় ফসফরাস) আক্রমণের সময় ব্যাকটেরিয়াদের কোষের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে, তাদের প্রোটিন অংশ বাইরেই থেকে গেছে।

এই পরীক্ষা প্রমাণ করলো, ডি এন এ-ই প্রজননগত ঘটনাবলীর জন্যে দায়ী। বংশ গতির যাবতীয় চাবিকাঠি থাকে ডি এন এ'র মধ্যে।

হারশে ফাজ ভাইরাসের নিউক্লেয়িক অ্যাসিডের পূর্ণ মানচিত্রটি তৈরি করতে সমর্থ হন এবং প্রমাণ করেন T/2 ভাইরাসের ক্ষেত্রে ডি এন এ অণুই মুখ্যত ক্রোমোজোমের ভূমিকা গ্রহণ করে।

সালভাদোর লুরিয়া ইটালির মানুষ। প্রশিক্ষণও ইটালিতেই ঘটেছিল। কিন্তু তরুণ বয়সেই তিনি চলে যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে গিয়ে ফাজ ভাইরাস বিষয়ক গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। ডঃ টি এফ. অ্যানডারসন এবং তিনিই সর্বপ্রথম ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের সাহায্যে ফাজ ভাইরাস দেখার বিরল সৌভাগ্য অর্জন করে-ছিলেন। ডেলব্রুক এবং তিনি ই. কোলি ব্যাকটেরিয়ার দেহ নিঃসৃত ফাজ ভাইরাসের সন্তান সন্ততি (মিউটেনট্স) সংগ্রহ এবং পৃথকীকরণে সমর্থ হন। তিনি এবং ডেলব্রুক প্রমাণ করেন, ব্যাকটেরিয়ার দেহের ভেতর মিউটেন্ট সৃষ্টির ব্যাপারটা একটা স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা।

অধ্যাপক হিসাবেও নাম করেছেন লুরিয়া। তার বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে আছেন জেমস ওয়াটসন, যিনি ক্রিকের সঙ্গে মিলিতভাবে ডি এন এ'র গঠন সম্পর্কে নতুনভাবে আলোকপাত করেছেন।

লুরিয়া সুবক্তা। বিশিষ্ট মার্কিন বিজ্ঞানী অ্যাকটিভিস্টদের তিনি অন্যতম প্রবক্তা।

বলতে বাধা নেই ডেলব্রুক, হারশে এবং লুরিয়ার অবদান প্রজনন বিজ্ঞানে এক নতুন এবং অভূতপূর্ব পথ নির্দেশক। তাঁদের আবিষ্কার ভবিষ্যতে ক্যানসার, ডায়াবেটিজ প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগ নিরসনের উপায় অন্বেষণে পাথেয় হয়ে দাঁড়াবে বলে অনেকের বিশ্বাস।



নোবেল পুরস্কার ১৯৭০

পদার্থ বিজ্ঞান

'হের অ্যালফ্‌ভেন, আপনি ম্যাগনেটো হাইড্রোডায়নামিক্‌সের (MHD) স্রষ্টা। বিজ্ঞানের এই বিশেষ আঙ্গিনাকে সমৃদ্ধ করার ব্যাপারে আপনি এক অভূতপূর্ব নজির স্থাপন করেছেন। আপনি দেখিয়েছেন, পদার্থ বিজ্ঞানের এই নতুন শাখাটি শুধু নক্ষত্রমণ্ডলই নয়, পৃথিবীরও বহু ঘটনা বুঝে ওঠার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্যভাবে সাহায্য করেছে। এই অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের জন্যে সুইডিস রয়েল অ্যাকাডেমি অফ্‌ সায়ান্সেসের পক্ষ থেকে আপনাকে আমি অভিনন্দিত করছি।' উল্লেখ্য, চৌম্বক ক্ষেত্রের সান্নিধ্যে বৈদ্যুতিক আধানের প্রবাহ চলাকালে তার গতিপ্রকৃতি কেমন হবে ম্যাগনেটো-হাইড্রোডায়নামিকস্‌ সে ব্যাপারে বিশদ তথ্যাবলী জানতে সাহায্য করে। পরিভাষায় এই বিশেষ বিষয়টির হয়ত আমরা নাম দিতে পারি 'চৌম্বক-উদগতিবিদ্যা'।

'মঁসিয়ে নে, আপনার কৃতিত্ব, অ্যান্টিফেরো এবং ফেরিম্যাগনেটিজম-এর উপর আপনার আবিষ্কার চৌম্বক বিজ্ঞানের আধুনিকতম তত্ত্বাবলীর উন্নতি সাধনে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অ্যাকাডেমির তরফ থেকে এর জন্য আপনাকে সম্বর্ধনা জানাই।

'মঁসিয়ে অ্যালফ্‌ভেন এবং মঁসিয়ে নে, আপনাদের আমন্ত্রণ জানাই, মহামান্য সুইডিস অধিপতির হাত থেকে আপনারা আপনাদের নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করুন।'

১৯৭০ সালের নোবেল পুরস্কার বিতরণী সভায় যাঁরা পদার্থ বিজ্ঞানে পুরস্কৃত হন তাঁদের সম্বর্ধনা জানানোর দায়িত্ব পড়েছিল সুইডিস রয়েল অ্যাকাডেমি অফ্‌ সায়ান্সেসের অধ্যাপক টরস্‌টেন গুসটাফসনের ওপর। সম্বর্ধনাবাণী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সভায় প্রচণ্ড করতালি। আর সেই সঙ্গে শোনা গেল কিছু স্বগতোক্তি। যাঁরা ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে থেকে। তাঁদের মতে ঘটনাটা কিছু বিলম্বে ঘটলো। তবে তাঁরা খুশি হয়েছেন। যদিও এই পুরস্কার ওই দুইজন বিজ্ঞানীকে অনেক আগেই দেওয়া উচিত ছিল বলে তাঁরা মনে করেন।

ধরা যাক অ্যালফ্‌ভেনের কথা।

আমরা জানি সূর্য থেকে প্রতিমুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ছে এক ধরনের ঝড়। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'সোলার উইন্ড' বা সৌর ঝটিকা। সাধারণ ঝড় বলতে আমরা বুঝি বাতাসের ঝড়। এই সৌর ঝটিকাও এক ধরনের বাতাসের ঝড়। সেই বাতাসের নাম প্লাজমা।

প্লাজমা আবার কি বস্তু?

সাধারণ অভিজ্ঞতায় যে কোন পার্থিব বস্তুকে আমরা তিনটি অবস্থায় পেয়ে থাকি। কঠিন, তরল এবং গ্যাস। যেমন জল জমে হয় কঠিন বরফ। সাধারণ তাপমাত্রায় জল বিরাজ করে তরল হিসেবে। তাপমাত্রা বাড়ান। ওই জলই আবার পরিণত হবে গ্যাসে। বস্তুতঃ পদার্থের তিনটি অবস্থার সংগে আমরা পরিচিত। সেই অবস্থা তিনটি হলো কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয়।

কিন্তু কোন পদার্থকে যদি প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত করা যায়, সেক্ষেত্রে আরও একটি অভিজ্ঞতা ঘটতে পারে। ধরুন, কোন মৌলিক পদার্থের তাপমাত্রা তোলা হলো তিন, চার, পাঁচ অথবা ছয় হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস। ওই তাপমাত্রায় মৌলিক পদার্থ মাত্রই গ্যাসীয় অবস্থায় বিরাজ করে। প্রচণ্ড উত্তাপ শক্তির প্রভাবে তখন পদার্থের পরমাণুর মধ্যে অবস্থানরত ইলেকট্রন কণারা ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ হয়। পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে ঘিরে পরিক্রমণ করে ইলেকট্রন। ওই অবস্থায় পরমাণুর এক বা একাধিক ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারপাশের কক্ষপথ থেকে ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসে। এর ফলে পরমাণু আয়নিত হয়। এবং তখন ওই প্রচণ্ড তাপমাত্রায় যা বিরাজ করে তা হলো এমন ধরনের গ্যাস যার উপাদান বলতে বোঝায় মৌলিক পদার্থের আয়ন এবং ইলেকট্রনের মিশ্রণ। পদার্থের এই অবস্থাকে বলা হয় প্লাজমা। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন, পদার্থের চতুর্থ অবস্থা। এই অবস্থায় পরমাণুর ইলেকট্রন কম থাকায় পরমাণু ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয়। আর ইলেকট্রন নিজেই তো ঋণাত্মক তড়িৎধর্মী কণা। ফলে প্লাজমার মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ ঘটে থাকে।

বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, সৌরমণ্ডল থেকে শুরু করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র, এমন কি মহাকাশ পরিমণ্ডলেও প্লাজমার অস্তিত্ব বর্তমান। আমাদের সূর্য থেকে প্লাজমার ঝড় যখন পৃথিবীর পরিমণ্ডলে এসে উপস্থিত হয়, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র সেই ঝড়কে তখন আকর্ষণ করে। এর ফলে ইলেকট্রন কণাগুলি পৃথিবীর চৌম্বক বলরেখা বরাবর ধাবিত হয়ে পৃথিবীর মেরু অঞ্চলে গিয়ে পেঁছয় এবং সৃষ্টি করে মেরুপ্রভা। এই মেরুপ্রভা সৃষ্টির ব্যাপারেই মৌলিক ব্যাখ্যা যুগিয়েছেন অধ্যাপক হানস্‌ আলফ্‌ভেন।

অ্যালফ্‌ভেনের আবিষ্কৃত তত্ত্ব থেকে জানা গেছে, প্লাজমার গতির সঙ্গে চৌম্বক ক্ষেত্রের সম্পর্ক খুবই নিবিড়। প্লাজমার মধ্যে যে সব আয়ন থাকে তারা ধনাত্মক তড়িৎ আহিত কণা বা 'পজিটিভলি চার্জড্‌ পারটিল্‌স'। পক্ষান্তরে ইলেকট্রন ঋণাত্মক তড়িৎ ধর্মী কণা। চৌম্বকক্ষেত্রে এই ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক তড়িৎ ধর্মী কণারা পরস্পর পৃথক দিকে বরাবর প্রবাহিত হয়। যার ফলে সৃষ্টি হয়

তড়িৎ প্রবাহ। এই তড়িৎ প্রবাহের পারস্পারিক প্রতিক্রিয়ার দরূন সৃষ্টি হয় যান্ত্রিক শক্তি বা 'মেকানিক্যাল ফোর্স'। এই যান্ত্রিক শক্তি প্লাজমার বেগ এবং ঐ বেগের অভিমুখ সম্পূর্ণভাবে পালটে দেয়। চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে বিদ্যুৎ আধানের এই যে গতির, আবির্ভাব এই ঘটনাটিই সৃষ্টি করেছে নতুন এক বিজ্ঞান। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ম্যাগনেটো হাইড্রোডায়ানামিকস্'। অ্যালফ্‌ভেন দেখিয়েছেন, প্লাজমার গতি তরঙ্গ গতিরই অনুরূপ। যাকে বলা চলে 'ম্যাগনেটো-হাইড্রোডায়ানামিকেল ওয়েভ'! অ্যালফ্‌ভেনের সম্মানে তরঙ্গটির নামকরণ হয়েছে 'অ্যালফ্‌ভেন ওয়েভ'।

অ্যালফ্‌ভেনের মৌলিক অবদান, তিনিই সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন কসমিক ফিজিকস্ বা ব্রহ্মাণ্ড বিষয়ক পদার্থ বিজ্ঞানের বহু জটিল প্রশ্ন, চৌম্বক ক্ষেত্রের বল ম্যাগনেটো হাইড্রোডায়ামিক্‌সের সাহায্যে সমাধান করা যায়। তাঁর আগে এ ব্যাপারে এই দুইটি বলের কথা কেউই ভেবে দেখেন নি। তাঁর আবিষ্কার সূর্য এবং তার গ্রহগুলির সৃষ্টি রহস্যের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা যোগাতে সমর্থ হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন, সৃষ্টির আদিকালে সূর্যের পরিমণ্ডল থেকে নির্গত হয়েছিল 'হাইড্রো-ম্যাগনেটিক ওয়েভ'। বেরিয়ে আসার পর ওই তরঙ্গ সূর্যের চৌম্বক বলরেখা বরাবর ধাবিত হয় এবং গ্রহগুলি যখন সৃষ্ট হচ্ছিল, তখন তাদের আবর্তন-শক্তি যোগাতে সমর্থ হয়।

এ ছাড়াও অ্যালফ্‌ভেন দেখিয়েছেন, সৃষ্টির সময় প্লাজমার মেঘের মধ্যে গড়ে উঠেছিল ছোট্ট আয়তনের একটি সামগ্রী। যার নাম দেওয়া হয়েছে সেণ্ট্রাল বডি'। এই 'সেণ্ট্রাল বডি'ই পরে সূর্য এবং তার বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। মহাজাগতিক পরিমণ্ডলে আলোর সমান গতিবেগ নিয়ে প্লাজমার মেঘ—যা মুখ্যতঃ ইলেকট্রন এবং আয়নের সমষ্টি—ছুটে চলা সত্ত্বেও কী ভাবে সেই প্লাজমা মহাজাগতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া চালিয়ে একটি স্থিতিস্থাপক অবস্থা বজায় রাখে, অ্যালফ্‌ভেনের তত্ত্ব থেকে তারও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অতিকায় নাক্ষত্র বস্তু বা সুপারনোভার গঠন এবং তাদের বিস্ফোরণের ঘটনার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে তাঁর এই তত্ত্ব সেটা বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হয়েছে। প্লাজমার ভৌতিক ধর্মাবলী সম্পর্কে বিশদ আভাস দিতেও সমর্থ হয়েছেন তিনি। তাঁর আবিষ্কার তাপ পারমাণবিক সংযোজন চুল্লি বা থার্মোনিউক্লিয়ার ফিউশন রিঅ্যাকটার পরিকল্পনা করার ব্যাপারে সাহায্য করেছে।

অ্যালফ্‌ভেনের 'এম এইচ ডি' তত্ত্বের মূল কথা: গ্যাস বা তরল চরিত্রের কোন বস্তু ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'ফ্লুইড', (যদি তা তড়িৎবাহী বা 'কনডাকটর' হয়) চৌম্বক ক্ষেত্রের বলরেখা সেই ফ্লুইডের মধ্যে পড়লে তার গতি শ্লথ হয়ে যায়। আলফ্‌ভেন এই 'শ্লথ' শব্দটিকে ইংরেজিতে বলেছেন 'ফ্রোজেন'। ধরা থাক পারদের কথা। পারদ তরল পদার্থ এবং বিদ্যুৎ পরিবাহীও এবার কল্পনা করুন, গবেষণাগারে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করা গেল। সেই চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করা হল পারদ। দেখা যাবে পারদের গতি ভীষণ কমে গেল। কারণ এ ক্ষেত্রে পারদের মধ্যে এক ধরনের তড়িৎ প্রবাহ আবিষ্ট হয়। যার নাম eddy current। প্রবহমান বস্তুর আয়তন বাড়ালে 'ড্যাম্পিং' বা গতির ওই বেড়ে যাওয়াটা

হ্রাস পায়। এতে করে এটাই প্রমাণিত হয়, এ ক্ষেত্রে চৌম্বক ক্ষেত্রের বল রেখা চট্ করে ওই প্রবহমান তড়িৎপরিবাহীর মধ্যে থেকে সহজে বেরিয়ে আসতে পারে না।

এইভাবে কল্পনা করলে শেষ পর্যন্ত আরও একটি ব্যাপার দেখা যাবে। ধরা যাক প্রবহমান তড়িৎ-পরিবাহী বস্তুর আয়তন খুবই বড়। তার মধ্যে দিয়ে চৌম্বক ক্ষেত্রের বলরেখা অনুপ্রবেশ করবে। দেখা যাবে এ ক্ষেত্রে ওই চৌম্বক রেখাকে প্রবহমান ফ্লুইড তার চারপাশে টেনে নিয়েছে। একদিকে ফ্লুইডের টান; সেই সঙ্গে চৌম্বক রেখাও চেষ্টা করছে তার নিজস্ব অবস্থাটি বজায় রাখতে। এর ফলে ফ্লুইডের উপর সৃষ্ট হয় একটি চাপ। ফলে প্রবহমান ওই ফ্লুইডের একটি 'বল' কাজ করতে থাকে।

অ্যালফ্‌ভেন এ নিয়ে স্টকহোমের রয়েল ইনস্টিটিউট অফ্ টেকনোলজিতে দীর্ঘদিন গবেষণা করেন। ভূ-পদার্থ এবং জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞানের বহু ঘটনা তাঁর এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছে। এই গবেষণায় তিনি একথাই বলতে চেয়েছেন, চৌম্বক বলরেখা যেন 'ইলাস্টিক স্ট্রিং' বা স্থিতিস্থাপক তারের মত বস্তু। যা টানলে বাড়ে। টান ছেড়ে দিলে আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে। প্লাজমা (যা বিদ্যুৎ পরিবাহী) ওই চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয় এবং ওই সময় 'ইলাস্টিক স্ট্রিং'-এর মত চৌম্বক রেখা প্লাজমার উপর প্রতিক্রিয়া করে।

১৯৪২ সালে তিনি প্রস্তাব করেন, ওই 'স্ট্রিং' বরাবর এক ধরনের তরঙ্গ সৃষ্ট হয়। এই তরঙ্গকেই তিনি বলেছেন 'হাইড্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ'। পরে তরঙ্গের নাম দেওয়া হয়েছে 'অ্যালফ্‌ভেন ওয়েভ'। তাঁর গবেষণাগারেই হাতে নাতে পরীক্ষা করে এই তরঙ্গের অস্তিত্বটি প্রমাণ করেছেন এস. ও. লুনডকুইস্ট এবং বি. লেনহার্ট! ভূ-চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে ক্ষুদ্রাকার কম্পন দেখা যায়। পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ গোলার্ধে যেখানে চৌম্বক রেখার মিলন ঘটে সেখানে চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে সব সময় একটা অশান্তভাব পরিলক্ষিত হয়। অ্যালফ্‌ভেনের তত্ত্ব এই সব ঘটনারও ব্যাখ্যা যোগাতে সমর্থ হয়েছে।

অ্যালফ্‌ভেন বুঝতে পেরেছিলেন, প্লাজমার মধ্যে চৌম্বক ক্ষেত্রে যে পরিমাণ বল রেখা সন্নিবেশিত হয়ে থাকে, যদি তা মাপা যায়, তাহলে প্লাজমার কাঠিন্যও জানা যেতে পারে। ১৯৪৩ সালে তিনি প্রমাণ করেন, সৌর-কলঙ্ক যেখানে গড়ে ওঠে সেখানকার বস্তু সামগ্রী অপেক্ষাকৃত শীতল। অতএব তার ঘনত্বও নিশ্চয় বেশি হবে। যদি তাই হয়, তা হলে ওই অঞ্চলের যাবতীয় সামগ্রীর সূর্যের গভীরতম অঞ্চলে ডুবে যাওয়ার কথা। কারণ আশেপাশের অঞ্চল অনেক গরম এবং হাল্কা। বাস্তবে কিন্তু তা হয় না। নিচ থেকে হাল্কা বস্তু ভেসে এসে যে উপরের সৌর কলঙ্ক অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত ভারী ওই বস্তু ঢেকে দিতে পারে না এর কারণ সৌর কলঙ্কের চারপাশে যে চৌম্বক ক্ষেত্র-রেখাগুলি সৃষ্ট হয়, তারাই সৌর কলঙ্ককে টেনে উপরের দিকে ভাসিয়ে রাখে। যেন চৌম্বক রেখাগুলি ইলাস্টিক সুতোর মত টান টান করে সূর্যের উপরি তলে ভাসিয়ে রাখতে সাহায্য করে সৌর-কলঙ্কদের।

১৯৩২ সালে সৌর-ঝটিকা সম্পর্কে প্রামাণ্য চিত্র তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছিলেন অ্যালফভেন। ওই সময় সৌর-ঝটিকা এবং মেরুপ্রভাব কার্যকারণ সম্পর্কে একটি নতুন তত্ত্বও দাঁড় করান তিনি। সূর্য থেকে আগত আয়নিত কণা কীভাবে পৃথিবীর চৌম্বক এবং বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়, এই তত্ত্ব সে ব্যাপারে যথাযথ ব্যাখ্যা যোগাতে সমর্থ হয়েছে।

হানস অ্যালফভেনের জন্ম নরকুওপিং-এ, ১৯০৮ সালে। বাবা জোহানেস অ্যালফভেন, মা আন্না-ক্লারা রোমানুস। বাবা মা দুজনই পেশায় ছিলেন চিকিৎসক। শিক্ষা উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৩৪ সালে ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তিনি পদার্থ বিজ্ঞানে ডক্টরেট হন। এরপর স্টকহোমের নোবেল ইনসটিটিউটে তিনি যোগ দেন। তাঁর যুগান্তকারী বিদ্যুৎ-তত্ত্ব, বৈদ্যুতিক তত্ত্ব (ইলেকট্রনিক্স) এবং প্লাজমা তত্ত্ব প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৪০, ১৯৪৫ এবং ১৯৬৩ সালে। ১৯৬৭ সালে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (সান ডিয়েগো) পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে আছে ঃ কসমিক্যাল ইলেকট্রোডায়ানামিকস (১৯৪৮), অরিজিন অফ সোলার সিস্টেম (১৯৫৬) এবং কসমিক্যাল ইলেকট্রোডায়ানামিকস ও ফান্ডামেন্টাল প্রিনসিপলস (১৯৬৩)। শেষোক্ত এই গ্রন্থটি রচনার সময় তাঁর সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন সি. জি. ফালথামার।

লুই নে'র অবদান, চৌম্বক বিজ্ঞানের একটি বলিষ্ঠ ধারাবাহিকতার তিনি উত্তরসূরী হিসেবে কাজ করেছেন। এমন একটি ধারাবাহিকতা যা ফরাসী চৌম্বক বিজ্ঞানীদের মধ্যেই সম্ভবতঃ সার্থক হয়ে উঠেছিল। তাঁর পূর্বসূরীদের মধ্যে ছিলেন কুরী, লাঁজেভিন এবং ভিৎস (weiss)। বস্তুতঃ নে যখন স্টার্সবোর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন, সেখানেই তিনি অধ্যাপক হিসেবে পেয়েছিলেন ভিৎসকে। আর তখনই খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই গবেষক হিসেবে সেখানে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সেটা ১৯৩০-এর দশক। বলা বাহুল্য, ওই সময় নে তাঁর সেই অসামান্য 'অ্যান্টিফেরো-ম্যাগনেটিজম' তত্ত্বটির প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গ, চুম্বকের রহস্য।

হ্যাঁ, প্রায় দুই হাজার বছর আগে চৌম্বক-কম্পাসের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল মানুষের। এবং সেটা চীনে। চীনের কিছু কিছু মানুষ লক্ষ্য করেন, ম্যাগনেটাইটের (ম্যাগনেটাইট খনিতে পাওয়া যায় লোহার এক ধরনের আকরিক পদার্থ হিসেবে) সংগে এক খণ্ড লোহাকে ঘর্ষণ করলে সেই লোহা চুম্বকে পরিণত হয়। সেই চুম্বককে যদি এবার সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তার বিশেষ একটি প্রান্ত সব সময় পৃথিবীর উত্তর বরাবর অবস্থান করে, অপর প্রান্তটি থাকে দক্ষিণ বরাবর। এইভাবেই একদিন তৈরি হয়েছিল দিক্ দর্শন যন্ত্র বা কম্পাস।

কম্পাস তৈরি হলো। কিন্তু সেই সংগে সপ্রশ্ন হলো সবাই। কম্পাসের বিশেষ একটি প্রান্তই বা কেন উত্তর দিকে মুখ করে থাকে, আর অপর প্রান্তই বা থাকে দক্ষিণ

দিক বরাবর ? জোর করে তাদের মুখ ঘুরিয়ে দিলেও দেখা যায়, আবার তারা ঘুরে ফিরে ওই ভাবেই অবস্থান করছে। কিন্তু কেন ? কোন্ শক্তি তাকে ওইভাবে আচরণ করতে বাধ্য করে ? শিশু থেকে শুরু করে বড়রা, এমনকি বিজ্ঞানীদের কাছেও এই ঘটনা অদ্ভুত রহস্য হিসেবেই থেকে গিয়েছিল দীর্ঘকাল।

বিজ্ঞানীরা বহুদিন আগে থেকেই জানতেন, চৌম্বকধর্ম অনুসারে বিভিন্ন বস্তুকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। বস্তুগুলিকে যথাক্রমে বলা হয় ফেরোম্যাগনেটিক, ডায়াম্যাগনেটিক এবং প্যারামেগনেটিক। যে সব বস্তুর উপর চুম্বকের আকর্ষণ প্রবল অথবা যে সব বস্তুকে প্রবলশক্তি সম্পন্ন চুম্বকে পরিণত করা যায়, তাদের বলা হয় ফেরোম্যাগনেটিক বস্তু। এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে লোহা, নিকেল, কোবল্ট, ইস্পাত প্রভৃতি। কিছু কিছু বস্তু আছে যাদের উপর চৌম্বক বলের প্রভাব কম অর্থাৎ যারা চুম্বকের আকর্ষণে সাড়া দেয় কম, তাদের বলা হয় প্যারাম্যাগনেটিক বস্তু। এদের মধ্যে পড়ে তামা, প্লাটিনাম, ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি। এ ছাড়া কোন কোন বস্তু আবার আকর্ষণ তো দূরের কথা, বরং চুম্বকের সামনে এলে বিকর্ষিত হয়। শেষোক্ত এই বস্তুদের বলা হয় ডায়াম্যাগনেটিক বস্তু। প্রায় সব রকম বস্তুই, বিশেষ করে জল, জৈব পদার্থ প্রভৃতি এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে।

বস্তুর চৌম্বক ধর্ম ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে নানা জন নানান তত্ত্ব দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। আমপেয়ার তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আমপেয়ার পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন, চুম্বকের সঙ্গে বিদ্যুৎ শক্তির সম্পর্ক রয়েছে। বিদ্যুতের প্রভাবেই কোন কোন বস্তু চৌম্বক চরিত্র অর্জন করে। ইতিমধ্যে জার্মান বিজ্ঞানী ওয়েবার দাঁড় করালেন আরও একটি তত্ত্ব। এই তত্ত্বে বলা হলো, যে সব বস্তুর মধ্যে চৌম্বকধর্ম প্রকাশ পায়, তাদের প্রতিটি পরমাণুই এক একটি খুদে খুদে চুম্বক। ওই সব খুদে চুম্বকেরও থাকে দুটি করে মেরু। উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু। পারমাণবিক ওই চুম্বকগুলিই পর্যায়ক্রমে পরস্পর সজ্জিত হয়ে বস্তুকে চৌম্বক চরিত্র দান করে। ১৯০৭ সালে পিয়েরে ভিৎস বলেন, পারমাণবিক চুম্বক বা চুম্বক কণারা বিশেষ ধরনের একটি বলের প্রভাবেই সজ্জিত অবস্থায় থাকে। তবে সেই বলটির সত্যিকারের পরিচয় কি, ভিৎস সে কথা বলতে পারেন নি। ১৯১১ সালে নিলস বোর দেখান, শুধুমাত্র বিদ্যুৎ প্রবাহের দ্বারা চৌম্বক শক্তি সৃষ্টি হতে পারে না। এর জন্যে দরকার সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কোন শক্তি। ১৯২৮ সালে বোরের পারমাণবিক তত্ত্বের উপর নির্ভর করে হাইজেনবার্গ ফেরোম্যাগনেটিক বস্তুর মধ্যে পারমাণবিক চুম্বকের সজ্জার কারণটি ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হন। অর্থাৎ ফেরোম্যাগনেটিজম, ডায়া এবং প্যারাম্যাগনেটিজম সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা যোগালেন অনেকেই।

এই তিন ধরনের চুম্বকের সঙ্গে সংযোজিত হলো আরও এক ধরনের চুম্বক। আর এ কাজটি করলেন লুই নে।

১৯৩২ সালে নে প্রমাণ করলেন, কোন কোন বস্তুর মধ্যে আরও এক ধরনের চৌম্বক চরিত্র পরিলক্ষিত হয়। যার নাম দিলেন তিনি 'অ্যান্টিফেরোম্যাগনেটিজম্'। এদের

তাপমাত্রা যখন কমানো হতে থাকে তখন ক্রমে এদের চৌম্বক-প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এই বৃদ্ধির পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় সবচেয়ে বেশি। তারপর তাপমাত্রা আরও কমালে চৌম্বক-প্রবণতা কমতে থাকে। তিনি দেখালেন, ফেরো-ম্যাগনেটিক বস্তুর মধ্যে পারমাণবিক চুম্বক যেমন পরস্পর সমান্তরালভাবে সজ্জিত থাকে, এবং সে ক্ষেত্রে চুম্বক কণাদের দক্ষিণ মেরুগুলি সব সময় মুখ করে থাকে দক্ষিণ দিকে, উত্তর মেরুগুলি মুখ করে থাকে উত্তর বরাবর, তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্নতর সজ্জাও দেখা যায়। যেমন, কোন কোন কেলাসের মধ্যে দেখা যায়, কাছাকাছি চৌম্বক কণারা পরস্পর সমান্তরাল ভাবে থাকে না, থাকে প্রতি-সমান্তরাল বা অ্যান্টি-প্যারালাল ভাবে। এ ধরনের বস্তুর মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় অ্যান্টিফেরোম্যাগনেটিয় ধর্ম। তিনি প্রমাণ করেন, বিশেষ একটি তাপমাত্রায় বস্তুর অ্যান্টিফেরোম্যাগনেটিয় চরিত্র লোপ পায়। এই তাপমাত্রার নাম দেওয়া হয়েছে 'নে পয়েন্ট' বা 'নে টেমপারেচার'। ব্যাপারটা 'কুরী টেমপারেচারের' সঙ্গে তুলনীয়। বিশেষ বিশেষ ফেরোম্যাগনেটিক বস্তুকে বিশেষ বিশেষ তাপমাত্রা পর্যন্ত উত্তপ্ত করলে তারা তাদের চৌম্বক ধর্ম হারিয়ে ফেলে। ওই তাপমাত্রাকে বলে 'কুরী পয়েন্ট' বা 'কুরী টেমপারেচার'। নে দেখান, বস্তুর কেলাসের মধ্যে পরমাণুগুলি কীভাবে সজ্জিত থাকবে তার উপরই নির্ভর করবে বস্তুর অ্যান্টিফেরো-ম্যাগনেটিক ধর্ম।

১৯৪৮ সালে নে আরও একটি মৌলিক আবিষ্কারের কৃতিত্ব অর্জন করেন। ফেরাইট বস্তুর মধ্যে (ম্যাগনেটাইট যাদের মধ্যে অন্যতম) প্রবলতর চৌম্বক বলের আবির্ভাব কেন ঘটে, এই আবিষ্কার তা ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন ঃ লোহার আকরিক ম্যাগনেটাইট অণুর মধ্যে থাকে তিনটি লোহার পরমাণু এবং চারটি অকসিজেন পরমাণু (Fe_3O_4)। এবং এ ক্ষেত্রে দুটি লোহার পরমাণুর চৌম্বকত্ব পরস্পরের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে ধ্বংস হয়ে যায়। তৃতীয় পরমাণুটিই সৃষ্টি করে তার চৌম্বক ক্ষেত্র। তাঁর বক্তব্য, চীনারা প্রাচীনকালে যে ম্যাগনেটাইট দিয়ে কম্পাস তৈরি করতো, তা আদৌ 'ফেরোম্যাগনেটাইট' ছিল না, ছিল 'ফেরিম্যাগনেটাইট'।

পরবর্তী কালে চুম্বক সংশ্লেষণ শুরু হয়। যাদের বলা হয় 'সিনথেটিক ম্যাগনেট'। নতুন ধরনের এই চুম্বকের বর্ণনা এবং চরিত্র সম্পর্কেও মূল্যবান ব্যাখ্যা যুগিয়েছেন লুই নে। কম্পিউটার বা যন্ত্রগণকের 'স্মৃতি' (মেমারি) এবং উচ্চতর কম্পাঙ্কের প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তাঁর ওই সব ব্যাখ্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়াও চৌম্বক-ক্ষেত্র এবং ক্ষুদ্রতম চৌম্বক কণা 'সুপার-প্যারাম্যাগনেটিজম'-এর উপর তাঁর গবেষণাবলী সাম্প্রতিক চৌম্বক বিজ্ঞানকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে।

লুই নে'র জন্ম লিয়ঁ শহরে। ১৯০৪ সালে। ১৯২৮ সালে স্ট্রাসবোর্গ থেকে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। গ্রেনোবল-এ তিনি যে গবেষণাগারটি গড়ে তুলেছেন, চৌম্বক বিজ্ঞানের এখন তা পীঠস্থান।

জনৈক ভাষ্যকারের মন্তব্য ঃ চুম্বকের এমন কোন সমস্যা নেই নে যা নিয়ে মাথা ঘামান নি। তিনি বার বার এ কথাই বলতে চেয়েছেন, "ম্যাগনেটিজম্ ইজ্ এ পার্ট অফ্ সলিড-স্টেট ফিজিক্স অ্যান্ড অ্যাজ পার্ট অভ্ ফিজিক্স ইন জেনারেল।"

প্রশ্নটি ছিল এই ঃ দীর্ঘকাল ধরে আমরা শুনে আসছি, জৈব রাসায়নিক পদ্ধতিতে নিজেদের শরীরে নানা রকম কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা সংশ্লেষণ করে উদ্ভিদ শরীরের অভ্যন্তরে ? এই সংশ্লেষণের সময় যে সব রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি চলে তাদের স্বরূপই বা কী রকম ?

এই প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন অধ্যাপক লুই লেলোয়া (Luis Leloir)। তাঁর অসামান্য এই কৃতিত্বের জন্যে নোবেল কমিটি তাঁকে ১৯৭০ সালের রসায়ন বিভাগের পুরস্কারটি দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

নোবেল কমিটির পক্ষ থেকে লেলোয়াকে সম্বর্ধনা জানাতে গিয়ে সুইডিস রয়েল অ্যাকাডেমি অফ্ সায়ান্সেস-এর অধ্যাপক কার্ন মায়ারব্যাক মন্তব্য করেছেন, ডঃ লেলোয়া 'সুগার-নিউক্লিওটাইডস্' আবিষ্কার করেছেন, কী ভাবে তারা জীব-রাসায়নিক পদ্ধতিতে সংশ্লেষিত হয়ে কার্বোহাইড্রেট তৈরি করে, সে ব্যাপারে বিশদ ব্যাখ্যা যোগাতেও সমর্থ হয়েছেন তিনি। তাঁর এই আবিষ্কার জীব-রসায়নে এক মৌলিক অবদান।

কার্বোহাইড্রেটের বিপাক পদ্ধতি নিয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা চালিয়েছেন ডঃ লেলোয়া। আবিষ্কার করেছেন এক শ্রেণীর চিনি। যাদের রাসায়নিক নাম 'নিউক্লিওসাইড় ডাইফসফেট সুগারস্'। এদের রাসায়নিক গঠনও আবিষ্কার করেছেন তিনি। পরবর্তীকালে এই সব রাসায়নিক যৌগের উপর নির্ভর করে জটিল কার্বোহাইড্রেট পলিমারগুলির সংশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা সম্ভব হয়েছে। নোবেল পুরস্কার এই কাজেরই স্বীকৃতি। উল্লেখ্য. কোন যৌগের একাধিক অণু পরস্পর মিলিত হয়ে যখন বৃহত্তর অণু তৈরি করে, তখন শেষোক্ত ওই অণুকেই ইংরেজিতে বলা হয় পলিমার।

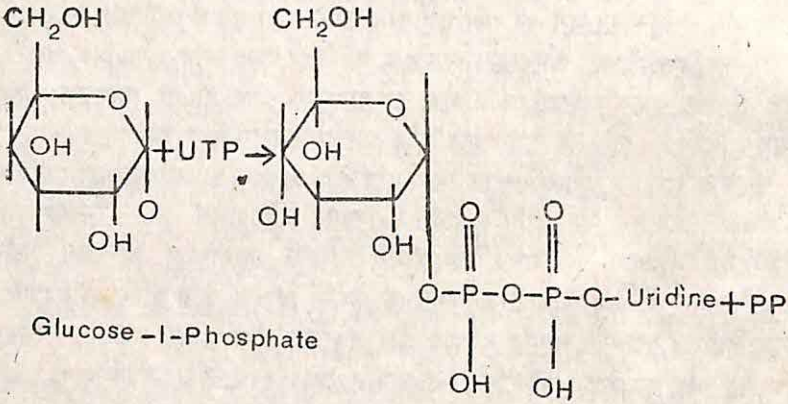
লুই লেলোয়ার জন্ম প্যারিসে, ১৯০৬ সালে। শিক্ষাস্থল বুয়েনস আয়াস বিশ্ববিদ্যালয়। কর্মময় জীবনের বেশির ভাগই তাঁর অতিবাহিত হয়েছে আর্জেন্টিনায়। ১৯৩৬ সালে ডকটর অভ্ মেডিসিন উপাধি লাভ করার পর তিনি চলে আসেন কেম্‌ব্রিজে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তখন জীব-রসায়ন গবেষণা ক্ষেত্রে সারা পৃথিবীতে শিরোনাম।

লেলোয়া এবং তাঁর গবেষক দল গোড়ার দিকে দুগ্ধজাত চিনির (মিলক্ সুগার) সংশ্লেষণ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। এর জন্যে প্রাণীদের কোষকলা নিয়ে কাজ করতে হয়েছিল তাঁদের। কিন্তু কিছুদিন পর লেলোয়া বুঝতে পারলেন, প্রযুক্তিগত ঝামেলার দরুন দুগ্ধজাত চিনি নিয়ে কাজ করায় প্রচুর অসুবিধে। তাই এ ব্যাপারে তিনি সাহায্য নিলেন এক ধরনের ছত্রাক বা ঈস্ট কোষের। নাম Saccharomyces fragilis। এই ছত্রাকের উপর গবেষণার সময় তাঁরা আবিষ্কার করেন এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ, যাদের বলা হয় কো-ফ্যাকটর।

উচ্চতর তাপমাত্রায় এই কো-ফ্যাকটর শ্রেণীর রাসায়নিক যৌগ তাদের স্থায়িত্ব বজায় রাখতে পারে। তাঁরা আবিষ্কার করেন, গ্লাক্‌টোজ এল ফসফেট (Glactose-l Phos

phate) নামক এক ধরনের চিনিকে গ্লুকোজ-এল-ফসফেট (Glucose-l-Phosphate) নামক আর এক ধরনের চিনিতে রূপান্তরিত করতে গেলে বিশেষ ধরনের এই কো-ফ্যাকটরটি দরকার। উল্লেখ্য, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চিনির বিপাকের সময় চিনির সঙ্গে ফসফেট গ্রুপ সংযোজিত হয়। ফসফেট সমন্বিত এই চিনিগুলিকেই বলা হয় নিউক্লিওটাইড।

দীর্ঘ পরিশ্রম এবং গবেষণাগারের অপ্রতুল ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে লেলোয়া এই কো-ফ্যাকটরকে পৃথক করতে সমর্থ হন। এবং আবিষ্কার করেন কো-ফ্যাকটরটি আসলে ইউরিডিন ডাইফসফেট গ্লুকোজ বা সংক্ষেপে UDP-গ্লুকোজ নামে এক ধরনের যৌগ।



Glucose-l-Phosphate

Uridine.dephosphate glucose

যৌগটির রাসায়নিক গঠন উপরের ছবির সাহায্যে দেখানো হলো। স্পষ্টতঃই দেখা যায়, যৌগটির মধ্যে আছে গ্লুকোজ রিং। তার সঙ্গে নিউক্লিওসাইড ইউরিন পাইরো-ফসফেট গ্রুপের সঙ্গে সেতুবন্ধন করে রেখেছে ইউরিডিন রাইবোনিউক্লেয়িক অ্যাসিড বা 'আর এন এ'র একটি মৌলিক উপাদান।

পরবর্তীকালে লেলোয়া অনুরূপ আরও অনেক রাসায়নিক যৌগ আবিষ্কার করেন। এই সব যৌগেরও বৈশিষ্ট্য ওই একই রকম। নানা রকম চিনি নিউক্লিওসাইডের সঙ্গে পাইরোফসফেট সেতু দিয়ে যুক্ত। যৌগগুলির সবই প্রাণী এবং উদ্ভিদ দেহের মধ্যে সংশ্লেষিত হয় নিউক্লিওসাইড ট্রাইফসফেটস্ এবং বিভিন্ন রকমের চিনির সঙ্গে পারস্পরিক বিক্রিয়ায়। এই বিক্রিয়ার জন্যে প্রয়োজন এক শ্রেণীর উৎসেচক সামগ্রী বা এনজাইম, নাম পাইরোফসফোরাইলেজেস।

কারবোহাইড্রেট যৌগের বিপাক ঘটে জীবদেহের অভ্যন্তরে। ওই সময় ডাইফসফেট চিনিগুলির ভূমিকা হয় 'দাতা'র মত। নির্দিষ্ট এনজাইমের সহায়তার তারা তাদের চিনির অংশটুকু অপর কোন 'গ্রাহক' অণুকে দান করে। যেমন, লেলোয়া এবং তাঁর সতীর্থরা এক ধরনের উদ্ভিদজাত এনজাইম আবিষ্কার করেছেন, যা UDP-গ্লুকোজের গ্লুকোজ অংশকে ফ্রুকটোজ নামক চিনির অণুতে স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে অনুঘটক

হিসেবে কাজ করে। এবং এইভাবে তৈরি হয় ডাইস্যাকারাইড সুকরোজ বা সাধারণ চিনি। প্রাত্যহিক জীবনে যে চিনি আমরা খেয়ে থাকি সেই চিনি। এ ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন প্রাণী এবং উদ্ভিদের শরীরে যে সব বৃহদাকার চিনি বা কার্বোহাইড্রেট দেখা যায়, হয়ত তারাও এই একই পদ্ধতিতে তৈরি হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ স্বরূপ প্রাণিদেহের গ্লাইকোজেন এবং উদ্ভিদ দেহের স্টার্চ-এর কথা বলা যেতে পারে।

গ্লাইকোজেন এবং স্টার্চ প্রাণী এবং উদ্ভিদকে শক্তি যোগায়। একাধিক চিনির যৌগ পরপর শেকলের মত সজ্জিত হয়ে তৈরি করে এই সব যৌগ। যেমন, প্রাণীদের যকৃৎ-এর মধ্যে তৈরি হয় গ্লাইকোজেন। তৈরির পর ওই গ্লাইকোজেন শরীরের মধ্যেই জমে থাকে শক্তির সঞ্চয় হিসেবে। শরীরে যখন শক্তিদায়ী গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ে, গ্লাইকোজেনও তৈরি হয় বেশি পরিমাণে। আবার গ্লুকোজের যখন অভাব হয় তখন গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে গিয়ে গ্লুকোজ তৈরি করে, যা দেহের শক্তি যোগানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

১৯৫৭ সালে লেলোয়া এবং তাঁর সতীর্থরা আবিষ্কার করেন, যকৃৎ থেকে এক ধরনের এনজাইম নির্গত হয়। এই এনজাইম UDP গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ সংশ্লেষণ করার ব্যাপারে সাহায্য করে। ডাইস্যাকারাইড বা সাধারণ চিনি তৈরির সময় UDP-গ্লুকোজের গ্লুকোজ ভাগ স্থানান্তরিত হয়, এবং তারা পরস্পর জুড়ে তৈরি করে ডাই-স্যাকারাইড। পরে দেখা গেছে প্রাণিদেহে গ্লাইকোজেনও সংশ্লেষিত হয় ওই একই ভাবে। এ ক্ষেত্রে যে এনজাইমটি অনুঘটক হিসেবে কাজ করে তারও নাম গ্লাইকোজেন-ফসফোরাইলেজ।

এরপর লেলোয়া এবং তাঁর গবেষক দল 'স্টার্চ' তৈরির ব্যাপারে হাত দেন। এ ক্ষেত্রেও তাঁরা প্রমাণ করেন, UDP গ্লুকোজ থেকেও স্টার্চ তৈরি করা যায়। পরে অবশ্য তাঁরা আবিষ্কার করেছেন, দাতা হিসেবে UDP গ্লুকোজের ভূমিকাই একমাত্র নয়, উদ্ভিদ দেহে স্টার্চ তৈরি করার ব্যাপারে আরও এক ধরনের রাসায়নিক গ্লুকোজ দাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, যার নাম 'অ্যাডোনোসিন ডাইফসফেট গ্লুকোজ'। এর পর প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে, শুধু ডাইস্যাকারাইড বা স্টার্চই নয়; সেলুলোজ, চিটিন, হায়ালিউরোনিক অ্যাসিড এবং কনড্রোটিন সংশ্লেষণের পদ্ধতিও ঠিক ওই একই রকম। ওদের ক্ষেত্রেও নিউক্লিওসাইড ডাইফসফেট সুগার তার চিনির সঙ্গে একের পর একটি চিনি যুক্ত করে ওই সব সামগ্রী তৈরী করে।

শুধু সুগারের স্থানান্তরকরণই এই সব বিক্রিয়ার এক মাত্র কথা নয়। যে সব চিনি ডাইফসফেট নিউক্লিওটাইড যৌগ হিসেবে বিরাজ করে, তাদের মধ্যে রূপান্তরও ঘটতে পারে। যেমন UDP—গ্ল্যাকটোজ রূপান্তরিত হয় UDP গ্লুকোজে। বস্তুতঃ এ ধরনের বিক্রিয়াই লেলোয়াকে UDP গ্লুকোজ আবিষ্কার করতে সাহায্য করেছে। এই আবিষ্কার জীব-রসায়নে একটি দিগন্ত খুলে দিয়েছে। যার ফলে নানা রকম স্যাকারাইড সংশ্লেষণ করা এখন সম্ভব হচ্ছে।

বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইংল্যাণ্ডে) রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ চার্লস গ্রে নোবেল পুরস্কারের কথা ঘোষণা করার পর মন্তব্য করেছেন : বিজ্ঞানীরা এখন ধনী। এখন তাঁদের গবেষণাগারে কত সুযোগ, কত জাঁকজমক। কিন্তু লেলোয়াকে কাজ করতে হয়েছে খুবই সাধারণ অবস্থায়। আর্থিক সঙ্গতির অভাবে তাঁর গবেষণাগারে এখনকার তুলনায় তখন খুব নগণ্যই সুযোগ সুবিধে ছিল। আর তার মধ্যে থেকেই তিনি নোবেল পুরস্কারে বিজয়ী হলেন। তরুণ গবেষকদের কাছে এই ঘটনা একটা মহান দৃষ্টান্ত।

শরীর এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান

১৯৭০ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উপর মিলিতভাবে তিনজন বিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এঁরা মেরিল্যাণ্ডের বেথোডাস্থিত ইনসটিটিউট অব মেণ্টাল হেলথ এর চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডঃ জুলিয়াস অ্যাকসেলরড। বয়েস ৫৮। লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের জীব-পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক স্যার বার্নারড কটেজ। বয়েস ৫৯। জন্ম এবং শিক্ষা জার্মানীর লাইয়েপজিগে। বর্তমানে বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক। সুইডিস ক্যারোলিন ইনসটিটিউট-এর চিকিৎসা শাখার অধ্যাপক ডঃ উলফ ফন অয়লার। বয়েস ৬৫। নোবেল কমিটির ঘোষণা : "They made their discoveries concerning the humoral chemical) transmitter in the nerve terminals and the mechanisms for their storage release and inactivation."

তিনজন বিজ্ঞানীই পৃথকভাবে একই বিষয়ের উপর গবেষণা চালান।

ডঃ অ্যাকসেলরড তখন জনৈক দাঁতের ডাক্তারের অফিসে বসে। এমন সময় তাঁর কাছে খবর এল, এ বছর নোবেল কমিটি মিলিতভাবে যে তিনজনকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করেছেন, তিনি তাঁদের একজন। প্রথমে পরিহাসের মত মনে হলেও যখন শুনলেন, সত্যিই এটা পাকা খবর তখন মন্তব্য করেন, 'এ ধরনের পুরস্কার পাওয়া যে কোন বিজ্ঞানীর কাছেই একটি স্বপ্ন। আমি অভিভূত! রোমাঞ্চ বোধ করছি।'

ওদের আবিষ্কার মানসিক রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে এক অভিনব এবং যুগান্তকারী অবদান!

আমাদের শরীরের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে বিশেষ এক ধরনের স্নায়ুতন্ত্র। যাকে বলা হয় সিমপ্যাথেটিক নার্ভাস সিসটেম বা সমবেদী স্নায়ুতন্ত্র। শারীরিক যন্ত্রাবলীর কোথায় কখন এবং কীভাবে কোন কাজটি করা দরকার তার যাবতীয় সংকেত এই স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে দিয়েই আনাগোনা করে। আনাগোনা করে আলোর মত গতিবেগে। যাকে আমরা ইচ্ছে-শক্তি বলি, মুখ্যত এর উপর তার কোন প্রভাব নেই। সম্পূর্ণ স্বনিয়ন্ত্রিত এর কার্যাবলী। লক্ষ লক্ষ শাখা প্রশাখা নিয়ে ছড়িয়ে থাকে শরীরের সর্বত্র। যখন কারুর ক্ষিদে পায় অথবা তৃষ্ণা, শরীরের বিপাকীয় কাজকর্মের দরুন যা ঘটে থাকে,

তার সংকেত আপনা থেকেই এই স্নায়ুতন্ত্র মস্তিষ্কে পেঁছে দেয়। হৃদপিণ্ড যেন প্রকৃতিদত্ত নিয়মেই জন্মমুহূর্ত থেকে জীবনের শেষক্ষণ পর্যন্ত স্পন্দিত হয়ে চলেছে। আমরা ইচ্ছে করলেই কি সাময়িকভাবে তার স্পন্দন বোধ করতে পারি? শারীরিক প্রয়োজনে শিরা-উপশিরার মধ্যে যে রক্ত চলাচল ঘটে থাকে তার জন্যে বিরামবিহীন সংকোচন এবং সম্প্রসারণ চলে ফুসফুসে। আমরা খাবার খাই। সে খাবার গিয়ে পেঁছয় পাকস্থলীতে। অথবা ক্ষিধে পাওয়ার সংগে সংগে জিভের ওপর ছড়িয়ে পড়ে বিশেষ ধরনের জারক রস 'স্যালাইভা'। খাবার পাকস্থলীতে গেল, অমনি পিত্তরস বেরিয়ে এসে সেই খাবারের সঙ্গে মিশে তাদের শরীরের গ্রহণযোগ্য সামগ্রীরূপে পরিবর্তিত করল। অথবা দৈনন্দিন কাজের দরুন শরীরের যে ক্ষয়-ক্ষতি, বিশেষ রাসায়নিক পদ্ধতিতে তাদের সারিয়ে তোলা। এমন হাজারো কাজ প্রতিমুহূর্তে কেমন আপনা থেকেই আমাদের দেহে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। হাতের কোন অংশ কেটে গেল। অমনি বিশেষ ধরনের কোষ সেই কাটা অংশ জোড়ার কাজ শুরু করে দিল। ইত্যাদি। আরও কত!

কিন্তু কীভাবে এই জোড়ার কাজটি চলে? কার নির্দেশে চলে? মস্তিষ্কই অবশ্য এ সমস্ত কার্যকারণের নিয়ামক। কিন্তু তারও আগে কোথায় কখন এবং কী করতে হবে তার যাবতীয় বার্তা মস্তিষ্ককে মনের অগোচরেই যে জানিয়ে দেয়—তার নাম সমবেদী স্নায়ুতন্ত্র। শুধু জানিয়ে দেওয়াই নয়। জানানোর পর করণীয় যাবতীয় নির্দেশও এই স্নায়ুতন্ত্র বয়ে নিয়ে পেঁছে দেয় শরীরের প্রয়োজনীয় অংশে। সেই নির্দেশ অনুসারেই সম্ভাব্য কাজকর্ম সম্পন্ন হয়। এই যে স্বনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা এ যেন নেহাৎ আপনা থেকেই কাজ করে চলেছে। আমরা জেগে থাকি, ঘুমোই অথবা সাময়িক অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকি—আমৃত্যু শরীরের এই কাজ সমানে চলে থাকে।

কিন্তু এর চেয়েও আরও চমকপ্রদ এক স্নায়ুতন্ত্র আমাদের শরীরে বিশেষ বিশেষ সংকেত বহনের জন্য নিযুক্ত রয়েছে। যার নাম সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম বা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র। আমাদের মধ্যে সচেতনতা বলে যে বৈশিষ্ট্যটি কাজ করে তার নিয়ন্ত্রণের মূলে রয়েছে এই চমকপ্রদ স্নায়ুতন্ত্রের যোগসাজশ। একটি স্বকীয় আচরণবিধি নিয়ে প্রায় সমস্ত রকমের প্রাণীই জন্মগ্রহণ করে। পরে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংঘাতের ফলে তার পরিবর্তন হয়। আমাদের শিক্ষাদীক্ষা বলতে যা বুঝি, মনোবিজ্ঞানীরা জানেন তার বেশিরভাগই দানা বেঁধে ওঠে বাইরে থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতারই ফলে। আর এসবের নিয়ন্ত্রণের মূলে কাজ করে সেণ্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম বা সংক্ষেপে C N S। এরা আসলে মস্তিষ্ক এবং স্পাইনাল কর্ড বা সুষুম্নাকাণ্ড। মুখ্যত এরা দুই রকমের কোষ দিয়ে তৈরি—স্নায়ুকোষ বা নিউরোন এবং গ্লাইয়াল কোষ। মানুষের মস্তিষ্কে কোটি কোটি নিউরোন আছে এবং তার চাইতেও বেশি গ্লাইয়াল কোষ। গ্লাইয়াল কোষের সঠিক ভূমিকা কী, বিজ্ঞানীরা আজও পর্যন্ত তার সদুত্তর যোগাতে পারেন নি। সম্প্রতি কেউ কেউ বলছেন, নিউরোনের অতি ক্ষুদ্র পরিবেশের মধ্যে সম্ভাব্য স্থিতিস্থাপকতা রক্ষা করাই নাকি তাদের দায়িত্ব।

নিউরোন বস্তুত বিশেষ এক ধরনের কোষ। অতি ক্ষুদ্র। যার সঙ্গে জুড়ে থাকে কতকগুলি শাখা-প্রশাখা। একটি নিউরোনের শাখা-প্রশাখা অন্যান্য নিউরোনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে ; সংখ্যায় তারা কয়েক সহস্রও হতে পারে। এই অগণিত শাখা-প্রশাখার একটি লম্বায় অনেকটা বড় হয়। একে বলা হয় এক্সোন। উদ্ভিদের প্রধান মূলের মত কিছুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে এক জায়গায় থেমে পড়ে এবং তার প্রান্তস্থল থেকে কতকটা উদ্ভিদের গুচ্ছমূলের মত সূক্ষ্মতম তন্তু সৃষ্টি করে ছড়িয়ে দেয়। এই সূক্ষ্মতম তন্তু একটি গিঁটের মত অগ্রভাগ তৈরি করে এক জায়গায় এসে থেমে পড়ে এবং অপরাপর কোষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। দেখা গেছে, কোন কোন কোষের সঙ্গে এই ধরনের প্রায় ৬০০০০টি প্রান্ত এসে মিলিত হয়েছে।

এক্সোন-এর গায়ের আবরণী তড়িৎ-শক্তির স্পর্শে উদ্দীপ্ত। তড়িৎ সংকেত এর ভেতর দিয়ে কোন কোষ থেকে নিউরোনের ঐ শাখা-প্রশাখার প্রান্তে গিয়ে হাজির হয়। আর প্রান্তে পেঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ। যার নাম 'ট্রান্সমিটার সাবসট্যান্স' বা সংবাহক বস্তু। এই সংবাহক বস্তুই পরবর্তী নিউরোনকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। এইভাবেই পর্যায়ক্রমে স্নায়ুকোষের মধ্য দিয়ে পারিপার্শ্বিক উদ্দীপনা যাতায়াত করে। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়—চক্ষু কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা এবং ত্বক—এদের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে শরীরের কেন্দ্রীয় স্নায়ু-তন্ত্র। বাইরের অনুভূতি এদের মাধ্যমেই প্রথমে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পেঁছায়। তারপর বিশেষ বিশেষ মাত্রার বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে গিয়ে উপস্থিত হয়।

এমনও প্রমাণ পাওয়া গেছে, বিশেষ ধরনের পরিবেশগত উদ্দীপনা নির্দিষ্ট নিউরোন গোষ্ঠীকেই শুধু সক্রিয় করে তোলে। অনেকের ধারণা কোন কোন ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক উদ্দীপনা নিউরোনের মধ্যে স্থায়ী পরিবর্তনও ঘটায়। এরই ফলেই বিশেষ বিশেষ স্মৃতি আমাদের মধ্যে স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধে। যখনই নিউরোন তার পরিবর্তিত দশা থেকে চ্যুত হয়, প্রোথিত স্মৃতিও আমরা হারিয়ে ফেলি। প্রসঙ্গত বলে রাখি, পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন বলতে এখানে পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি পাই তাদেরই বোঝানো হয়েছে। দেখা গেছে, ইঁদুরকে কিছুক্ষণ যদি অন্ধকার ঘরে বন্ধ করে রাখা হয় তার নিউরোনের এক্সোনের সেই তন্তুগুলির গিঁটের মত প্রান্তের চরিত্র বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ঠিক ওই পরিবেশে বিড়ালছানার নিউরোনের শাখা-প্রশাখার সংখ্যা কমে যেতে দেখা গেছে। যদি তার একটি চোখ বেঁধে দিয়ে আর একটি চোখ খুলে রাখা যায় এবং খোলা চোখটির সামনে সাধারণ আলোকরশ্মি নিক্ষেপ করা হয়, তা হলে ঢাকা চোখটির সংশ্লিষ্টকোষগুলির দৃষ্টিশক্তি বিকাশের ক্ষমতা অনেকটা ক্ষীণ হয়ে পড়ে। দেখা গেছে, যে সমস্ত প্রাণীর খুব কম বয়সে থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডটি অকেজো হয়ে যায়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মানসিক এবং দৈহিক গঠনের মধ্যে অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ে। এদের নিউরোনের শাখা-প্রশাখার সংখ্যা তখন কমে যায়। সেই সঙ্গে তাদের বিস্তৃতিও। অর্থাৎ এক কথায় বলা চলে, মস্তিষ্কের এই কোষতন্ত্রের যাকে স্নায়ুকোষ বা নিউরোন, যাই বলা হোক না কেন, তাদের স্বাভাবিক কার্যাবলীর

উপরই নির্ভর করে একটি সুস্থ মানসিক কাঠামো। তার বিচিত্র বিন্যাস অথবা যথাযথ চরিত্রাবলীর মধ্যে যখনই অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ে, শুরু হয় স্নায়ু-তন্ত্রের বৈক্লব্য। যায় অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মানসিক অসুস্থতা।'

স্নায়ুকোষ সম্পর্কে এত কথা বললেও সঠিক কীভাবে বাহ্যিক অনুভূতি প্রাণী-দেহের মধ্যে সংবাহিত হয়—সংবহনের সময় স্নায়ুকোষের মধ্যে সঠিক কী ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটে থাকে, সেটা শুধু বৈদ্যুতিক না রাসায়নিক, সে কথা নিয়ে প্রচুর মত-বিরোধ দেখা দিয়েছে। নিউরোন-তত্ত্ব দানা বাঁধার সময় হাজারো প্রশ্ন উঠেছিল। এবং তার কারণও ছিল। প্রতিপক্ষের বক্তব্য, পৃথিবীতে এমন প্রাণীও তো আছে, যাদের দেহে আদৌ কোন স্নায়ু-তন্ত্র গড়ে ওঠে নি? অথচ তাদের মধ্যেও তো স্মৃতির অস্তিত্ব ধরা পড়ে? প্যাভলপের কুকুরের গল্প না হয় উচ্চতর প্রাণীর ক্ষেত্রে খাটে, কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাটি কেমনতর হওয়া উচিত? উজ্জ্বল আলোর স্পর্শে এক-কোষী প্রাণীর মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। আলো তাদের মধ্যে কীভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি করে?

না, এবারকার পুরস্কারপ্রাপ্ত ত্রয়ী নোবেল বিজ্ঞানী পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, বাইরের অনুভূতি; সেটা যেভাবেই প্রাণীর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে অনুপ্রবেশ করুক না কেন, প্রাথমিক পর্যায়ে তা বিদ্যুৎ শক্তিরূপে স্নায়ুকোষের মধ্যে কাজ করলেও, ঐ কোষের সংশ্লিষ্ট অণুর মধ্য দিয়ে চলার সময় তা আর বিদ্যুৎ শক্তি-রূপে থাকে না। শুধু রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া রূপেই কাজ করে। আর যদি তাই হয়, সেই রাসায়নিক প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে মস্তিষ্ক কোষের অস্বাভাবিক কাজকর্মও নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে।

ওঁরা আবিষ্কার করেছেন, কোষের আণবিক পর্যায়ে বিশেষ বিশেষ ধরনের রাসায়নিক যোগই স্নায়বিক স্পন্দন সংবাহনে মধ্যস্থতা করে। ফলে ভবিষ্যতে স্নায়বিক বা মানসিক রোগ চিকিৎসা করার সময় শুধু এটা দেখলেই চলবে, রোগীর স্নায়ুতে ঠিক কোন কোন মধ্যস্থ-সামগ্রীর অভাব রয়েছে। তারপর কৃত্রিম পদ্ধতিতে অনুরূপ সামগ্রী তৈরি করে তার সাহায্যে চিকিৎসা চালালেই রোগটিকে সারিয়ে তোলা সম্ভব হবে। বর্তমানে মানসিক রোগচিকিৎসার জন্যে 'ট্র্যাঙ্কুলাইজার' বা স্নায়ু-প্রশমনকারী ওষুধ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এতে যে ফল পাওয়া যায় তা নিতান্তই সাময়িক। মৌলিক ত্রুটি তাতে সারে না। যদি সর্বতোভাবে ওঁরা সফল হন, তা হলে বর্তমানে মনো-চিকিৎসকরা যেমন কিছুটা অনুমান, কিছুটা অনুসন্ধান এবং পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে মানসিক ব্যাধি নিরাময়ের চেষ্টা করেন, অদূর ভবিষ্যতে সেটার আর প্রয়োজন হবে না। তখন শুধু রোগীর স্নায়ু-কোষে সঠিক কোন রাসায়নিক যোগের অভাবের দরুন রোগের উৎপত্তি তা জেনে নিলেই চলবে। এখন যেমন টাইফয়েড সর্দি-জ্বর, প্রভৃতি ওষুধ দিয়ে সহজে সারিয়ে তোলা হয়, ঠিক তেমনি বিভিন্ন মানসিক বা স্নায়বিক রোগের উপশম করানোও তখন সহজ হয়ে উঠবে।



নোবেল পুরস্কার ১৯৭১

পদার্থ বিজ্ঞান

তত্ত্বের দিক দিয়ে ত্রিমাত্রিক ছবি সম্পর্কে অধ্যাপক ডেনিস গাবর প্রথম সরব হয়ে উঠেছিলেন ১৯৪৮ সালে। ইম্পিরিয়েল কলেজে ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের কতকগুলি জটিল সমস্যা নিয়ে তখন তিনি ব্যস্ত।

প্রায় তেইশ বছর আগে সম্ভাব্য কতকগুলি ঘটনা ডেনিস গাবরের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। একটি মাত্র চিন্তা : ধরুন, ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের বিবর্ধন ক্ষমতা না হয় আরও বহুগুণ বাড়ানো গেল। ধরুন, আধুনিকতম সেই যন্ত্রটি নিয়ে কোন গবেষক জটিল কোন জীবন্ত প্রাণীকোষের মধ্যে কী ধরনের কাজকর্ম চলছে সেটা দেখতে বসলেন। কোষের বিশেষ অংশে মাইক্রোসকোপটি যখন ফোকাস করা গেল অর্থাৎ অনুবীক্ষণের দৃষ্টিটি যখন সেই অংশে কেন্দ্রীভূত হল, ভদ্রলোক নিশ্চয় সেই জায়গাটির ছবি স্পষ্ট করেই দেখতে পাবেন? যদি ওই একই সময়ে কোষটির অন্য কোন জায়গা দেখার ইচ্ছে হয়, মনে করুন কোষটির গভীরে বিশেষ কোন অংশে, তখন অনুবীক্ষণের ফোকাস বিন্দুকে ওই জায়গায় সরিয়ে নিতে হবে। কারণ এ কথা সকলে জানেন, কোন জায়গা ভালভাবে দেখতে গেলে সেই জায়গাটিকে ফোকাসের মধ্যে আনতে হবে। নইলে স্পষ্টভাবে তা দেখা যায় না। অতএব যুগপৎ কোষের বিভিন্ন অংশ একই সময়ে অনুবীক্ষণের সাহায্যে দেখা সম্ভব নয়।

এবার মনে করুন, ভদ্রলোকটির ইচ্ছে হল কোষটির সামনের দিকটা যখন তিনি দেখছেন তখন তার পেছনের অংশে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া চলছে সেটা দেখেন। এক্ষেত্রে তাঁকে অসুবিধেয় পড়তে হবে। কারণ মাইক্রোসকোপে যে ছবি ফুটে ওঠে সেটা দ্বিতলীয় ছবি, সাধারণ ক্যামেরায় যে ধরনের ছবি আপনারা তোলেন ঠিক সেই রকম। তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ দুইই আছে, কিন্তু বেধ নেই।

ধরুন, কোন আবহাওয়া-বিজ্ঞানী শক্তিশালী ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের সাহায্যে বাতাসে ভাসমান কণিকার ছবি তুলতে গেলেন। প্রচলিত পদ্ধতিতে তিনি যে ছবি

তুলবেন তা দেখে কোন কণিকা কত দূরে অবস্থান করছে সেটা নিশ্চয় জানা সম্ভব নয়। অথচ পরে গবেষণার প্রয়োজনে ঠিক যে অবস্থায় অনুবীক্ষণের ভেতর দিয়ে নিজের চোখে ঐ কণিকাদের যে যে অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন, আবার সেইভাবে তাদের যদি তিনি দেখতে চান ওই ছবি কোন কাজেই আসবে না। একই কথা বলা চলে শারীর অথবা জীব-রসায়ন বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রেও। আসল কথা, এমন একটা ছবি চাই, যার মধ্যে ফুটে উঠবে কোন বস্তুর পরিমাপীয় অবস্থা, পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে তার অবস্থান প্রভৃতি। অর্থাৎ ওই ছবিতে যখন কোন বস্তুকে দেখবেন, আপনার পরিষ্কার বুঝে ওঠা চাই, বস্তুটি চেপটা না গোল, আশপাশের আর সমস্ত সামগ্রীর দূরত্ব তার থেকে কতটা ইত্যাদি। তার দৈর্ঘ্য. প্রস্থ ও বেধ খালি চোখে দেখলে যেমনটি মনে হয় ছবিতে তার ভাবটি যেন পুরোপুরি ফুটে ওঠে। এরই নাম ত্রিমাত্রিক ছবি। সাধারণ ক্যামেরায় যে ছবি কখনই আপনি পেতে পারেন না।

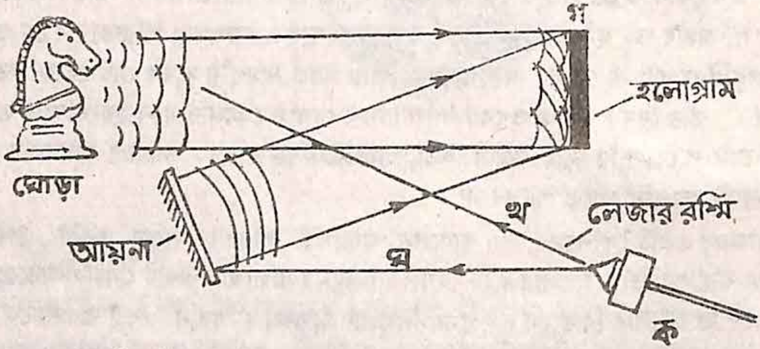
অভিনব একটি কৌশলের কথা ভাবলেন অধ্যাপক গাবর। নতুন একটি উপায় উদ্ভাবন করলেন তিনি আলোর দুটি মৌলিক নিয়মের সাহায্যে। একটি ইনটারফিয়ারেন্স অব লাইট বা আলোর বিচ্ছুরণ। প্রথম নিয়মটি এইরকম ঃ ধরুন একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দুটি আলোকরশ্মি কোন বস্তুকণার উপর এসে পড়ল। পড়ার সময় যদি এমন হয়, উভয় রশ্মির দুটি তরঙ্গ সমপর্যায়ের অর্থাৎ দুটি তরঙ্গেরই কুঁজ বা উপর দিকের ঢেউ খেলানো অংশ পুরোপুরি সমান, এবং সমগতিভিত্তিক অবস্থায় থাকে তা হলে ঐ দুটি তরঙ্গ পরস্পর মিলিত হয়ে ওই জায়গাটিকে উজ্জ্বলতর করে তুলবে। কিন্তু এর উল্টোটি ঘটলেই জায়গাটি পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে যাবে। অর্থাৎ বিপরীত পর্যায়ের তরঙ্গ মিলিত হলে সেখানে আর কোন আলো দেখা যাবে না। এরই নাম আলোর প্রতিবন্ধকতার নিয়ম। দ্বিতীয় নিয়মটি হল ঃ আলোকরশ্মি কোন সুক্ষ্ম বাধা অতিক্রম করার সময় আংশিক পাশ বরাবর বেঁকে যায়, যাকে বলা হয় ডিফ্রাকশন। এই দুটি নিয়মের সাহায্যে গাবর তাঁর ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব গঠনের পদ্ধতিটি তাত্ত্বিকভাবে দাঁড় করালেন। যার নাম রাখা হল হলোগ্রাফি এবং যে ফিল্মের উপর বস্তুর প্রতিবিম্ব প্রোথিত করা হল তাকে বলা হল হলোগ্রাম। অর্থ পরিপূর্ণ সংকেত গ্রাহক। সংকেত বলতে এখানে অবশ্য মুখ্যত আলোর সংকেতের কথাই বলা হয়েছে।

অভিনবত্বের দিক দিয়ে গাবরের কৌশল নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু আবিষ্কারের মুহূর্তে অসুবিধেয় পড়লেন গাবর। তত্ত্ব তো তৈরি হল, তাকে কাজে লাগানো যায় কী করে? কারণ তাঁর এই পদ্ধতিতে ছবি তুলতে হলে যে আলো চাই তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য সব সময় সমান হতে হবে। এবং সেই তরঙ্গ সমান তালে কম্পিত হবে। সাধারণ আলোর সাহায্যে এটা সম্ভব নয়। কারণ সকলেই জানেন, সাধারণ আলো বা সাদা আলো বলতে আমরা যা বুঝি তার মধ্যে আছে নানা বর্ণের আলো। তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ভিন্ন ভিন্ন, কম্পাঙ্কও পৃথক পৃথক।

আবিষ্কারের বাস্তব সাফল্য চোখে দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে হল ১৯৬১ সাল পর্যন্ত। ওই সময় আবিষ্কৃত হল পদার্থ বিজ্ঞানের আরও এক যুগান্তকারী পদ্ধতি। নাম লেজার। লেজারের সাহায্যে বিশুদ্ধ আলোকরশ্মি তৈরি করা সম্ভব হল। এই

রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য সমান। তারা সমপর্যায়ে কম্পিত হয়। ওই বছরেই মিশিগানের কয়েকজন বিজ্ঞানী লেজার রশ্মির সাহায্যে নিখুঁত হলোগ্রাম তৈরী করতে সমর্থ হন।

হলোগ্রাম তৈরির মূল পদ্ধতিটি ১নং ছবির সাহায্যে দেখান হল। মনে করুন, ক একটি লেজার যন্ত্র। লেজার থেকে রশ্মি খ গিয়ে পড়ল একটি ঘোড়ার মূর্তির উপর যার আপনি হলোগ্রাম তৈরি করতে চান। মূর্তিটির গায়ে ওই রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে

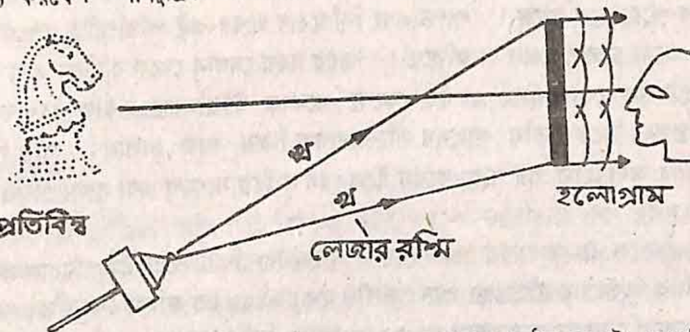


এসে পড়বে ফটোগ্রাফিক প্লেট গ এর উপর। ধরুন ওই একই সময়ে লেজার রশ্মি ঘ কে একটি আয়নার সাহায্যে প্রতিফলিত করে গ প্লেটটির উপর নিক্ষেপ করা হল। প্লেটের ওপর মূর্তির গা এবং দর্পণ থেকে প্রতিফলিত রশ্মি পরস্পর মিলিত হয়ে যে ইনটার-ফেয়ারেন্স সৃষ্টি করবে সেটা লিপিবদ্ধ হবে ঐ ফটোগ্রাফিক প্লেটে। এটিকে পরে রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রস্ফুটিত করা হয়। এরই নাম হলোগ্রাম। সাধারণ চোখে দেখলে ওই প্লেটে মূর্তিটির কোন আভাসই আপনি ধরতে পারবেন না। ব্যাপারটা দাঁড়ায় ঠিক গ্রামোফোনের রেকর্ডের মত। রেকর্ডের উপরকার দাগ দেখে ঠিক কী ধরনের গান সেখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে সেটা যেমন বলা যায় না, তেমনি হলোগ্রামের এলোপাথাড়ি চিহ্ন দেখে সত্যিই তার মধ্যে কী ধরনের প্রতিবিম্ব প্রোথিত রয়েছে বলা শক্ত।

হলোগ্রামের ছবি পুনরুদ্ধার করার পদ্ধতিটি ২নং ছবির সাহায্যে দেখানো হল। এবারও সেই লেজার রশ্মির সাহায্য নিতে হবে। এবং ঠিক যে ধরনের রশ্মি হলোগ্রাম তৈরি করার জন্যে কাজে লাগানো হয়েছিল এবারকার রশ্মি তারই অনুরূপ। প্লেটটির যে দিকে হলোগ্রাম করা হয়েছে, মনে করুন একজন দর্শক সেদিকে চেয়ে আছে। এবার হলোগ্রামের বিপরীত দিক থেকে নিক্ষেপ করা হল লেজার রশ্মি খ। হলোগ্রামে ডিফ্রাকশন বা বিচ্ছুরণ ঘটবে। বিচ্ছুরিত রশ্মি লোকটির চোখে গিয়ে পড়লেই সে ঘোড়ার ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্বটি দেখতে পাবে।

এই পদ্ধতিতে আরও একটি সুবিধে আছে। সাধারণ ছবির ফিলমের একটু অংশ ছিঁড়ে ফেললে ফিলমটি যেমন অকেজো হয়ে যায়, এক্ষেত্রে তেমন কোন ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে না। হলোগ্রামের কিছু অংশ যদি নষ্টও হয়ে যায়, তা হলেও দ্বিতীয় পদ্ধতির সাহায্যে লেজার রশ্মি নিক্ষেপ করে পুরো ছবিটিকেই পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়। গবেষকদের কাছে এটাও বড় একটা লাভ। সম্প্রতি বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের

একাধিক লেজার রশ্মির সাহায্যে এই একই পদ্ধতিতে রঙিন ত্রিমাত্রিক ছবিও তোলা হচ্ছে। এ ছাড়াও শব্দ তরঙ্গের সাহায্যেও হলোগ্রাম তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এ ধরনের হলোগ্রাম মানুষের শরীরের ভেতরকার টিউমার পর্যবেক্ষণ করার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করবে। সামুদ্রিক গবেষণাতেও এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে অনেকেই



আশাবাদী। ভবিষ্যতে সিনেমার ছবি তোলার ব্যাপারেও অভিনব এই পদ্ধতির কথা চিন্তা করছেন কেউ কেউ অদ্ভুত সেই ছবি। সে ছবি তোলার জন্যে ক্যামেরার দরকার হয় না. লেন্স লাগে না। অথচ ছবি যখন দেখবেন, তখন মনে হবে সম্পূর্ণ বাস্তব পরিবেশেই যেন আপনি বসে রয়েছেন। যা কিছু ঘটছে তা একান্তই বাস্তব অভিজ্ঞতা। ১৯৬১র পর অধ্যাপক গাবর লেজার রশ্মির সাহায্যে তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতিটির অভূতপূর্ব সংস্কার সাধন করেছেন। হলোগ্রাফিক পদ্ধতি আবিষ্কার এবং তার সংস্কারের জন্যে ১৯৭১ সালের নোবেল পুরস্কার দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করা হয়।

অধ্যাপক ডানিস গাবর মূখ্যত হাঙ্গেরির অধিবাসী। বৃটেনে স্থায়ীভাবে বাস করতে এসে পরে সেখানকার তিনি নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। জন্ম ১৯০০ খৃষ্টাব্দে, বুদাপেস্টে। ছেলেবেলা থেকেই ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে তাঁর প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন তাঁর পিতা স্বয়ং। এই ভদ্রলোক পেশায় ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তবে প্রযুক্তি বিষয়ক উদ্ভাবনায় তিনি নিজেও যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

স্কুলের পর প্রথম পর্যায়ের পড়াশুনা বুদাপেস্টের টেকনিকেল ইউনিভার্সিটিতে। পরে বার্লিনের Technische Hochule at Charlottenburg-এ। এখানেই তাঁর ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা লাভ। পরে ডকটরেট। প্রথম দিকে ওই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তিনি সহকারী গবেষকরূপে যোগ দেন এবং যুগপৎ জার্মান গবেষণা সংস্থার উচ্চতর তড়িৎবিভব যন্ত্রের উপর বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার কাজেও অংশ গ্রহণ করেন।

বার্লিন তখন তরুণ বিজ্ঞানীদের তীর্থক্ষেত্র। সেখানকার বিজ্ঞানজগতে তখন ভাস্বর হয়ে রয়েছেন আইনস্টাইন, প্লাংক, শ্রোডিঞ্জার, ফন লাউয়ে প্রভৃতি। গাবর এঁদের প্রত্যেকের সংস্পর্শেই এসেছিলেন। তাঁর প্রথম জীবনের সার্থক গবেষণা ক্যাথোড রে

অসিলোগ্রাফের ওপর। এই যন্ত্রটির তিনি নানারকম সংস্কার করেন এবং দীর্ঘকাল তা আদর্শ যন্ত্ররূপে বিজ্ঞানীমহলে যথেষ্ট সমাদর পায়। গ্যাসের তড়িৎমোক্ষণ এবং প্লাজমার উপর তিনি মৌলিক কাজকর্মও করেছেন।

অতঃপর ১৯৩৩। নাৎসিদের অত্যাচারে জার্মানীর বিদগ্ধ সমাজে তখন দারুন অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে। শান্ত এবং নির্বিরোধ গাবর এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে চলে গেলেন হাঙ্গেরিতে। পরের বছর সেখান থেকে বৃটেনে এসে বৃটিশ টমসন-হিউসটন কোম্পানির রাগবি কেন্দ্রে গবেষক ইঞ্জিনিয়ারের কাজ গ্রহণ করেন। এখানে প্রথম দিকে তিনি গ্যাসের তড়িৎমোক্ষণ নিয়ে কাজ চালান। পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পর শুরু করেন ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ এবং হলোগ্রাফির উপর গবেষণা।

১৯৪৮ সালে ঐ সংস্থাটির কাজ ছেড়ে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইম্পিরিয়াল কলেজে ইলেকট্রনিক বিভাগের রীডারের পদে আসীন হন। ১৯৫৮-তে ফলিত বৈদ্যুতিক পদার্থ বিজ্ঞান শাখার অধ্যাপক পদলাভ। ১৯৬০ সালে তিনি তাপ আয়ন-বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রের উপর গবেষণা শুরু করেন। ১৯৬৭-তে অধ্যাপক পদ থেকে অবসর গ্রহণ। তারপর থেকেই ঐ কলেজের তিনি প্রফেসার ইমেরিটাস এবং সিনিয়ার রিসার্চ ফেলো।

১৯৩৬ সালে রাগবিতে কাজ করার সময় কুমারী মারজোরি লুইসে বাটলারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ, পরে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ। মধুর স্বভাবের এই মানুষটি দেশবিদেশের সম্মানও পেয়েছেন অনেক। যেমন হাঙ্গেরির সায়েন্স আকাদেমির অবৈতনিক সদস্য, টমাস ইয়ং মেডেল লাভ, জেনোয়ার ক্রিস্তোফারো কলোম্বো পুরস্কার, রয়েল সোসাইটির রামফোর্ড মেডেল, ফ্রাঙ্কলিন সোসাইটির মাইকেলসন মেডেল, কম্যান্ডার অব দ্য অরডার অব দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ মানুষ সম্পর্কে গাবর শঙ্কিত। তার ধারণা আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যা ক্রমে মানুষের দৈনন্দিন জীবন সীমিত করে তুলছে। যখন কলকব্জা মানুষের বেশির ভাগ কাজই সেরে দেবে, তখন তার অবসরও নিশ্চয় বাড়বে। তাঁর প্রশ্ন, অনাবিল সেই অবসর মুহূর্তগুলি মানুষ কীভাবে কাটাবে সেটাই আজ বড় রকমের সমস্যা। এ ব্যাপারে পৃথিবীর মানুষ নিজেদের এখনও প্রস্তুত করে নিতে পারেনি। বিপদ এখানেই। ১৯৬৩তে এ ধরনের প্রশ্ন এবং পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করেই তিনি প্রকাশ করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইনভেন্টিং দ্য ফিউচার'। বিভিন্ন বিজ্ঞান গ্রন্থ ছাড়াও সাম্প্রতিক কালের মানবিক সমস্যাবলী নিয়ে রচিত তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭০-এ। নাম 'ইনোভেশন ঃ, সায়েন্টিফিক, টেকনোলজিক্যাল অ্যান্ড সোসিয়াল'।

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর কোন কোন মহলে প্রশ্ন উঠেছিল ঃ গাবর বিজ্ঞানী হিসেবে কেমন ? পদার্থবিজ্ঞানের বেশির ভাগ নোবেল বিজ্ঞানীর মধ্যে মৌলিকত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁদের কথা চিন্তা করলে গাবরকে বলা চলে মূখ্যত তিনি একজন এক্সপেরিমেন্টালিস্ট, ফান্ডামেন্টালিস্ট নন।

একথা বলে গাবরের অবদানকে খাটো করা যায় না। কারণ এমন উদাহরণও আছে

যেমন কবক্রফট এবং স্যার ওয়ালটন। ও'রাও মুখ্যাত এক্সপেরিমেণ্টালিস্ট হলেও ও'দের উদ্ভাবনা পরমাণুকেন্দ্রিক বিজ্ঞানকে আজ এক নতুন পথের সন্ধান যুগিয়েছে। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে গাবরের আবিষ্কার শুধু ফটোগ্রাফি নয়, জড়বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় যে যথেষ্ট সাহায্য করবে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

রসায়ন

"মাননীয় সুইডিস অধিপতি, বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, ভদ্রমহিলা এবং সুধিজন, আপনারা এইমাত্র আমাকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করে সম্মানিত করলেন। আপনারা আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন, শুধু এটুকু বলেই আমার কৃতজ্ঞতার সবটুকু প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমি পদার্থবিজ্ঞানী। নোবেল পুরস্কার পেলাম রসায়ন বিজ্ঞানে। বলতে বাধা নেই, এ ধরনের ঘটনা আগেও ঘটেছে। বিশ্বের স্বনামধন্য বিজ্ঞানী এবং পারমাণবিক বিজ্ঞানের জনক আর্নেস্ট রাদারফোর্ডের হাতেও এই রসায়ন বিভাগের নোবেল পুরস্কারটি তুলে দেওয়া হয়েছিল ১৯০৮ সালে। এই উপলক্ষে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যাঁদের কাছে আমি অনুশীলন পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম তাঁদেরও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জেমস্ ফ্রাঙ্ক, ম্যাকস্ বোর্ন, পিটার দুবাই, হ্যারল্ড উরে প্রমুখ। কৃতজ্ঞতা জানাই সুইডেনের দুজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে —হয়েরলিংগার এবং হুলথেনকে, ১৯২০-র দশকে যাঁরা মলিকিউলার স্পেকট্রা (আণবিক বর্ণালী) নিয়ে জটিলতম পরীক্ষার কাজে সর্বপ্রথম সাফল্য অর্জন করেছিলেন।"

"একটি নাটকীয় ঘটনাও মনে পড়ছে এই মুহূর্তে। আজ যে বাড়িতে আমাকে নোবেল পুরস্কার অর্পণ করা হলো, পাঁচ বছর আগে এখানেই স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে সাম্মানিক ডকটরেট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। ওই একই অনুষ্ঠানে আজকের মাননীয় সুইডিস অধিপতিকেও সাম্মানিক ডকটরেট দিয়ে সম্মানিত করা হয়। তাঁকে সম্মানিত করেছিল রয়াল ক্যারোলিন মেডিকো-চিরুর্জিক্যাল ইনসটিটিউট। নোবেল পুরস্কার ছাড়াও আমার অতিরিক্ত আনন্দ এই, আজকের এই অনুষ্ঠানে সারাক্ষণ উপস্থিত থেকে তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গ লাভের সুযোগ দিয়েছেন।"

অধ্যাপক গেরহার্ড হার্জবার্গ। জ্ঞান যখন মহাসাগরের মত পরিব্যাপ্ত হয়, বিনয় সেখানে বিগলিত। সবার নিয়েই তো আমারটা গড়ে ওঠে। সে ঋণ যিনি স্বীকার করেন, তিনিই তো মহানুভব। বরেণ্য তো তাঁকেই বলে। তাই নোবেল পুরস্কার অনুষ্ঠানের উপস্থিত সুধীজন হার্জবার্গের বক্তৃতায় সেদিন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন মুহূর্তে।

নোবেল কমিটির তরফ থেকে হার্জবার্গকে সম্বর্ধনা জানানোর দায়িত্ব পড়েছিল সুইডিস রয়াল অ্যাকাডেমি অভ্ সায়ান্সেসের অধ্যাপক স্টিগ ক্লায়েসনের উপর।

হার্জবার্গ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন ঃ হার্জবার্গ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম আণবিক বর্ণালী বিজ্ঞানীদের মধ্যে একজন। অটোয়ায় তিনি যে গবেষণাগারটি গড়ে তুলেছেন তার সাফল্য নিয়ে কোন বিতর্কই ওঠেনি। একক প্রচেষ্টায় তিনি গবেষণাগারটি গড়ে তুলেছেন তার সঙ্গে কেমব্রিজের ক্যাভেণ্ডিস ল্যাবোরেটারি এবং কোপেনহেগেনের বোর ইনসটিটিউটের তুলনা করা চলে। ক্যাভেণ্ডিসের চেষ্টায় একদিন গড়ে উঠেছিল ক্যাভেণ্ডিস ল্যাবোরেটারি। উত্তরকালে এই গবেষণাগার পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠতম গবেষণাগার হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এখানে গবেষণা করে বহু বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের বহু মৌলিক দিগন্ত উন্মুক্ত করেছেন। পেয়েছেন নোবেল পুরস্কার। নীলস্ বোর, যিনি পরমাণুর গঠন চিত্র আবিষ্কার করে পদার্থ সম্পর্কে মানুষের চিরায়ত ধারণাটাই পালটে দিতে সমর্থ হন কোপেনহোগেনে তৈরি করেছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম পারমাণবিক গবেষণাগার। এক সময়ে তাবৎ পরমাণু বিজ্ঞানীদের কাছে যা তীর্থক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। আটোয়ায় হার্জবাগের গবেষণাগারও ঠিক তেমনই কৃতিত্ব অর্জন করেছে। একক চেষ্টায় এ ধরনের কৃতিত্বের নজির এখন খুবই বিরল ঘটনা।

হার্জবার্গকে ১৯৭১ সালের রসায়ন বিভাগের নোবেল পুরস্কার দিতে গিয়ে নোবেল কমিটি মন্তব্য করেছেন ঃ হার্জবার্গের অবদান, ইলেকট্রনিক স্ট্রাকচার বা ইলেকট্রনীয় গঠন এবং অণুর জ্যামিতিক বর্ণনা যোগানোর ব্যাপারে তিনি অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বিশেষ করে 'ফ্রি র‍্যাডিকেলস'-এর গঠন জানার ব্যাপারে তাঁর আবিষ্কৃত পদ্ধতি অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব হিসেবে পরিগণিত।' উল্লেখ্য, কখনও কখনও দেখা যায় বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু পরস্পর মিলিত হয়ে জোট বাঁধে এবং সেই জোটগুলি এমনভাবে আচরণ করে যেন তারা এক একটি মৌলিক অখণ্ড পরমাণু। এই জোট-গুলিকেই বলা হয় 'র‍্যাডিকেলস' বা যৌগমূলক। যেমন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পরমাণু জোট বেঁধে তৈরি করে এক ধরনের যৌগমূলক। যাকে বলা হয় হাইড্রক্সিল র‍্যাডিকেল। যার সংকেত OH। কার্বন এবং নাইট্রোজেন জোট বেঁধে তৈরি করে সায়ানোজেন র‍্যাডিকেল CN, ইত্যাদি। সাধারণ অবস্থায় মৌলিক অথবা যৌগিক পদার্থের মত এরা স্বাধীনভাবে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। মৌলিক অথবা যৌগের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিশেষ বিশেষ যৌগ সৃষ্টি করে। আর ফ্রি র‍্যাডিকেলস বলতে বোঝায় সেই সব পরমাণু অথবা পরমাণুর জোট যাদের মধ্যে কম করেও একটি জোড়বিহীন ইলেকট্রন থাকে। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'আনপেয়ারড ইলেকট্রন'। এ ধরনের র‍্যাডিকেল বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। মহাকাশে আন্তর্নাক্ষত্রিক পরিমণ্ডলে এ পর্যন্ত পঞ্চাশেরও বেশি ফ্রি র‍্যাডিকেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। কী ভাবে এই সব ফ্রি-র‍্যাডিকেল সেখানে তৈরি হয় সে সম্পর্কে মূল্যবান ব্যাখ্যা জুগিয়েছেন হার্জবার্গ। পৃথিবীর উর্ধ্বাকাশে আছে ওজোন গ্যাসের স্তর। হার্জবার্গের তত্ত্ব এই ওজোন-স্তর তৈরির ব্যাপারেও ব্যাখ্যা যুগিয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে বাতাসের অক্সিজেন ফ্রি-র‍্যাডিকেল

তৈরি করে   পরে তিনটি ফ্রি-র‍্যাডিকেল মিলিত হয়ে তৈরি করে একটি ওজোন গ্যাসের অণু।

হার্জবার্গ পেশাগত জীবন শুরু করেন পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে। ১৯২০-র দশকের শেষে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম আণবিক বর্ণালী বিষয়ক গবেষণাপত্র। এ ধরনের গবেষণার মূল ব্যাপারটা এই : আলোকরশ্মি যখন কোন অণুর উপর আপতিত হয়, ওই আলোকরশ্মিকে সেই অণু কীভাবে শোষণ করে, সেটা জানাই 'মলিকিউলার স্পেকট্রোস্কোপি' বা আণবিক বর্ণালীবীক্ষণ বিজ্ঞানের লক্ষ্য। বলা বাহুলা, আলো বলতে এখানে অদৃশ্য আলো, যেমন আলট্রাভায়লেট বা অতিবেগুনী রশ্মি এবং ইনফ্রা রেড বা অবলোহিত রশ্মির কথাও ধরা হয়েছে। এ ধরনের পরীক্ষার সাহায্যে কোন অণুর মধ্যে কতটা শক্তি নিহিত হয়েছে যথেষ্ট সূক্ষ্মতার সঙ্গে তারও পরিমাপ করা যায়। এই পরিমাপের সাহায্য নিয়ে অণুর গঠন, আকৃতি এবং চরিত্র সম্পর্কে অনেক খবরাখবর জানা যেতে পারে। বলা প্রয়োজন, এ ধরনের গণনায় 'কোয়াণ্টাম মেকানিকস' বা অখণ্ড বলবিদ্যার সাহায্যে নেওয়া হয়ে থাকে। ১৯২০ এবং ১৯৩০ এর দশকে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী বিশেষ এই বিদ্যাটি নিয়ে বিশদ কাজ করেছেন। হার্জবার্গের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তাঁর তাত্ত্বিক অনুসন্ধিৎসা অখণ্ড বলবিদ্যার সাহায্যে আণবিক বর্ণালীবীক্ষণ বিজ্ঞানকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, হার্জবার্গ আসলে তো একজন পদার্থ-বিজ্ঞানী ; হ্যাঁ, জ্যোতি পদার্থবিজ্ঞানীও তাঁকে বলা চলে। কারণ নক্ষত্রমণ্ডলীর বর্ণালী নিয়েও তিনি উল্লেখ-যোগ্য গবেষণা করেছেন। যদি তাই হয়, রসায়ন শাখার নোবেল পুরস্কারের জন্যে কেন তাঁকে নির্বাচিত করা হলো ?

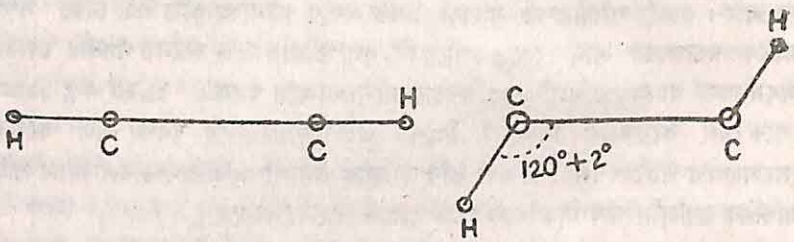
উত্তরটি খুবই সহজ। ১৯৫০ সাল নাগাদ আণবিক বর্ণালীবীক্ষণ বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হয়। দেখা গেল, পদার্থবিজ্ঞান ছাড়াও রসায়ন শাস্ত্রের বহু বিতর্কিত, অজ্ঞাত এবং জটিল সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে বিশেষ এই বিজ্ঞানটির ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্ব-পূর্ণ। হার্জবার্গ তাঁর অনন্যসাধারণ পরীক্ষা নিরীক্ষার সাহায্যে এর সত্যতা প্রমাণ করতে সমর্থ হন। বিশেষ করে তাঁর ফ্রি-র‍্যাডিকেলগুলির ব্যাপারে আবিষ্কৃত তথ্যাবলী রাসায়নিক বিক্রিয়া বুঝে উঠতে যেভাবে সাহায্য করেছে তার তুলনা নেই।

তাঁর বক্তব্য, ধরুন একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানো হবে। যে সব বস্তু দিয়ে তা ঘটাতে চান, তাদের একত্রিত করুন। বিক্রিয়ার সময় প্রথমে অণুগুলি ভেঙ্গে গিয়ে তৈরি করবে কতকগুলি খণ্ডিত উপাদান। এরাই পরস্পর বিশেষভাবে বিন্যস্ত হয়ে মিলন ঘটিয়ে তৈরি করবে বিক্রিয়ালব্ধ সামগ্রী। খণ্ডিত এই উপাদান বা ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'ইণ্টারমিডিয়েটস'—এরাই হলো ফ্রি-র‍্যাডিকেলস।

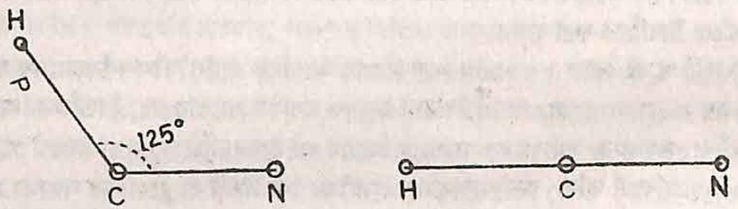
মুশকিল এই, ফ্রি র‍্যাডিক্যালগুলির জীবনকাল এত ক্ষণস্থায়ী যে, এত কম সময়ে তাদের যথাযথ চরিত্র সম্পর্কে কোন কিছু বুঝে নেওয়া শক্ত। সাধারণত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তারা বড় জোর এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগের মত সময় নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। এই অসুবিধে সত্ত্বেও হার্জবার্গের পদ্ধতি তিরিশটিরও

বেশি ফ্রি-র‍্যাডিক্যালের গঠন এবং চরিত্র সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য যোগাতে সমর্থ হয়েছে। এদের মধ্যে আছে মিথাইল এবং মেথিলিন র‍্যাডিক্যালস্।

আরও একটি নাটকীয় ঘটনা আবিষ্কার করেছেন তিনি। তিনি দেখিয়েছেন, কোন র‍্যাডিক্যালের শক্তি বাড়লে তার আকৃতিও পালটায়। যেমন ধরুন মেথিলিন র‍্যাডিক্যাল 'গ্রাউন্ড স্টেট' বা স্বাভাবিক অবস্থায় সরলরৈখিক (linear) কাঠামোয় বিরাজ করে। কিন্তু যে মুহূর্তে এই র‍্যাডিক্যাল কিছুটা শক্তি শোষণ করলো, অমনি তার গঠনও গেল বেঁকে (টাকা বা ক্ষমতার গরম আর কি !)। হার্জবার্গের গবেষণার উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ কয়েক বছরে রসায়ন বিজ্ঞানীরা অনেক রহস্য উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছেন। বিশেষ করে ১৯৬০ এর দশকের শেষে। তাঁর অবদান এখনও অনেক নতুন গবেষণার কাজে ইন্ধন যোগাচ্ছে।



[স্বাভাবিক বা গ্রাউন্ড স্টেট এবং একসাইটেড বা উচ্চতর শক্তি পাওয়ার পর উদ্দীপ্ত অবস্থায় C_2H_2 (অ্যাসিটিলিন অণুর জ্যামিতিক গঠন কেমন দাঁড়ায় দেখানো হল।]



[স্বাভাবিক এবং উদ্দীপ্ত অবস্থায় HCN (হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড-এর জ্যামিতিক গঠন।]

জন্ম ২৫ ডিসেম্বর, ১৯০৪ পশ্চিম জার্মানির হামবুর্গ শহরে। স্ত্রী ওয়েটিংগার। ওঁর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল ১৯২৯ সালে। দুটি সন্তানের জনক। দুঃখ এই। ১৯৭১ সালে নোবেল পুরস্কার পেলেন। আর স্ত্রী-বিয়োগও ঘটলো ওই বছরেই।

হার্জবার্গের প্রথম শিক্ষা হামবুর্গে। ১৯২৮ সালে এখানক্যর ডারমস্টাড্ ইনসটিটিউট অভ্ টেকনোলজি থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে ডক্টরেট উপাধি লাভ। ওই সময় তাঁর গাইড ছিলেন বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী ডব্লু, ভিয়েনের ছাত্র এইচ, রাউ। ১৯২৮০ এর পর গোটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে জেম্স ফ্র্যাঙ্ক এবং ম্যাক্স বোর্ন-এর কাছে গবেষণা। ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়েও গবেষণা করেছেন কিছু দিন। ১৯৩০ সালে ডারমস্টাড বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের লেকচারার হিসেবে যোগ দেন।

১৯৩৫ সালে হার্জবার্গকে উদ্বাস্তু হিসেবে জার্মানী ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। তিনি চলে আসেন কানাডায়। অতিথি অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন সাসকাটুনে অবস্থিত সাসকাচেভান বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত শিকাগোর ইয়ারকেস মানমন্দিরে বর্ণালীবীক্ষণ বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৪৮ সালে কানাডায় প্রত্যাবর্তন। সেখানকার ন্যাশনাল রিসার্চ কাউনসিলের প্রথমে প্রিন্সিপাল রিসার্চ অফিসার, পরে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের পরিচালকের পদে বৃত হন। ১৯৫৫ কাউনসিল বিভক্ত হলে হার্জবার্গ তার বিশুদ্ধ পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের পরিচালক পদটি গ্রহণ করেন। ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি।

পারমাণবিক এবং আণবিক বর্ণালীবিজ্ঞান ছাড়াও, হার্জবার্গ আন্তর্নক্ষত্র জগৎ, আন্তগ্রহের বায়ুমণ্ডল এবং ধূমকেতুর মধ্যে নানারকম অণু এবং ফ্রি-র‍্যাডিক্যাল আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছেন।

সভাপতি এবং সহ-সভাপতি হিসেবে বহু আন্তর্জাতিক বর্ণালী বিজ্ঞান কমিশনের সঙ্গে হার্জবার্গ যুক্ত রয়েছেন। ১৯৩৯ সালে রয়েল সোসাইটি অভ কানাডার ফেলো এবং ১৯৫১ সালে রয়েল সোসাটি অভ্ লণ্ডনের তিনি 'ফেলো' নির্বাচিত হন।

পুরস্কার গ্রহণের সময় তিনি যে বক্তৃতা দেন তার শিরোনাম ছিল ঃ 'স্পেকট্রো-স্কপিক স্টাডিজ্ অভ্ মলিকিউলার স্ট্রাকচার।' এই বক্তৃতায় নিজের গবেষণা প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর কথা তিনি উল্লেখ করেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ভারতীয় নোবেল বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেংকট রামন। তিনি একাধিকবার বলেছেন, পারমাণবিক এবং আণবিক বর্ণালী বিশ্লেষণের ব্যাপারে 'রামন স্পেকট্রা' বা রামন আবিষ্কৃত বর্ণালী তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

শারীর এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান

ডঃ আর্ল সুদারল্যাণ্ড এবং তাঁর পত্নী ক্লাডিয়া মাছ ধরতে গিয়েছিলেন তখন। এটা তাঁদের নেশা। যথাসময়ে ন্যাশভিলের বাড়িতে ফিরে যখন মাছ ধরার সাজ-সরঞ্জামগুলি সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখার ব্যবস্থা করছেন এমন সময় একদল ক্যামেরাম্যান ভিড় করে এসে দাঁড়ালো। ওরা এসেছেন সুইডিস ন্যাশনাল টেলিভিশন থেকে। পরক্ষণেই শুরু হলো একের পর এক আলোর ফ্লাশ, নানাভাবে, নানা দিক থেকে। সেই সঙ্গে একের পর এক প্রশ্ন। না। সুদারল্যাণ্ডের কাছে এটা মোটেই চমকে ওঠার মত ঘটনা ছিল না। তিনি জানতেন এ ধরনের ঘটনা এর অনেক আগেই ঘটে যেতে পারত। অতএব নিতান্ত সহজ মেজাজেই ও'রা যা করতে শুরু করলেন তাতে তিনি কোন বাধা দিলেন না। ও'রা যা জিজ্ঞেস করলেন সহজ সুরেই তার উত্তর যোগালেন।

পরদিন স্টকহোমের রয়েল ক্যারোলিন ইনসটিটিউট থেকে সরাসরি টেলিফোন এল।

খবর, ভ্যাণ্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিজ্ঞানী সুদারল্যাণ্ড তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের জন্যে এ বছর নোবেল পুরস্কার পেলেন। পুরস্কারের পরিমাণ নব্বই হাজার ডলার। অর্থাৎ ছয় লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা। কৃতিত্বের বিষয় হরমোন সম্পর্কীয় কার্যকলাপ।

বয়েস পঞ্চান্ন। মার্কিন নোবেল বিজ্ঞানীদের তালিকায় ইনি চল্লিশতম ব্যক্তি। গত দশ বছরে একক হিসেবে নোবেল পুরস্কারের মত শ্রেষ্ঠতম সম্মানলাভের ঘটনা এই প্রথম। নোবেল পুরস্কার কমিটির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক রলফ লুফট-এর মন্তব্য, 'ইদানিং দেখা যাচ্ছে, কোন আবিষ্কারের কৃতিত্বই এককভাবে কেউ দাবি করতে পারছেন না। ফলে নোবেল পুরস্কারের অংশীদার হয়ে দাঁড়াচ্ছেন দুই বা ততোধিক বিজ্ঞানী। সুদারল্যাণ্ড এই পটভূমিকায় একটি বিশেষ ব্যতিক্রম এবং নিশ্চিতভাবে যোগ্যতম ব্যক্তি।'

হ্যাঁ, বর্তমান দশককে যদি বলি জীবরসায়নের ডি এন এ আর এন এ-র যুগ, পঞ্চাশের দশককে বলা চলে হরমোনের যুগ। হরমোন বা অন্তঃস্রাবী রস সম্পর্কে পৃথিবীর তাবৎ বিজ্ঞানীমহলে অফুরন্ত কৌতূহল। প্রাণীদেহের মধ্যে আছে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি, যেমন থাইরয়েড, পিটুইটারি প্রভৃতি। শরীরের প্রতিটি কোষের বিপাকীয় বা মেটাবোলিক কার্যকলাপের উপর ওই সমস্ত গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক যৌগের প্রভাব অপরিসীম। বিজ্ঞানীদের বক্তব্য কোন কোষ কীভাবে কাজ করবে এ সবের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব হরমোনের উপর। বিভিন্ন গ্ল্যাণ্ড বা অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি থেকে প্রয়োজন অনুসারে হরমোন বেরিয়ে আসে। এসে রক্তে মেশে। তারপর রক্তের মধ্যে দিয়ে বাহিত হয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশে যেখানে যেটির দরকার সেখানে তারা গিয়ে হাজির হয় এবং অতঃপর ওই সমস্ত অংশে বিপাকীয় কাজ চালানোর ব্যাপারে সাহায্য করে। যেমন ধরুন, প্যাংক্রিয়াস বা অগ্ন্যাশয় কোষ। এই অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিটির অবস্থান পাকস্থলীর কাছ বরাবর। এ থেকে নির্গত হয় গ্লুকাগোন (Glucagon) নামে এক ধরনের হরমোন। এর কাজ যকৃৎ থেকে চিনিজাতীয় সামগ্রীকে বের করা। যেমন ধরুন, অ্যাড্রিনেলিন নামে আর এক ধরনের হরমোন। বিশেষ ধরনের এই হরমোনটি আকস্মিক ভয় বা অন্য কোন রকম উত্তেজনার সময় আমাদের রক্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর কাজ শরীরে সঞ্চিত স্নেহজাতীয় পদার্থকে সহজতর পর্যায়ে পরিবর্তিত করা। দেহত্বকের নিচে জমে থাকা কঠিন স্নেহজাতীয় পদার্থ তখন তরলে রূপান্তরিত হয় এবং রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে যে সমস্ত পেশীর কাজ করা দরকার তাদের শক্তি যোগায়। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত গবেষকরা বিশ্বাস করতেন প্রয়োজন অনুসারে হরমোন সরাসরি কোষে উপস্থিত হয় এবং প্রত্যক্ষভাবে তার যাবতীয় রাসায়নিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে।

কিন্তু ওই বছর সুদারল্যাণ্ড যকৃতের কোষকলায় সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ আবিষ্কার করে বসলেন। যার নাম রাখলেন তিনি সাইক্লিক অ্যাডেনোসাইন ৩'-৫' মনোফসফেট বা সংক্ষেপে 'সাইক্লিক এ এম পি'। শুরু তখন থেকেই। অভিনব এই বস্তুটির উপর নিপুণ পর্যবেক্ষণের পর সুদারল্যাণ্ড সিদ্ধান্ত করলেন, আগে যে ধারণা ছিল হরমোনই প্রত্যক্ষভাবে কোষের কার্যকলাপ

নিয়ন্ত্রিত করে, এটা সর্বৈব খাঁটি কথা নয়। অনেক হরমোনের ক্ষেত্রে দেখা গেল আসলে কোষে উপস্থিত হয়ে তারা যা করে, তা হল কোষের মধ্যে কার একপ্রকারের রাসায়নিক যোগের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করা। কোষে কখনও তারা হরমোনের পরিমাণ বাড়ায়, কখনও বা কমিয়ে দেয়। এ ধরনের যোগের নাম 'সাইক্লিক এ এম পি'। যাকে বলা হয় 'সেকেণ্ড মেসেঞ্জার।' সুদারল্যাণ্ডের আবিষ্কার, আসলে এই 'এ এম পিই কোষের যাবতীয় রাসায়নিক কাজকর্ম নিরূপণের বা নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি। তিনি পরীক্ষা করে দেখালেন, যখন কেউ উত্তেজিত হয় তখন তার অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে নিঃসরণেও সাহায্য করে। যেমন অ্যাড্রিনাল থেকে হাইড্রোকরটিসোন নিঃসরণ প্রভৃতি হয়ে থাকে। এটি শরীরকে দীর্ঘ পরিশ্রমের সঙ্গে যুঝতে সাহায্য করে। এমন কি শরীরে ইনসুলিন নামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমোনটি নিঃসরণের ব্যাপারেও 'এ এম পি' ওই একইভাবে কাজ করে। উল্লেখ্য শারীরিক প্রয়োজনে স্টার্চ এবং সুগার বা চিনিজাতীয় সামগ্রীর যথাযথ বিপাকীয় ব্যাপারে এই হরমোনটির ভূমিকা বিশিষ্টতম।

তবু অন্যান্য ক্ষেত্রে যা ঘটে থাকে এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। যে কোন মৌলিক আবিষ্কারের স্বীকৃতি সব সময়ই বিলম্বিত লয়ে অগ্রসর হয়। সুদারল্যাণ্ডের আবিষ্কারের ঘটনা মুহূর্তে জীবরসায়ন বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করলো। অনেকে তো ব্যাপরেটাকে সরাসরি অস্বীকার করে বসলেন। শুধু অসীম ধৈর্য এবং প্রতীক্ষাকে অবলম্বন করে এগিয়ে যেতে লাগলেন সুদারল্যাণ্ড। কারণ ভেঙ্গে পড়ার মত লোক তিনি নন। তাঁর মন্তব্য, 'হার্ভে যখন আবিষ্কার করেন হৃৎপিণ্ডের মধ্যে দিয়েই শরীরের সারা অংশে রক্ত সংযাহিত হয়, ওই সময় হার্ভের পাশে আমিও যদি উপস্থিত থাকতাম, ব্যাপারটাকে প্রথম দিকে আমার কাছেও অবিশ্বাস্য বলে মনে হত। ওই আবিষ্কার কোনভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞানকে যে সাহায্য করতে পারে, সেটা বিশ্বাস করে নিতে আমারও সময় লাগত।' সুদারল্যাণ্ডের বৈশিষ্ট্য সম্ভবত এখানেই। প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে তিনি এক কথায় নস্যাৎ না করে, শুধু অপেক্ষা করেছেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, কঠিন পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হবেনই।

ক্রমে অবিশ্বাস স্তিমিত হয়ে এলো। ১৯৬০ পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপকভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হলো 'সাইক্লিক এ এম পি'র কার্যকারিতার অনুসন্ধান। বিভিন্ন ধরনের রোগ-চিকিৎসায় এর সত্যিকারের ভূমিকার উপর পর্যবেক্ষণ চলতে লাগলো। সকলের দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ সুদারল্যাণ্ডের 'সেকেণ্ড মেসেঞ্জারের' ভূমিকাকেই কেন্দ্র করে।

পরবর্তীকালে অন্যান্যরাও লক্ষ্য করলেন প্রাণিকোষের বহিরাংশের তলের উপর উপস্থিত হয়ে হরমোন যখন উদ্দীপনা সৃষ্টি করে তখন সেখানে অ্যাড্রেনাইল সাইক্লেজ নামের হরমোন উদ্দীপ্ত হয়। এই অ্যাড্রেনাইল সাইক্লেজ 'সাইক্লিক এ এম পি' সংশ্লেষণে সাহায্য করে। পরে সেখানে 'সাইক্লিক এ এম পি'র মাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এনজাইম সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই এনজাইম অতঃপর হয় হরমোনের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে আকাঙ্ক্ষিত কোন জীবরাসায়নিক কার্যকলাপ চালায় অথবা অন্য কোন রকমের এনজাইমকে উদ্দীপ্ত করতে সাহায্য ক'রে। উদাহরণস্বরূপ দেখা গেল, 'সাইক্লিক এ

এম পি'-ই মধ্যত 'এসচেরিয়াসিয়া কোলি' (Escherichia coli) নামে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার দেহে বিটা-গ্যাকটোসাইডেজ নামে এক ধরনের এনজাইম সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রিত করে। মেরিল্যান্ডের বেথেসডাস্থিত ন্যাশনাল ইনসটিটিউট অব হেলথ-এর এক দল বিশেষজ্ঞ এই ব্যাপারটি সমর্থন করেছেন। দলটির নেতৃত্ব করেন ডঃ এইচ ই ভারমুস। সম্প্রতি বলা হয়েছে, 'সাইক্লিক এ এম পি' শরীরের ক্ষুদ্রান্ত্রে জলের এবং তড়িৎবিশ্লেষ পদার্থের ঘাটতি ঘটানোর ব্যাপারে সাহায্য করে। বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওফ্রে ডব্লু. জি সার্প এবং সিক্সটাস হাইনি দেখিয়েছেন, এর ফলে কঠিন ডায়েরিয়া বা উদরাময় রোগ সৃষ্টিতেও সাহায্য করে। সম্প্রতি প্রমাণিত হয়েছে, শরীরে গ্লাইকোজেন নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারেও 'সাইক্লিক এ এম পি'র ভূমিকা অত্যন্ত সক্রিয়। প্রিন্সটোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জে টি বোনার, ডঃ ই এম. হল এবং ডব্লু. এস. মায়ার দেখিয়েছেন এই বস্তুটি অ্যামিবার কাজকর্ম করার ক্ষমতা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে।

কিন্তু আরও চমকপ্রদ তথ্য পরিবেশন করেছেন গাইস হসপিটাল মেডিকেল স্কুল এবং টুটিং বেক হসপিটালের দু'জন বিজ্ঞানী যথাক্রমে ডঃ ওয়াই এইচ আবদাল্লা এবং ডঃ কে হামাদ। ও'দের বক্তব্য মানসিক রোগ ম্যানিক ডিপ্রেসিভ-এর সঙ্গে 'সাইক্লিক এ এম পি'র প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। তাঁদের মতে ডিপ্রেসন বা মানসিক অবসাদে যাঁরা ভোগেন তাঁদের শরীরের প্রতিটি কোষে 'সাইক্লিক এ এম পি'র মাত্রা দারুণভাবে কমে যায়। আবার কোষে যদি এই বস্তুটির মাত্রা বেড়ে যায় তা হলে তা 'মানিয়া' নামক মানসিক রোগ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। পরীক্ষা করে এই বক্তব্যের যথার্থতা সম্পর্কে তাঁরা নিশ্চিত হয়েছেন। মাঝে ওই ধরনের রোগ নিরাময়ের ব্যাপারে 'সাইক্লিক এ এম পি'র উপর চিকিৎসকরা অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। অবশ্য সম্প্রতি কেউ কেউ এই প্রসঙ্গে লিথিয়ামের কার্যকারিতার কথাও উল্লেখ করেছেন। ডি এন এ-র কার্যকারিতার উপরও যে 'সাইক্লিক এ এম পি' যথেষ্ট সক্রিয় সে সম্পর্কে মত প্রকাশ করেছেন এ ডি. রিগস, জি. রাইনেস এবং জি দুবে। এ'দের প্রথম দু'জন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের, শেষের জন নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের।

বেথেসডার ন্যাশনাল ইনসটিটিউট অব হেলথ-এর বিজ্ঞানীরা আরও একটি চমকপ্রদ ঘটনা লক্ষ্য করেছেন। ও'রা দেখেছেন কোন কারণে শরীরের কোষকলা যখন পরিবর্তিত হয়, চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা যাকে বলেন সেল ট্রান্সফরমেশন, তখন সেই কোষ আর স্বাভাবিক কোষকলার মত নিজের ধর্মাবলী অটুট রাখতে পারে না। ওই সমস্ত কোষের বিপাকীয় কার্যাবলীও পালটে যায়। বরং বলা চলে তারা অস্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম শুরু করে। এর আগে দেখা গেছে 'সাইক্লিক এ এম পি' এবং তার সংশ্লিষ্ট কিছু কিছু যোগ কোন কোন টিউমার কোষকার বৃদ্ধিকে বাধা দেয়। অথচ স্বাভাবিক কোষের ক্ষেত্রে তেমন কিছুই করে না। এও দেখা গেছে, 'পলিওমা-ট্রান্সফরমড' কোষে অ্যাডেনাইল সাইক্লেজ নামে এক ধরনের এনজাইমের পরিমাণ অনেক সাধারণ

কোষের চেয়ে কম। উল্লেখ্য, এই এনজাইম 'সাইক্লিক এ এম পি' তৈরি করার ব্যাপারে সাহায্য করে।

যেমন ধরুন, সাধারণ এবং স্বাভাবিক ফাইব্রোব্লাস্ট কোষ মাকুর মত দেখতে এবং লম্বাটে। তাদের অক্ষগুলি প্রায় এক দিক বরাবর মুখ করে থাকে। কৃত্রিম উপায়ে তাদের বৃদ্ধি করার সময় একটি নির্দিষ্ট আয়তন পাওয়ার পর তারা আর বাড়তে পারে না। কিন্তু পরিবর্তিত বা দুষ্ট-কোষগুলি কতকটা গোলাকার এবং বংশ বৃদ্ধির সময় তাদের মধ্যে থেমে পড়ার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। এতে করে মনে হয়, সুস্থ এবং স্বাভাবিক কোষে এমন কোন কিছু আছে যা যার উপস্থিতিতে কোষকলা একটি নির্দিষ্ট আকার পাওয়ার পর উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। জনসন ইঁদুরের দেহ থেকে টিউমার কোষ সংগ্রহ করে তাতে উপযুক্ত পরিমাণ 'সাইক্লিক এ এম পি' মিশিয়ে দেন। এবং প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ওই অবস্থায় রাখার পর লক্ষ্য করেন অস্বাভাবিক কোষগুলি যেন প্রায় স্বাভাবিক কোষের মতই কাজকর্ম শুরু করেছে। যৎসামান্য ত্রুটি ছাড়া। অর্থাৎ নানভাবে এবং নানা দিক থেকেই পৃথিবীর বহু বিজ্ঞানী সুদারল্যান্ডের আবিষ্কারটিকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন এবং অবশেষে এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছেন, তাঁর 'সেকেন্ড মেসেঞ্জার'টিকে মোটেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শরীরের বিপাকীয় কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের প্রথম দূত যদি হরমোন হয়, তা হলে 'সাইক্লিক এ এম পি'-ই হবে দ্বিতীয় দূত ; এবং দৌত্য-কর্মে তার দায়িত্ব অপরিসীম।

সুদারল্যান্ডের আবিষ্কার অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি, যেমন ডায়বেটিক, ম্যানিক ডিপ্রেসিভ, টিউমার, কলেরা প্রভৃতির নিরাময়ে সাহায্য করবে বলেই বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস।

এই মানুষটির একটি ব্যক্তিগত দিকও রয়েছে। কান-এর বার্লিংগেম-এ উচ্চবিদ্যালয়ে পড়ার সময় তাঁর হাতে এসে পড়ে পল দ্য ক্রুইফস এর লেখা 'লুই পাস্তুর'। ওই গ্রন্থেরই 'মাইক্রোব হাণ্টারস' অর্থাৎ 'জীবাণুঘাতক' নামে অধ্যায়টি তাঁকে তখনই অনুপ্রাণিত করেছিল। তখন থেকেই তাঁর চিকিৎসা বিজ্ঞানে গবেষণা করার আকাঙ্ক্ষার শুরু। পরে মার্কিন দেশের ব্যাপক মন্দার বাজারে বাবার সমস্ত পয়সা কড়ি নিঃশেষ হয়ে যায়। পরিবার তখন সম্বলহীন অবস্থায়। কিন্তু অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র সুদারল্যান্ড। তাই স্কলারশিপ বা অ্যাসিস্টন্টশিপের অভাব হল না। তারই সাহায্যে প্রথমে টপেকার ওয়াশবার্ন কলেজ, পরে সেন্ট লুইস্থিত ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি মেডিকেল স্কুলের দরজাও পার হয়ে গেলেন কৃতিত্বের সঙ্গে। অতঃপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চিকিৎসক হিসেবে সেনাবিভাগে নাম লেখানো। যুদ্ধকালীন কাজকর্মের জন্য পৃথিবীর বহু জায়গাতেই তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। যুদ্ধের শেষে আবার ফিরে আসেন তাঁর সাধনপীঠ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে। শুরু হলো গবেষণার কাজ। গুরু প্রখ্যাত নোবেল বিজ্ঞানী কার্ল ফার্দিনান্দ কোরি।

শিক্ষকতা কাজটি ওঁর কখনই ভাল লাগেনি!

১৯৬৩ সালে সুদারল্যান্ড পরিবারের ভ্যান্ডারবিল্টে আগমন। এখানেই তাঁর মূল্যবান মুহূর্তগুলি কেটেছে বিজ্ঞান গবেষণায়। এখনও কাটছে।



নোবেল পুরস্কার ১৯৭২

পদার্থ বিজ্ঞান

একটি পুরনো ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

একটি চিরায়ত প্রশ্নের সমাধান।

১৯৭২ সালে পদার্থবিজ্ঞানে যাঁরা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, সংক্ষেপে তাঁদের সাফল্য হয়ত এইভাবেই ব্যক্ত করা চলে।

কোন পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে যখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, সেই পরিবাহী সেই বিদ্যুৎ প্রবাহে কিছুটা বাধা সৃষ্টি করে। এই বাধাকেই ইংরেজিতে বলা হয় 'রেজিসট্যান্স'। বাংলায় বলা হয় 'রোধ'। কিন্তু সব সময় যে এটা ঠিক নয়, ১৯১১ সালে সেটা প্রমাণিত হলো। প্রমাণ করলেন হল্যান্ডের বিজ্ঞানী অধ্যাপক কামেরলিং ওন্নেস। কামেরলিংই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম হিলিয়াম গ্যাসকে তরলে পরিণত করতে সমর্থ হন।

১৯১১ সালে কামেরলিং আবিষ্কার করলেন, ৪·২ ডিগ্রি কেলভিন তাপমাত্রার নিচে পারদে একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। তিনি দেখলেন, অবাক কাণ্ড! ওই অবস্থায় পারদের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালু করা হলো। অথচ পারদ সেই প্রবাহে কোন 'রোধই' সৃষ্টি করছে না। করলেও তা এতই কম যে না করারই মত। পরিবাহীর এই বিশেষ ধর্মটির নাম দেওয়া হলো সুপারকনডাক্টিভিটি' বা 'অতিপরিবাহিতা'। এই আবিষ্কারের জন্যে কামেরলিং ওন্নেসকে ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। তাঁর আবিষ্কার পদার্থবিজ্ঞানে একটি নতুন শাখা সৃষ্টি করে বসলো। যার নাম, 'ক্রাইওজেনিকস'। অতিরিক্ত নিম্ন তাপমাত্রায় পদার্থের চরিত্র অনুসন্ধানই এই শাখাটির মূল লক্ষ্য।

পদার্থের 'অতিপরিবাহিতা' চরিত্রটি আবিষ্কারের পর পদার্থবিজ্ঞানীরা প্রায় অর্ধশতাব্দী যেন ধাঁধার মধ্যেই থেকে গেলেন। তাত্ত্বিকদের কাছে তখন একটাই প্রশ্ন : অতি নিম্ন তাপমাত্রায় বিদ্যুৎ পরিবাহী হঠাৎ তার বিদ্যুৎপ্রবাহের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা

কেন হারায়? ব্যাপারটা তাঁর নানা দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ধাঁধা হিসেবেই থেকে গেল।

অবশেষে এলো আশার সংকেত। সেটা ১৯৫০-এর দশক ১৯৫৭ সালে। সাফল্যের পাদপীঠে উপস্থিত হলেন তিন জন মার্কিন বিজ্ঞানী। জন বার্ডিন, লিয় কুপার এবং জন শ্রিফার। পদার্থের অতিপরিবাহিতার কারণ ব্যাখ্যা করে তাঁরা মিলিতভাবে একটি তত্ত্ব দাঁড় করালেন। যার নাম দেওয়া হলো 'বার্ডিন, কুপার এবং শ্রিফারের তত্ত্ব' বা সংক্ষেপে B C S তত্ত্ব। ১৯৭২ সালে এই 'B C S' তত্ত্বেরই উদ্ভাবকদের পদার্থ বিজ্ঞান শাখার নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হলো। পুরস্কারের কথা যখন ঘোষণা করা হয় অধ্যাপক বার্ডিন তখন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। কুপার রোহ্‌ডে আইল্যান্ডে ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এবং শ্রিফার অধ্যাপনা করছেন পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বলা বাহুল্য, পদার্থের অতিপরিবাহিতার কথা প্রকাশ পাওয়ার পর মানবকল্যাণে এ ব্যাপারটা কোন দিন যে কাজে লাগাতে পারে, গোড়ায় বিজ্ঞানীরা তা নিয়ে খুব মাথা ঘামিয়েছেন সে কথা বলবো না। কিন্তু পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি অনেকেই বুঝতে পারলেন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অতিপরিবাহিতার ভূমিকা অসামান্য। নলের ভেতর দিয়ে বেশি জল দ্রুত বেগে প্রবাহিত করতে হয়, তা হলে ওই জলের উপর যেমন চাপ সৃষ্টি করতে হয় বেশি, তেমনি পরিবাহীর মধ্যে দিয়েও বিদ্যুৎপ্রবাহের মাত্রা বাড়াতে গেলে দরকার অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক চাপ। এই চাপকেই বলা হয় বিভব বা 'ভোলটেজ্'। অর্থাৎ বৈদ্যুতিক প্রবাহের মাত্রা বাড়ানো মানেই ভোলটেজ্ বাড়ানো। যার উদ্দেশ্য পরিবাহীর 'রোধ'কে অতিক্রম করা। যদি তাই হয়, যখন পরিবাহী তার 'রোধ' ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন তার মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালালে খুব কম ভোলট্ হলেই চলবে। রোধ বেশি হলে বিদ্যুৎপ্রবাহের সময় পরিবাহী গরম হয়ে ওঠে। অতিপরিবাহিতার ক্ষেত্রে রোধ খুব কম হওয়ায় পরিবাহীর এই উত্তপ্ত হওয়ার ব্যাপারটা ভীষণভাবে কমে যায়। এতে করে শক্তির অপচয়ও কমে।

প্রযুক্তিবিজ্ঞানীরা দেখলেন, শক্তিশালী বৈদ্যুতিক চুম্বকের জন্যে চাই উচ্চ মাত্রায় বিদ্যুৎপ্রবাহ। এই প্রবাহ অতিপরিবাহী বিদ্যুৎবর্তনীর মধ্যে যদি চালু করা যায় তা হলে পরিবাহী তেমন গরম হবে না। এতে করে চুম্বকের ক্ষমতা যথাযথ বজায় রাখা যাবে। অতিপরিবাহী বর্তনীর সাহায্যে ডি. সি. কারেন্টের অপচয় কমানো যাবে। বৈদ্যুতিক মোটর, জেনারেটর প্রভৃতির কার্যকারিতাও বাড়ানো যাবে অতি-পরিবাহিতার সাহায্য নিয়ে।

বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত প্রায় তিরিশটি ধাতুর সন্ধান পেয়েছেন যারা বিশেষ বিশেষ তাপমাত্রায় 'অতিপরিবাহী' হিসেবে আচরণ করে। অতিপরিবাহী অবস্থায় এই সব ধাতু চৌম্বক-ক্ষেত্রের বল-রেখাদের পুরোপুরি এড়িয়ে চলে। উচ্চতর চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে রাখলে দেখা যায়, ওই সব ধাতু তাদের 'অতিপরিবাহিতা' গুণটি হারিয়ে ফেলে। বলতে বাধা নেই, যাঁরা অতিপরিবাহিতার সাহায্য নিয়ে নানারকম যন্ত্রপাতির কথা

ভাবছিলেন, শেষ পর্যন্ত এটাই তাঁদের কাছে হয়ে দাঁড়ালো একটা বড় রকমের সমস্যা। 'বি সি এস' তত্ত্ব এই সমস্যা বুঝে ওঠার ব্যাপারে সাহায্য করেছে।

ধাতব-পরিবাহী কেলাসের সমন্বয়। পদার্থবিজ্ঞানীদের কাছে এই তথ্যটি আগেই জানা ছিল। কেলাসগুলিকে পরস্পর সংবন্ধ অবস্থায় রাখে ইলেকট্রন। ধাতুর নিজস্ব পরমাণুগুলিরই ইলেকট্রন। তাপমাত্রা বাড়লে এই ইলেকট্রনগুলি অস্থির হয়। আবার ওই একই ধাতুর তাপমাত্রা যখন প্রচণ্ডভাবে কমানো হয়, ধরুন তরল হিলিয়ামের তাপমাত্রায় নামিয়ে আনা হলো, তখন ইলেকট্রনগুলির মধ্যে একটি সাম্য অবস্থা বিরাজ করে।

১৯৫০ সালে এইচ ফ্রোহলিশ এবং বার্ডিন পরস্পর স্বাধীনভাবে দাঁড় করালেন একটি তত্ত্ব। তাঁরা দেখালেন, ধাতুর কেলাসের মধ্যে আছে এক ধরনের 'ভাইব্রেশনাল এনার্জি' বা কম্পনশক্তি। আলোকে নির্দিষ্ট শক্তি সমন্বিত এক একটি কণা হিসেবে কল্পনা করে, সেই কণাদের যেমন নাম দেওয়া হয়েছে 'ফোটন', কেলাসের ওই কম্পন শক্তিকেও কল্পনা করা হয়েছে এক একটি কণার সঙ্গে। এক একটি কণা যেন নির্দিষ্ট পরিমাণ কম্পনশক্তির এক একটি 'প্যাকেট'। এই কণাদের বলা হলো 'ফোনন'। ফ্রোহলিশ এবং বার্ডিন বললেন, কেলাসের পারস্পরিক বন্ধনকারী ইলেকট্রন এবং ওই ফোনন কণার পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে অতিপরিবাহিতার সম্পর্ক রয়েছে। ফ্রোহলিশের মতে, ধাতু কেলাসের মধ্যে প্রবাহিত হওয়ার সময় ইলেকট্রন কণারা পর্যায়ক্রমে কম্পিত ওই ফোননদের শোষণ এবং পরিত্যাগ করতে থাকে। উল্লেখ্য, ইলেকট্রন প্রবাহকেই বলা হয় বিদ্যুৎ-প্রবাহ।

১৯৫৬ সালে ব্যাপারটা আর এক ধাপ এগিয়ে দিলেন লিয় কুপার। আমরা জানি, ইলেকট্রন নেগেটিভ বা ঋণাত্মক বিদ্যুৎ আধান সমন্বিত কণা। কুলম্বের সূত্র অনুযায়ী বিপরীত আধান সমন্বিত কণা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং সমধর্মী বিদ্যুৎ কণা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ এবং বিকর্ষণকারী বলকেই বলা হয় 'কুলম্ব ফোর্স' বা কুলম্বের বল। অতএব কুলম্বের সূত্র অনুযায়ী বলা যায়, ধাতব পরিবাহীর মধ্যেকার প্রবহমান ইলেকট্রন কণাদের মধ্যে একটি বিকর্ষণ বল কাজ করে। কুপার দেখালেন, ধাতব পরিবাহী যখন অতিপরিবাহীর মত আচরণ করে তখন ইলেকট্রন-ফোননের মধ্যে লেনদেন চলে ঠিকই। ইলেকট্রন ফোনন কণা শোষণ করে, আবার ত্যাগ করে। কিন্তু ওই সময় ইলেকট্রন কণাদের উপর কুলম্বের বল দারুনভাবে কমে যায়। ওই বল পুরোপুরি শূন্যে গিয়েও দাঁড়াতে পারে। এমন কি বিশেষ কোন অবস্থায় ফোনন গ্রহণ এবং বর্জন করতে গিয়ে পরস্পর দুটি ইলেকট্রনের মধ্যে বিকর্ষণের পরিবর্তে একটি আকর্ষণ বল সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। ওই সময় দুটি ইলেকট্রন একটি সংবন্ধ 'জোড়' হিসেবে বিরাজ করে। যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'বাউণ্ড পেয়ার'। ইলেকট্রন দুটির ভরবেগ বা 'মোমেন্টাম' এবং ঘূর্ণন বা স্পিন' তখন বিপরীতমুখী হয়। ইলেকট্রনের এই 'জোড়'কেই উদ্ভাবক কুপারের সম্মানে নাম দেওয়া হয়েছে 'Cooper pair'। কুপার প্রমাণ করলেন, এক্ষেত্রে 'শক্তির অবিনাশিতা' তত্ত্বটি ব্যাহত হয় না।

এই সব ধারণার উপর নির্ভর করেই বার্ডিন, কুপার এবং শ্রিফার মিলিতভাবে গড়ে তুলেছেন তাঁদের 'বি সি এস তত্ত্ব। তাঁরা দেখালেন, ধাতু যখন অতিপরিবাহীতে পরিণত হয়, তখন তার মধ্যে সৃষ্ট হয় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক 'ইলেকট্রন জোড়' বা 'ইলেকট্রন পেয়ার'। পেয়ারগুলি তখন একটি নির্দিষ্ট প্রতিসাম্য পদ্ধতিতে গতিশীল হয়। অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়ায় তখন লেজার রশ্মির মত। আমরা সাধারণ আলো বলতে যা দেখি, তার মধ্যে থাকে নানা বর্ণের আলো। তাদের এক একটির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এক এক রকম। লেজার রশ্মির মধ্যে সংমিশ্রণের কোন ব্যাপার নেই। সেক্ষেত্রে একটি বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোই লেজার হিসাবে কাজ করে। ওই রশ্মি এগিয়ে যাওয়ার সময় পরস্পর সমলয়ে এবং সম্পূর্ণ ভাবে সমান্তরাল থাকে। বিক্ষিপ্তভাবে এগোয় না। অতিপরিবাহীর মধ্যে ইলেকট্রন-পেয়ারও অগ্রসর হয় লেজার রশ্মির মত। ওই অবস্থায় বৈদ্যুতিক প্রবাহ (অর্থাৎ ইলেকট্রনের প্রবাহ) নির্বিবাদে অগ্রসর হয়। পরিবাহীর কেলাসের অন্তর্নিহিত কম্পন (Lattice vibration) অথবা তার ত্রুটির দরুন সঞ্চারপথের বাইরে বিক্ষিপ্ত হয় না। উল্লেখ্য, স্বাভাবিক অবস্থায় পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহের সময় এ সব কারণেই বিদ্যুৎপ্রবাহ বাধা পায়, যাকে সাধারণ ভাবে আমরা বলে থাকি 'বৈদ্যুতিক রোধ' বা 'ইলেকট্রিকেল রেজিসট্যান্স'।

আবিষ্কারের পর 'বি সি এস' তত্ত্ব ক্রমে বলিষ্ঠ থেকে বলিষ্ঠতর হয়েছে। এই তত্ত্বের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা 'আইসোটোপ এফেক্ট' ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হন। 'আইসোটোপ এফেক্ট' আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯৫০ সালে। এই তত্ত্বে বলা হয়, অতিপরিবাহীর পরম তাপমাত্রা (critical temperature : অর্থাৎ যে তাপ মাত্রায় ধাতু অতিপরিবাহিতা অর্জন করে) পরিবাহীর ভরসংখ্যা বা 'মাস নাম্বার'-এর বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। (**Critical temperature of a super conductor is inversely proportional to the square root of its mass number**)। কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াসে মোট যে ক'টি প্রোটন এবং নিউট্রন থাকে তাদের যোগ করলে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় ওই সংখ্যা ওই মৌলিক পদার্থের 'মাস নাম্বার' বা ভর-সংখ্যা বলে।

বার্ডিন যখন নোবেল পুরস্কার পেলেন, তাঁর বয়েস তখন ৬৪ বছর। এই নিয়ে তিনি দুইবার নোবেল পুরস্কার পেলেন। এর আগে ১৯৫৬ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল। সেবার এই পুরস্কার একত্রে পেয়েছিলেন তিন জন। উইলিয়াম শকলে, ওয়ালটার ব্রাটেইন এবং জন বার্ডিন। ট্যানজিস্টারের উন্নতিসাধনের জন্যে সেবছর তাঁদের পুরস্কৃত করা হয়। তিন জনের মধ্যে বার্ডিন তখন ছিলেন কনিষ্ঠতম বিজ্ঞানী। আর ১৯৭২ সালে যে তিন জন নোবেল পুরস্কারে বৃত হলেন, তাঁদের মধ্যে বার্ডিনই প্রবীণতম। পুরস্কার পাওয়ার সময় কুপারের বয়েস ছিল ৪২। এবং শ্রিফারের ৪১।

রসায়ন ঃ

প্রাণসৃষ্টি থেকে শুরু করে প্রাণী এবং উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের মুখ্য ভূমিকা বিশেষ এক ধরনের জীবরাসায়নিক যৌগের উপর নির্ভর করে, যাদের বলা হয় 'এনজাইম।' আমরা খাবার খাই। প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ইত্যাদি। এসব জটিল যৌগ ভেঙ্গে পরিপাকের উপযোগী সরল যৌগ তৈরি করার দায়িত্ব যেমন বর্তায় 'এনজাইম'-এর উপর, তেমনি জীবকোষে নিয়মিত বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্যেও প্রয়োজন বিভিন্নরকম 'এনজাইম'। প্রয়োজন 'ডি এন এ' 'আর এন এ' তৈরি করার ক্ষেত্রেও।

রাসায়নিকের ভাষায় 'এনজাইম'-কে বলা হয় Catalyst বা অনুঘটক। এরা রাসায়নিক বিক্রিয়া আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পরিচালিত করতে সাহায্য করে, অথচ নিজেরা বিনষ্ট হয় না। উল্লেখ্য, অনুঘটকের কথা প্রথম উল্লেখ করেছিলেন সুইডেনের রসায়নবিদ্ জেকব বারজেলিয়াস প্রায় ১৬০ বছর আগে। এবং তিনিই প্রথম বলেন, তথাকথিত জৈব এবং অজৈব রাসায়নিক বিক্রিয়াই শুধু নয়, জীবের শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজনেও চলে নানারকম রাসায়নিক বিক্রিয়া। আর এক্ষেত্রেও দরকার অনুঘটক।

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় বারজেলিয়াসের ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হয়। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন, সত্যিই উদ্ভিদ এবং প্রাণীদেহে ঘটে নানারকম রাসায়নিক বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়া সম্পন্ন করার পেছনে অনুঘটক রূপে কাজ করে এক শ্রেণীর জীবরাসায়ানিক যৌগ—এনজাইম। এনজাইম ব্যতীত কোন জীবরাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। জীবন সৃষ্টিও সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য, ১৯৭২ সালে যে তিন জন বিজ্ঞানী রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁদের গবেষণার বিষয় 'এনজাইম'। নাম, ক্রিশ্চিয়ান বি. অ্যানফিনসেন, স্ট্যাণ্ডফোর্ড মুর এবং উইলিয়াম এইচ. স্টাইন। তাঁদের অবদান, ষাঁড়ের দেহ থেকে সংগৃহীত বিশেষ এক ধরনের এনজাইম 'রাইবোনিউক্লিয়েজের' গঠন বৈচিত্র্য আবিষ্কার এবং বিভিন্ন ধরনের জীবরাসায়নিক বিক্রিয়ায় এই এনজাইম কী ভাবে কাজ করে সেটা জানতে সাহায্য করেছে।

এনজাইম প্রোটিন যৌগ। এই যৌগ তৈরিতে প্রয়োজন কুড়িটি অ্যামাইনো অ্যাসিড। অর্থাৎ বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড রাসায়নিক পদ্ধতি জুড়ে তৈরি করে এক একটি 'এনজাইম' যৌগ। অ্যানফিনসেন, মুর এবং স্টাইনের কৃতিত্ব পর্যায়ক্রমে কোন কোন অ্যামাইনো অ্যাসিড সংযুক্ত হয়ে রাইবোনিউক্লিয়েজ অণু তৈরি করে সেটাই তাঁরা আবিষ্কার করেছেন। এই এনজাইমের গঠন বৈচিত্র্য সম্পর্কে তুলে ধরেছেন একটা স্পষ্ট ছবি।

জীবের বংশগতির ধারক এবং পরিবাহক এক ধরনের জটিল রাসায়নিক যৌগ— ডাইঅক্সি রাইবো নিউক্লেয়িক অ্যাসিড বা 'ডি এন এ'। জীবদেহে কখন কোন

'এনজাইম' তৈরি হবে সেটা 'ডি এন এ'র উপরই নির্ভর করে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড পরপর যুক্ত করে একটি শৃংখল। সেই শৃংখল ভাঁজ হয়ে তৈরি করে এক একটি এনজাইম অণু। যাদের চেহারা দাঁড়ায় ক্ষুদ্র গোলকের (globule) মত।

কীভাবে এনজাইম অণু অর্জন করে অমন বিশেষ আকৃতি ?

অ্যানফিনসেনের গবেষণা এ প্রশ্নেরই উত্তর যুগিয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন, এই কাজ সম্পন্ন করে 'ডি এন এ'।

মুর এবং স্টাইনের অবদান, অনুঘটক হিসেবে রাইবোনিউক্লিয়েজের ভূমিকা কি, সেটাই ব্যাখ্যা করেছেন তাঁরা। রাইবোনিউক্লিয়েজ অণুর কোন্ কোন্ অংশ বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অনুঘটক হিসেবে কাজ করে সে সম্পর্কেও জানতে সাহায্য করেছে তাঁদের তত্ত্ব। তাঁদের আরও একটি বড় অবদান 'অটোমেটিক অ্যামাইনো অ্যাসিড অনালাইজার'-এর উদ্ভাবন। এই যন্ত্র বৃহৎ আকারের জটিল প্রোটিন অণুর আণবিক গঠন জানার কাজটি সহজতর করেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে প্রথম যে প্রোটিন অণুর গঠন আবিষ্কৃত হয়েছিল সেটি একটি হরমোন—ইনসুলিন। প্রোটিন অণু। এই হরমোনটির এক একটি অণুতে থাকে বিভিন্ন রকমের ৫১টি অ্যামাইনো অ্যাসিড। এই আবিষ্কারের জন্যে ফ্রেড স্যাংগার ১৯৫৫ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এ বছরও জানা গেল আরও একটি জীব রাসায়নিক যৌগের গঠনবৈচিত্র্য। এনজাইম অণুর। এই প্রথম একটি এনজাইমের (এটিও প্রোটিন) গঠন সম্পর্কে আলোকপাত হলো। রাইবো নিউক্লিয়েজ। পার্থক্য এই, বিশেষ এই প্রোটিন অণুর মধ্যে আরও বেশি সংখ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে—মোট সংখ্যা ১২৪।

মুর এবং স্টাইন তাঁদের অ্যানালাইজারটি প্রথম উদ্ভাবন করেন ১৯৪৮ সালে। এর মধ্যে থাকে একটি নল। নলের মধ্যে স্টার্চের গুঁড়ো। এই নলের মধ্যে প্রোটিন অণু পাঠিয়ে আদ্রবিশ্লেষিত (hydrolised) করা হয়। এর ফলে প্রোটিন অণু ভেঙে গিয়ে দেয় বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড—যারা প্রোটিন অণু তৈরি করেছিল। পরে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি পর্যায়ক্রমে নিনহাইড্রিন নামে এক ধরনের রাসায়নিক যৌগের সংস্পর্শে আনলে অ্যামাইনো অ্যাসিড বিশেষে ওই যৌগের রঙ পালটায়। বেগুনী-ফিকে, বেগুনী প্রভৃতি। পরে বর্ণালী বিশ্লেষক যন্ত্রের ওই রঙ চিহ্নিত করে বলা যায় নির্দিষ্ট প্রোটিন অণুতে কোন কোন অ্যামাইনো অ্যাসিড পর পর কিভাবে সাজানো ছিল, তাদের পরিমাণই বা কত। ১৯৫৮ সালে এই যন্ত্র পুরোপুরি স্বনিয়ন্ত্রিত পর্যায়ে উন্নীত করতে সমর্থ হন মুর এবং স্টাইন। এনফিনসেন তাঁদের এই যন্ত্রের সাহায্যে এনজাইমের গঠন এবং চরিত্রাবলী জানার ব্যাপারে কাজ করেন।

নোবেল কমিটি মনে করেন, অ্যানফিনসেন, মুর এবং স্টাইনের গবেষণালব্ধ ফলাফল চিকিৎসা বিজ্ঞানে যথেষ্ট কাজে লাগবে। শিল্পজগৎও লাভবান হবে অনেক। কাগজ, সুতীশিল্প, ওষুধপত্র প্রভৃতি উৎপাদনে বিভিন্ন এনজাইমের সাহায্য নিতে পারবেন ভবিষ্যতের শিল্প-রাসায়নিকরা।

ক্রিশ্চিয়ান বি. অ্যানফিনসেনের জন্ম ২৬ মার্চ, ১৯১৬ পেনসিলভানিয়ার মনোসন-এ। ১৯৩৭ সালে সোয়ার্থমোর কলেজ থেকে বি. এ পাশ করার পর পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ১৯৩৯ সালে সেখান থেকে জৈব-রসায়নে মাস্টার অভ্ সায়ান্স ডিগ্রি। ১৯৩৯-৪০ কোপেনহেগেনে কার্লসবার্গ গবেষণাগারে পরিদর্শক বিজ্ঞানী। হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল থেকে পি. এইচ ডি। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি প্রথমে শিক্ষক এবং পরে জীববিদ্যা বিষয়ক রসায়নশাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে দীর্ঘ সাত বছর জড়িত ছিলেন। ১৯৫০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনসটিটিউট অভ্ হেল্থ-এর অধীনস্থ ন্যাশনাল হার্ট ল্যাবরেটারির সেলুলার ফিজিওলজি এবং মেটাবলিজম শাখার প্রধান। ১৯৬২-৬৩ পুনরায় হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের জীববিদ্যা বিষয়ক রসায়নের অধ্যাপক। বর্তমানে ন্যাশনাল ইনসটিটিউট অভ্ হেল্থ-এর সঙ্গে জড়িত।

স্ট্যানফোর্ড মুর-এর জন্ম ১৯১৩ সালে, শিকাগো শহরে। ১৯৩৮ সালে উইনসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জৈব-রসায়নে পি. এইচ. ডি। বর্তমানে রাকফেলার ইনসটিটিউটের সঙ্গে জড়িত।

উইলিয়াম এইচ. স্টাইনের জন্ম ২৫ জুন, ১৯১১, নিউইয়র্ক সিটিতে। প্রথমে জৈব রসায়নের ছাত্র। পরে জীবরসায়নে গবেষণা। ১৯৩৭ সালে তিনি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পাঠ শেষ করেন এবং রকফেলার ইনসটিটিউটে প্রখ্যাত প্রোটিন-রসায়নবিদ্ বারগমানের গবেষণাগারে যোগ দান করেন। এই গবেষণাগারেই মুর এবং তিনি গবেষণার কাজে লিপ্ত হন।

শারীর এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান

প্রতি মুহূর্তে প্রশ্বাসের সঙ্গে যে বাতাস আপনি ফুসফুসের মধ্যে চালান করছেন তার মধ্যে কতরকমের রোগের বীজাণু যে থাকতে পারে সে হিসেব কারোর পক্ষেই দেওয়া সম্ভব নয়। দৈনিক যে খাবার আপনি খাচ্ছেন, পানীয় গ্রহণ করছেন, তাদের ভেতরও নানারকম জীবাণু থেকে যায়। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস অথবা অনাকাঙ্ক্ষিত রাসায়নিক পদার্থ, কোন না কোনভাবে সব সময় এরা শরীরের মধ্যে ঢুকছে। কখনও বা চর্মরোগের জীবাণুর স্পর্শেও আসছেন কেউ কেউ।

অদ্ভুত ব্যাপার, তবু বেশির ভাগ সময়ই অনেকে নিরোগ থেকে যান। একই চর্মরোগের জীবাণু কারোর গায়ে লাগল, সে রোগ তারও শরীরে দানা বাঁধল। আবার এমনও হতে পারে, কেউ হয়ত ওই জীবাণুর সংস্পর্শে এসেও রোগাক্রান্ত হলেন না। এসব ক্ষেত্রে প্রশ্ন তুললেই কেউ হয়ত বলবেন, এ আর এমন কী কথা। যার রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বেশি, জীবাণু-টিবানু কোন ক্ষতিই তার করতে পারে না। যার সে ক্ষমতা নেই, সে-ই রোগে ভোগে।

উত্তরটা শুনতে খুবই সহজ। কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে যে কোন প্রাণীরই সহজাত রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা চিরদিনই মস্ত বড় একটা রহস্যের মতই থেকে গিয়েছিল। বিশেষ করে ওঁরা যখন দেখলেন, একই রোগে ভুগছে, এমন রোগীদের যখন একই ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয় তখন কারোর বা রোগ সারে কম সময়ের মধ্যেই, কারোর সময় লাগে বেশী। আবার এমনও হয়, সে ওষুধে কারোর হয়ত কো-কাজই হল না।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, রোগ নিরাময়ের মূল চাবিকাঠিটি কার হাতে থাকে? কতকটা নাটকীয়ভাবেই এর উত্তর দিলেন কয়েকজন বিজ্ঞানী। ইঁদুর এবং গিনিপিগের মধ্যে কয়েক ধরনের 'জীন' বা বংশাণু আবিষ্কার করলেন তাঁরা। দেখলেন, ওই সমস্ত ইঁদুর এবং গিনিপিগ যাদের উপর তাঁরা পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন, যখনই তারা বিশেষ কয়েক ধরনের রোগ-জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে, অমনি ওই সমস্ত 'জীন' তাদের প্রতিরোধের ভূমিকা গ্রহণ করছে। অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়াল এই রকম। যখনই কোন জীবাণু অথবা কোন ক্ষতিকর বিষাক্ত রাসায়নিক অণু তাদের শরীরে প্রবেশ করল, সঙ্গে সঙ্গে তাদের রক্তে তৈরি হয়ে গেল অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল লিমফোসাইট্স, অর্থাৎ এক শ্রেণীর শ্বেত রক্তকণিকা। এবং সেই সঙ্গে বিশেষ ধরনের অ্যাণ্টিবডি বা বিক্রিয়াশীল জটিল প্রোটিন অণু। এদের ভূমিকাটা তখন দাঁড়ায় অম্ল এবং ক্ষারের মত। অনেকেই হয়ত জানেন, নির্দিষ্ট পরিমাণ অম্ল বা অ্যাসিডের সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষার অর্থাৎ অ্যালকালি মেশালে পারস্পরিক বিক্রিয়া ক'রে তারা প্রশমিত হয়ে যায়। তখন অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব কোন চরিত্রই তাদের মধ্যে ধরা পড়ে না। তেমনি ইঁদুর এবং গিনিপিগের শরীরে ঢুকে পড়া ওই সমস্ত জীবাণু এবং বিষাক্ত রাসায়নিক অণুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে সদ্য তৈরী ওই লিমফোসাইট কোষ এবং প্রোটিন অণু। এর ফলে রোগের আক্রমণ থেকে তারা রেহাই পায়।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে: প্রাণী দেহ কোন রোগের জীবাণু বা রোগসৃষ্টিকারী ভাইরাস এবং রাসায়নিক অণুর ক্ষতিকর কাজকর্ম প্রতিহত করতে পারবে কিনা, সেটা যেন নির্ভর করছে কতকটা বংশগতির ওপর। যদি আপনার ক্রোমোজোমের মধ্যে এমন ধরনের জীন বা প্রজনন অণু থাকে যা আপনার শরীরে আক্রমণকারী কোন জীবাণু বা অনুরূপ কোন অণুকে সাবাড় করার মত লিমফোসাইট এবং প্রোটিন অণু তৈরি করতে পারে, তবেই আপনার পক্ষে সম্ভব রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া। এবং সত্যিই 'জীনে'র ভূমিকা যদি এখানে মুখ্য হয়, বলতেই হবে, কারোর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তার বংশগত গুণ। কারণ জীন সব সময় বাবা-মা'র শরীর থেকেই সন্তানসন্ততির মধ্যে সংবাহিত হয়ে থাকে।

হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের বারুজ বেনাসেরাফ (Baruj Benacerraf) এবং স্ট্যানফোর্ড স্কুল অভ মেডিসিনের হাঘ ম্যাকডিভিট (Hugh McDevit) যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে এই নিয়ে ইঁদুর এবং গিনিপিগের ওপর পরীক্ষা চালান। ওঁরাও লক্ষ্য করলেন, কোন কোন ইঁদুর এবং গিনিপিগ সহজে রোগের আক্রমণ প্রতিহত করে,

আবার কেউ কেউ মোটেই তা পারে না। যে সমস্ত জীন রোগ প্রতিরোধের ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে, তাদের নাম দেওয়া হল Ir জীন বা ইম্যুনো রেসপন্স জীন।

শুধু রোগ প্রতিরোধই বা কেন, শল্য চিকিৎসকরা ইদানীং হৃৎপিণ্ড বা শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একজনের কাজ থেকে নিয়ে যে অপরের শরীরে প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করছেন, এবং প্রতিস্থাপনের পর অনেক সময় ঠিকমত তারা কাজ করতে পারে না অথবা পরিত্যক্ত হয়, এর পেছনে কাজ করে এই Ir জীন।

ঠিক এই ধরনের সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করার মত অসামান্য গবেষণার দরুন সুইডেনের রয়েল ক্যারোলিন ইনসটিটিউট দু'জন বিজ্ঞানীকে ১৯৭২-এর নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করলেন। বিষয়ঃ শারীরবৃত্ত অথবা চিকিৎসাবিজ্ঞান। ওঁরা হলেন নিউইয়র্ক রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব-রসায়ন বিভাগের ৪৩ বছর বয়স্ক বিজ্ঞানী ডঃ জেরালড মরিস এডেলম্যান এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব-রসায়নের বিজ্ঞানী ৫৫ বছরের অধ্যাপক রোডনি পোর্টার। প্রাণীদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার মূল রহস্য আবিষ্কারের ব্যাপারে ও'রা পৃথকভাবে কাজ করেছেন। ও'দের আবিষ্কারঃ রোগ সংক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে যে সমস্ত অ্যান্টিবডি অর্থাৎ রক্তের মধ্যে তৈরি প্রোটিন অণু কাজ করে তাদের রাসায়নিক গঠনগুলি নির্দিষ্টভাবে বের করা।

আগেই বলেছি, মরিস এডেলম্যাম এবং পোর্টার পরস্পর পৃথকভাবে গবেষণা চালিয়েছিলেন। এবং সেটা চলছিল ১৯৫৯ থেকেই। অ্যান্টিবডি বলতে যা বলেছি, আসলে সেগুলি বেশ বড় আয়তনের জটিল রাসায়নিক অণু। পোর্টার এই সমস্ত অণুর এমন কতকগুলি অংশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করলেন, যারা শরীরের মধ্যে বাইরে থেকে ঢুকে পড়া জীবাণু বা রোগ সৃষ্টিকারী কণাদের সাবাড় করতে পারে। এর জন্যে এক ধরনের এনজাইমকে তিনি কাজে লাগান। নাম প্যাপাইন (Papain)। এর কাজ অ্যান্টিবডি অর্থাৎ বিশেষ ধরনের প্রোটিন অণুকে ভেঙে ফেলা। পোর্টার এর সাহায্যে এক একটি অ্যান্টিবডিকে তিনভাগে ভেঙ্গে ফেললেন।

এডেলম্যানের গবেষণার পথটি কিন্তু স্বতন্ত্র। তিনি ধরে নেন অ্যান্টিবডিগুলি অন্যান্য প্রোটিন অণুর মত কতকগুলি আমাইনো অ্যাসিডের শৃংখল দিয়ে তৈরি। তাদের গঠন এবং বিন্যাসের উপর গবেষণা করতে গিয়ে ১৯৬৯ সালে অ্যান্টিবডি অণুর ছক তৈরি করলেন তিনি। ছকটির চেহারা দাঁড়াল গামা-গ্লবিউলিন-এর মত। তিনি দেখালেন, এই সমস্ত অণুর এক একটি তৈরি হয়েছে ১৯,৯৯৬টি পরমাণু দিয়ে। তারা পরস্পর জুড়ে থাকে আমাইনো অ্যাসিডের কায়দায়।

বিশেষ বিশেষ রোগে সংক্রামকের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি কিভাবে সংগ্রাম করে এডেলম্যান তাও পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন।



নোবেল পুরস্কার ১৯৭৩

পদার্থ বিজ্ঞান

টানেলিং ফর ফিজিসিস্টস্। মন্তব্য করেছেন 'নিউ সায়ান্টিস্ট' পত্রিকার লেখক ডঃ পিটার স্টাবস্।

এক কথায় বলা চলে ঃ ওঁদের অবদান, সেমি এবং সুপার কনডাকটার বা প্রায় এবং অতিপরিবাহীর অভ্যন্তরে 'ইলেকট্রন কোয়ান্টাম'-এর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে সে সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা যুগিয়েছে ওঁদের তত্ত্ব এবং পরীক্ষালব্ধ গবেষণা।

আসলে নোবেল কমিটি যখন তাঁদের ১৯৭৩ সালের পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করেন বিশ্বের বিজ্ঞানীমহল মোটেই তখন আশ্চর্য হন নি। কারণ ইতিমধ্যে তাঁদের তত্ত্ব এবং আবিষ্কার ইলেকট্রনিকস এবং বিশেষ করে কনডাকটার বিষয়ক শিল্প-উদ্যোগে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণে সমর্থ হয়েছে।

তিন জন। কেমব্রিজের ক্যাভেণ্ডিস গবেষণাগারের ডঃ ব্রেইন জোসেফসন। সুপার কনডাকটার বা অতিপরিবাহীর মধ্যে কী ভাবে টানেলিং ঘটে সে সম্পর্কে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যুগিয়েছেন তিনি। নোবেল পুরস্কারের আর্থিক সম্মানীর অর্ধেক পেয়েছেন তিনি। বাকি অর্ধেক সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে দুজনের মধ্যে। একজন 'আই বি এম' সংস্থার 'ফেলো' জাপানী বিজ্ঞানী ডঃ লিও এসাকি। সেমিকনডাকটার বা প্রায় পরিবাহীর মধ্যে টানেলিং ঘটে এবং তার ফলাফল কী দাঁড়ায় সে ব্যাপারে যথাযথ ব্যাখ্যা যোগাতে সমর্থ হয়েছে তাঁর তত্ত্ব। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রে এখন যে সব 'টানেল ডাইওড' ব্যবহার করা হয়, এসাকির আবিষ্কারের দরুনই তাদের তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয় জন ডঃ আইভার গিয়াভার। জন্ম নরওয়েতে। নাগরিক হিসেবে মার্কিন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানির সঙ্গে তখন তিনি জড়িত। তিনি আবিষ্কার করেছেন 'সুপারকনডাকটিং টানেলিং জংশন'।

নোবেল পুরস্কারের কথা যখন ঘোষণা করা হয় জোসেফসনের বয়েস তখন মাত্র ৩৩

বছর। এতে কম বয়েসে এর আগে আর কেউ নোবেল পুরস্কার পান নি। যে কাজটির জন্যে তাঁকে পুরস্কৃত করা হলো, সেটি তিনি শুরু করেছিলেন পুরস্কার পাওয়ার মাত্র কয়েক বছর আগে। ১৯৬২ সালে। আসলে সেটা ছিল তাঁর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ. ডি লাভের জন্যে গবেষণার বিষয় বস্তু। এসাকির বয়েস ৪৮। তিনিও ওই টানেলিং এর উপরই গবেষণা করে পি এইচ ডি লাভ করেন ১৯৫৯ সালে। গিয়াভারের বয়েস ৪৪। তিনি নোবেল পুরস্কারের কাজটি শুরু করেছিলেন ১৯৫৮ সালে।

'টানেলিং' কথাটির অর্থ কী?

সংক্ষেপে বলা চলে টানেলিং এক ধরনের কোয়ান্টামজনিত প্রভাব। চিরায়ত পদার্থবিদ্যা যার ব্যাখ্যা যোগাতে পারে না। কারণ চিরায়ত পদার্থবিদ্যার তত্ত্ব অনুযায়ী আমরা জানি কোন বস্তুকণার পক্ষে বৃহত্তর স্থিতিশক্তি বা পোটেনশিয়াল এনার্জির বাধা অতিক্রম করাটা সম্ভব নয়। কোন পাথরের টুকরোর পক্ষে পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে গড়িয়ে উপরে ওঠা যেমন অসম্ভব ব্যাপারটা কতকটা সেই রকম।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঘটনাটা দাঁড়ায় অন্য রকম। ধরা যাক কোন বস্তুকণা তরঙ্গ চরিত্র নিয়ে বিরাজ করছে। শ্রোডিংগারের সমীকরণ অনুযায়ী এটা সম্ভব। কারণ তাঁর সমীকরণে বস্তুর গতি প্রকাশ করার জন্যে বস্তুকণাকে তরঙ্গের সঙ্গে কল্পনা করা হয়েছে। শ্রোডিংগারের সমীকরণ অনুযায়ী বস্তুকণার পক্ষে স্থিতিশক্তি বাধা বা পোটেনশিয়াল বেরিয়ার অস্বীকার করে বেরিয়ারের দূরবর্তী অঞ্চলে যাওয়া সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ আলফা কণার কথাই ধরুন। এমনটি ঘটে বলেই তো আলফা কণা (হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস) কোন পরমাণুর নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং খণ্ডিত হয়। নিউক্লিয়াসের ভেতরে থাকে প্রোটন। প্রোটন ধনাত্মক তড়িৎধর্মী কণা। আলফা কণাও ধনাত্মক তড়িৎ ধর্মী। অতএব কোন পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ভেতরে প্রবেশ করার সময় আলফা কণার বাধা পাওয়ার কথা। তা হয় না।

এবার কঠিন বস্তুর কথা ধরুন। ধরুন, সেমি-কনডাকটারের কথা। পরমাণুর মধ্যে কিছু সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে। যাদের বলা হয় বাউন্ড ইলেকট্রন। এদের সাহায্যে পরমাণুরা পরস্পরকে ধরে রাখে। এদের আর এক নাম 'ভ্যালেন্স ইলেকট্রনস'। পরমাণুর থাকে আর এক শ্রেণীর ইলেকট্রন। যাদের বলা হয় 'ফ্রি' বা স্বাধীন ইলেকট্রন। পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে এই ইলেকট্রনরা যখন প্রবাহিত হয়, তখন আমরা বলি পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎশক্তি প্রবাহিত হচ্ছে।

এসাকি দেখিয়েছেন সেমিকনডাকটারের ভেতরে ইলেকট্রন চলাচল করে ফোননের সাহায্যে শক্তি সংগ্রহ করে। আলোককণাকে যেমন বলা হয় ফোটন, কম্পন শক্তিকেও এক ধরনের শক্তিকণা হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। যার নাম দেওয়া হয়েছে ফোনন। ফোননের সাহায্য নিয়ে ইলেকট্রন কণারা প্রায় পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে এমনভাবে চলে; যেন তারা কোন সুড়ঙ্গ পথের মধ্যে দিয়ে আনাগোনা করছে। একেই মোটামুটিভাবে বলা চলে টানেলিং। টানেল ডাইওড তৈরির পেছনে এই নীতিই কাজ করে। এর

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, টানেল ডাইওডের মধ্যে একটি ছোট্ট অঞ্চল থাকে, যাকে বলা হয় "এ রিজিওন অভ্ নিগেটিভ রেজিসট্যান্স"। অর্থাৎ ঋণাত্মক তড়িৎ-রোধী অঞ্চল। এই অঞ্চলে ভোল্টেজ যত বাড়ানো যায়, তড়িৎপ্রবাহ সেই অনুপাতে কমতে থাকে। একেবারে ওহম্-এর সূত্রের উল্টো ব্যাপার। কারণ ওহ্মের সূত্র অনুযায়ী আমরা জানি, ভোল্টেজ বা তড়িৎ বিভব যত বাড়ানো যায়, পরিবাহীর মধ্যে তড়িৎপ্রবাহের মাত্রা ততই বাড়ে।

কোন বস্তুর উষ্ণতা যখন তরল হিলিয়ামের তাপমাত্রায় নামিয়ে আনা হয় তখন ওই বস্তুর মধ্যে ঘটতে থাকে নতুন ধরনের এক কোয়ান্টাম ঘটনা। যাকে বলা হয় 'মাইক্রো কোয়ান্টাম ইফেকট'। আগেই বলেছি, শ্রোডিংগারের সমীকরণ অনুযায়ী যে কোন বস্তুকে তরঙ্গরূপে সূচিত করা যায়। এই তরঙ্গকেই বলা হয় 'ম্যাটার ওয়েভ' বা বস্তু তরঙ্গ। হিলিয়ামের তাপমাত্রায় পদার্থের ইলেকট্রনের বস্তুতরঙ্গ অদ্ভুতভাবে আচরণ করে। সাধারণ তাপমাত্রায় তাদের গতি থাকে এলোপাথাড়ি। কিন্তু ওই অবস্থায় ইলেকট্রন কণাদের মধ্যে ঐকতানের মত একটা নির্দিষ্ট একানুবর্তিতা পরিলক্ষিত হয়।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন জোসেফসন। তারপর নিজেকেই প্রশ্ন করলেন তিনি ঃ ধরা যাক, ওই তাপমাত্রায় কোন একটি সেমিকনডাকটারের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রন কণারা সমলয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। অপর একটি সেমিকনডাকটারের মধ্যে দিয়েও প্রবাহিত হচ্ছে ইলেকট্রন। সমলয়ে যদি ওই দুটি সেমিকনডাকটারের ইলেকট্রন-তরঙ্গ পরস্পর প্রতিক্রিয়া করে, তার ফলটি দাঁড়াবে কেমন? উভয় ইলেকট্রন তরঙ্গের মধ্যে কি 'ইনটারফিয়ারেন্স' বা প্রতিবন্ধকতা ঘটা সম্ভব? একটি সেমিকনডাকটার থেকে তড়িৎ প্রবাহ যদি অপর সেমি-কনডাকটারে প্রবাহিত হয় তা হলে শেষোক্ত ওই প্রবাহের মাত্রাই বা কত দাঁড়াবে? অর্থাৎ মোদ্দা কথা, উভয় তরঙ্গের 'ফেজ্' বা দশার মধ্যে ব্যবধান দাঁড়াবে কতটা?

১৯৬০ সালে আইভার গিয়েভার আবিষ্কার করলেন ধাতব অপরিবাহী সুপার কনডাকটার বা 'মেটাল ইনসুলেটর-সুপার কনডাকটার'। বস্তুটি দাঁড়ালো কতকটা স্যান্ডউইচের মত। উপরে ধাতু, মধ্যে অপরিবাহী এবং নিচে অতিপরিবাহী। গিয়েভারের এই বস্তুটির পরিকল্পনা মনে রেখে জোসেফসন তৈরি করলেন তাঁর 'সুপারকনডাকটিং টানেল জংশন।' যার উপরে এবং নিচে রইলো দুটুকরো সুপার কনডাকটার এবং তাদের মাঝখানে জোড়া হলো একখন্ড অপরিবাহী বস্তু। এই অপরি-বাহী বা ইনসুলেটারের মধ্যে দিয়ে সুড়ঙ্গ পথে ইলেকট্রন কণারা প্রবাহিত হতে পারে।

জোসেফসন এর আগেই সুপারকনডাকটারের মধ্যে কিভাবে সুড়ঙ্গের মত পথ বেয়ে ইলেকট্রন প্রবাহিত হতে পারে সে সম্পর্কে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছিলেন। তাঁর সম্মানে যার নাম দেওয়া হয়েছে 'জোসেফসন ইফেক্ট'। জোসেফসন তাঁর তত্ত্বে যে যে ঘটনার কথা ব্যক্ত করেছিলেন 'সুপারকনডাকটিং স্যান্ডউইচের' সাহায্যে তাদের প্রমাণ করা গেল।

যেমন, প্রথমে ধরা যাক dc জোসেফসন ইফেক্‌ট'। এতে বলা হয়, টানেলের মধ্যে দিয়ে যে বিদ্যুৎশক্তি প্রবাহিত হবে, সেই প্রবাহ স্যাণ্ডউইচের উভয় সুপারকনডাক্‌টারের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ইলেকট্রন তরঙ্গের 'ফেজ ডিফারেন্স' (দশা বিভেদ)-এর 'সাইন'-এর সমানুপাতিক।

রসায়ন

মেটাল স্যাণ্ডউইচ!

অথবা আরও সাধারণভাবে বলা যায় 'স্যাণ্ডউইচ কমপাউণ্ডস্‌'।

হ্যাঁ, ওপরে এবং নিচে দুটি রুটির টুকরো আর সেই টুকরো দুটির মাঝখানে মাংস লেটুস, টমেটো অথবা এক প্রস্ত চিজ—একেই তো ইংরেজিতে বলে স্যাণ্ডউইচ। প্রায় তিন দশক আগে দুটি রাসায়নিক যৌগের মাঝখানে ঠিক স্যাণ্ডউইচের মতই ধাতুকে আবদ্ধ রেখে তৈরি করার চেষ্টা হয় নানা রকম যৌগিক পদার্থ। ওই যৌগিক পদার্থগুলিরই নাম দেওয়া হয় 'স্যাণ্ডউইচ কমপাউণ্ডস্‌'। রসায়ন বিজ্ঞানের এই বিশেষ আঙ্গিনা যাঁরা সমৃদ্ধ করতে সমর্থ হন ১৯৭৩ সালে রসায়ন বিভাগের নোবেল পুরস্কারটি দেবার সময় নোবেল কমিটির নির্বাচকমণ্ডলী তাঁদের উপরই গুরুত্ব দেন বেশি। তাঁরা হলেন লণ্ডনের ইমপিরিয়াল কলেজের অধ্যাপক জিওফ্রে উইলকিনসন এবং মুানিখের Technische Hochschule-এর অধ্যাপক আর্নস্ট ফিশার।

ফিশার উইলকিনসন-এর সাফল্যের কথা বলতে গেলে একটু ভূমিকার দরকার।

সেটা ১৯৫১ সাল। স্ট্রাথক্লাইড বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক পিটার পাউসন তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিউকিউয়েসন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছেন। তাঁর সতীর্থ ডঃ টি. জে. কিলি সাইক্লোপেন্‌-ডাইয়েলি ম্যাগনেসিয়াম আইওডাইড এবং ফেরিক ক্লোরাইড এই দুই রাসায়নিক যৌগের পারস্পরিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে তখন 'ফুলভালেন' (fulvalene) নামে এক ধরনের অজ্ঞাত পরিচয় হাইড্রোকারবন সংশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিক্রিয়া ঘটিয়ে তাঁরা লক্ষ্য করলেন শেষ পর্যন্ত যা তাঁরা পেয়েছেন সেটা মোটেই 'ফুলভালেন' নয়। অন্য একটি রাসায়নিক যোগ। যার নাম 'ডাই সাইক্লোপেনটাডাইয়েনিল আয়রন'।

উইলকিনসন ওই সময় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। পাউসন এবং কিলির গবেষণালব্ধ রিপোর্টটি প্রকাশিত হলো নেচার পত্রিকায়। রিপোর্টটি পড়লেন তিনি। এবং পড়তে গিয়ে মনে হলো, পাউসন এবং কিলি তাঁদের যৌগটির গঠন সম্পর্কে যে বিবরণটি প্রকাশ করেছেন সেটা ঠিক নয়। ওই যৌগের সঠিক গঠন কী হওয়া উচিত সেটা তিনি স্থির করলেন। ঘটনাটি বিশ্বখ্যাত রসায়ন বিজ্ঞানী রবার্ট উডওয়ার্ডের চোখেও পড়েছিল। তিনিও উইলকিনসনকে সমর্থন করলেন। উইলকিনসন এবং উডওয়ার্থ এম. রোজেনব্লুম এবং এম. সি. হুইটিং এর সঙ্গে ১৯৫২

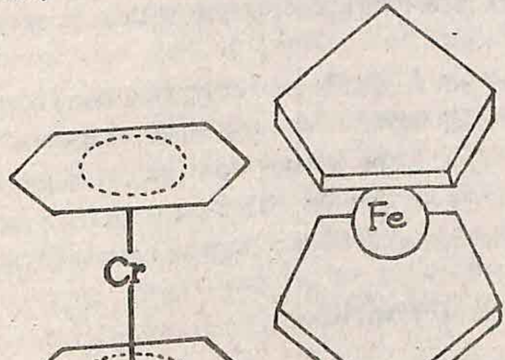
সালে আমেরিকান কেমিকেল সোসাইটির বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশ করলেন তাঁদের গবেষণালব্ধ ফলাফল।

উডওয়ার্ড এই যৌগটির নাম দিলেন 'ফেরোসেন' (ferrocene)। তাঁরা দেখালেন দুটি সাইক্লোপেনটাডাইয়েনিল অ্যানায়নের (যে আয়ন নিগেটিভ আধান বহন করে তাকে বলা হয় অ্যানায়ন) মাঝখানে লোহার পরমাণু স্যাণ্ডউইচের মত অবস্থান করে।

ওই একই সময়ে প্রকাশিত হলো আরও একটি রচনা। যার বিষয়বস্তু এবং সিদ্ধান্ত উইলকিনস প্রমুখেরই অনুরূপ। এই রচনাটির লেখক আর্নস্ট অটো ফিশার এবং ডব্লু ফাব (W Pfab)।

১৯৫২ সাল থেকে একাধিক 'স্যাণ্ডউইচ' যৌগ তৈরি করতে সমর্থ হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ওই সব যৌগে দুটি করে অ্যারোমেটিক জৈব-যৌগের 'রিং' এর মাঝখানে থাকে নানারকম ধাতুর পরমাণু। তাদের বিশুদ্ধিকরণ এবং বিশ্লেষণের কাজও করেছেন তাঁরা। সেই সঙ্গে আবিষ্কার করেছেন তাদের ভৌতিক ধর্মাবলী। ১নং ছবিতে ফেরোসেনের গঠন কেমন হয় দেখানো হলো। এ ছাড়া আংশিক 'স্যাণ্ডউইচ' যৌগও সংশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে। শেষোক্ত এই যৌগগুলির মধ্যে আছে 'সাইক্লোপেনডায়েনিল আয়রন কার্বনিলস'। এই যৌগগুলিতে সাইক্লোপেনটাডায়েনিল এবং নানারকম কার্বনিল গ্রুপ লোহার পরমাণুর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে।

গত তিরিশ বছরে তিরিশেরও বেশি 'স্যাণ্ডউইচ' যৌগ সংশ্লেষিত হয়েছে। কিন্তু উপযুক্ত সাজসরঞ্জামের অভাবে তাদের গঠনবৈচিত্র্য সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা স্থিরনিশ্চিত হতে পারেন নি। যেমন ধরুন পলিফিনাইল ক্রোমিয়াম যৌগগুলির কথা। এই যৌগগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। এরাও যে গঠনের দিক দিয়ে ডাইবেনজিন ক্রোমিয়ামের মতই 'স্যাণ্ডউইচ যৌগ' এ তথ্য আবিষ্কৃত হয় ১৯৫৫ সালে। ফিশারের কৃতিত্বে এটা সম্ভব হয়েছে।



স্যান্ডউইচ যৌগগুলি প্রচণ্ড বিক্রিয়াশীল। যেমন ধরুন; ডাইবেনজিন-ক্রোমিয়াম

এমনিতে বেনজিনের এই স্যান্ডউইচ যৌগটি খুবই স্থিতিশীল। কিন্তু বাতাসের সংস্পর্শে এলেই এই যৌগ ভেঙ্গে যায়। ভেঙ্গে গেলেও শিল্পক্ষেত্রে অনুঘটক হিসেবে স্যান্ডউইচ যৌগের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৫১ সালে যখন প্রথম ফেরোসেন আবিষ্কৃত হয়, এই যৌগ রাসায়নিকদের কাছে তখন তেমন গুরুত্বই পায় নি। এখন ওই সব যৌগ যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। আর সেটা সম্ভব হয়েছে উইলকিনসন এবং ফিশারের ওই সব যৌগের রাসায়নিক গঠন নির্ণয় করার পদ্ধতি আবিষ্কার করার পর। লিসলি অঁরগেলের মত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরাও এই যৌগ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন এখন। উল্লেখ্য, 'জীবনের উৎস' বিষয়ক গবেষণার জন্যে লিসলি প্রখ্যাত হয়েছেন।

উইলকিনস ইম্পিরিয়েল কলেজেরই ছাত্র। পরে এই কলেজে অধ্যাপকের পদে বৃত হন। এ ছাড়া কানাডার 'অ্যাটমিক এনার্জি অথরিটির' সঙ্গেও তিনি জড়িত। ম্যাসাচ্যুসেট্স ইনস্টিটিউট অভ্ টেকনলজি এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সময় তিনি অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'অ্যাডভানস্ড ইনঅরগানিক কেমেস্ট্রি। বইটি লিখেছেন তিনি এবং ম্যাসাচুসেট্স ইনস্টিটিউট অভ্ টেকনলজির রসায়নবিদ্ আল্ কট্ন-এর সঙ্গে মিলিত ভাবে। ১৯৬২ সালে বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর ১৯৭৩ সালের মধ্যে বইটির প্রায় দুই লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে ইংরেজি এবং অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়ে।

ফিশারের বাবা ছিলেন মুনিখের **Technische Hochschule**-এর অধ্যাপক। জন্ম মুনিখে, ১৯১৮ সালে। গোড়ায় ঠিক ছিলো, কলা বিষয়ক ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা করবেন তিনি। পরিবর্তে হয়ে গেলেন বিজ্ঞানী। ধাতব কার্বনিল রসায়নে গবেষণা করে তিনি ডক্টরেট উপাধি পান। তবে শিল্প এবং কলা এখনও তাঁকে আকর্ষণ করে।

উইলকিনসকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, নোবেল পুরস্কার কি আপনার জীবনে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

উইলকিনসের উত্তর ঃ মোটেই না। এই পুরস্কার আমার মধ্যে কোন পরিবর্তন আনবে, এমন চিন্তাটাই অমূলক। এমন হতে পারে, এবার আমার চার পাশে কিছু মানুষের ভিড় বাড়বে, তাঁদের আমন্ত্রণে হয়ত আমাকে এখানে সেখানে কিছুটা ঘোরাঘুরি করতে হবে এবং এমন কিছু করতে হবে যা মোটেই আমি পছন্দ করি না। তবে এ সব ঘটনার আয়ু খুবই কম হয়। হয়ত ছয় মাসের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে।

শারীর এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান

কনরাড লোরেঞ্জ।

নিকোলাস টিনবারগেন।

কার্লফন ফ্রিশ।

কানাঘুষায় শোনা গেল নোবেল কমিটি নাকি ১৯৭৩ সালের চিকিৎসাবিজ্ঞান পুরস্কারের প্রাপক হিসেবে এই তিনটি নামই মনোনীত করতে চলেছেন।

কথাটা কানে যেতেই সমসাময়িক গবেষকদের মধ্যে দেখা দিলো গুঞ্জন। কৌতূহলও। ও'রা ভাবলেন, সে কি? লোরেঞ্জ, টিনবারগেন এবং ফ্রিশ আবার চিকিৎসাবিজ্ঞান করলেন কবে? সারা জীবন ধরে তাঁরা তো শুধু পশুপাখিদের আচরণ নিয়েই গবেষণা করে এসেছেন। ঠিক কথা, এ বিষয়ে নিশ্চয় তাঁরা পথিকৃৎ। প্রাণীর আচরণ সম্পর্কিত মৌলিক গবেষণার প্রতিষ্ঠাতাও বলা চলে তাঁদের। কিন্তু চিকিৎসার সঙ্গে তার সম্পর্ক কোথায়?

শেষ পর্যন্ত গুঞ্জন থেমে গেল।

নোবেল কমিটি সতর্কতার সঙ্গে বিষয়টি বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করলেন ঃ অধ্যাপক কনরাড লোরেঞ্জ এবং নিকোলাস টিনবারগেন নিজেদের উদ্যোগে পাখির আচরণ সম্পর্কে অসামান্য তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছেন। অধ্যাপক কার্লফন ফ্রিশের অবদান, তাঁর সূক্ষ্ম এবং বিশ্লেষণী পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি মৌমাছি এবং বিভিন্ন কীট পরস্পর নিজেদের মধ্যে কীভাবে যোগাযোগ রাখে, বার্তা বিনিময় করতে সমর্থ হয়, সে সম্পর্কে নতুন জ্ঞান যোগাতে সমর্থ হয়েছে। তাঁদের গবেষণার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা সচরাচর পশুপাখি অথবা কীটপতঙ্গদের তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে এসে প্রথম তোলেন গবেষণাগারে। ব্যাপারটা তখন দাঁড়ায় যেন চিড়িয়াখানার মত। সেই আবদ্ধ পরিবেশে তাদের বন্দী অবস্থায় রেখে দিয়ে বিজ্ঞানীরা চালান তাদের আচরণের উপর অনুসন্ধান। বলা বাহুল্য, অমন কৃত্রিম পরিবেশে সেই আচরণ কখনও স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে না। লোরেঞ্জ টিনবারগেন এবং ফ্রিশ-এর পদ্ধতি এ দিক দিয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পাখি এবং কীটপতঙ্গের সহজাত আচরণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে তাঁরা গবেষণাগারের কৃত্রিম পরিবেশের উপর নির্ভর না করে ছুটে গেছেন প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে। যেখানে মানুষ তাদের উপর কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। যেখানে নির্ভয় এবং উদাত্ত তারা। আত্মনির্ভর এবং স্বাধীন। সেই মুক্ত পরিবেশে তাদের আচরণ এবং গতিবিধি স্বতঃস্ফূর্ত। এ দিক দিয়ে দেখতে গেলে ও'রা তিন জন প্রাণীদের আচরণ জানার ব্যাপারে একটি নতুন দিগন্তই খুলে দিয়েছেন। আর আচরণের সঙ্গে যে শারীরবৃত্তীয় ঘটনার সম্পর্ক নিবিড় কে না জানেন সে কথা?

বিচারকরা এক মত হলেন। এবং ঘোষণা করলেন ঃ ১৯৭৩ সালের চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিভাগের নোবেল পুরস্কার একত্রে তিন জন প্রকৃতিবিজ্ঞানীকে অর্পণ করা হোক। ও'রা তিন জন যথাক্রমে অধ্যাপক কনরাড লোরেঞ্জ, অধ্যাপক নিকোলাস টিনবারগেন এবং কার্লফন ফ্রিশ।

প্রসঙ্গটি এই ভাবে তোলা যাক।

১৯৩০-এর দশকে মনোবিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছিলেন, প্রাণীর আচরণ যেন জলের

মত। খানিকটা জল নিয়ে একটি গেলাসে রাখুন। জলের আকৃতি দাঁড়াবে গেলাসের মত। এবার গেলাসের জল ঢেলে রাখুন থালায়। ওই জল তখন থালার আকৃতি নেবে। ব্যাপারটা প্রাণীদের বেলাতেও প্রযোজ্য। চরিত্র অথবা আচরণের ক্ষেত্রে প্রাণীর নিজস্বতা বলতে কিছু নেই। কীভাবে তারা আচরণ করবে সেটা নির্ভর করে তাদের অভিজ্ঞতার উপর। এই অভিজ্ঞতার উৎস পরিবেশ।

লোরেঞ্জ বললেন, এটা ঠিক নয়। তিনি দেখালেন, ডারুইন বিভিন্ন প্রাণীর গঠন এবং শরীরস্থান বা অ্যানাটমির ব্যাপারে তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যে সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছেন সেই দৃষ্টান্ত প্রাণীদের আচরণবিধি জানার জন্যে খুব একটা কাজে লাগানো হয় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে অর্থাৎ তিরিশের দশকে হাঁস এবং শঙ্খ-চিল এই দুই শ্রেণীর পাখি নিজেদের মধ্যে কীভাবে সংকেতবার্তা আদানপ্রদান করে সে সম্পর্কে তিনি প্রচুর তথ্য যোগাতে সমর্থ হন। তিনি দেখান, বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে এ ব্যাপারে বেশ কিছু সমতা রয়েছে। তাদের এই সমধর্মী আচরণ তাঁর কাছে মনে হয়েছে বংশগত। বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই এই গুণটি তারা সহজাত চরিত্র হিসাবে অর্জন করে।

১৯৩৮। লোরেঞ্জ তখন লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত। এই সময় বছর খানেকের জন্যে গবেষণা করার জন্যে তাঁর কাছে এলেন তরুণ টিনবারগেন। প্রচণ্ড উদ্যমে তিনি গবেষণা চালাচ্ছেন জাতিতত্ত্ব বা 'এথোলজি' নিয়ে। লোরেঞ্জ তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উভয়ের মধ্যে খানিকটা মনের ব্যবধান রচনা করেছিল। কারণ লোরেঞ্জ ছিলেন নাৎসিদের সমর্থক, কিন্তু গবেষণা পরস্পরকে বেঁধে রাখলো। এবং তাঁরা উভয়েই জাতিতত্ত্বের বিকাশের জন্যে সচেষ্ট হলেন।

বলা বাহুল্য, অদ্ভুত পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা ছিল দু'জনেরই। তবে দু'জনের পদ্ধতি ছিল দু'রকম। লোরেঞ্জ যে সব পশুপাখিদের আচরণ জানার জন্যে পর্যবেক্ষণ চালাতেন তিনি চেষ্টা করতেন তাঁদের এক জন হতে। পশুদের মধ্যে তিনি বিচরণ করতেন। তাদের তিনি পালন করতেন। তারা অসুস্থ হলে সেবাশুশ্রূষা করতেন। আর এইভাবে বিভিন্ন পশুপাখির সঙ্গে তাঁর নিবিড় সখ্যতা গড়ে উঠতো। তাদের একান্ত সান্নিধ্যে থাকতে থাকতে বুঝে নিতেন তাদের মানসিকতা, তাদের আচরণ।

তুলনায় টিনবারগেনের পদ্ধতিটি ছিল স্বতন্ত্র। মানুষের সান্নিধ্য এবং প্রভাবের বাইরে, প্রাকৃতিক পরিবেশে কীভাবে পশুপাখির আচরণ প্রকাশ পায় তাঁর নজর ছিল সেইদিকে। এর জন্যে তিনি বিচরণ করতেন গভীর জংগলে, জনহীন উপত্যকায়, পাহাড়পর্বতে। যেখানে লোকালয় নেই, মানুষের অনুপ্রবেশ যেখানে পশুপাখিদের জীবনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে নি। ওই সব অঞ্চলে গিয়ে পশুপাখিদের জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে পর্যবেক্ষণ চালাতেন তিনি। এ যেন কিছু সংখ্যক কুশীলব নিজের মনেই রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে চলেছে। আর তিনি তাদের নীরব দর্শক। তার উপস্থিতির কোন প্রভাব নেই তাদের উপর।

যুদ্ধের পর টিনবারগেন এলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইংল্যাণ্ডে)। এখানেই তিনি তাঁর বিখ্যাত গবেষণায় সফল হন। শঙ্খ-চিল এবং 'স্টিকল্-ব্যাক্স' নামে এক ধরনের পাখির নিজেদের মধ্যে প্রণয়কালীন আচরণের উপর।

যে কাজের জন্যে লোরেঞ্জ বিখ্যাত হয়েছেন, সে কাজটিও বড় কম অদ্ভুত নয়। এই গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল মুরগীর বাচ্চা। ডিম ফোটার পরই মুরগীর ছানা নিয়ে লেগে পড়তেন তিনি।

মুরগী ছানার উপর তিনি যে পর্যবেক্ষণ চালান, তার উপর নির্ভর করেই তিনি গড়ে তুলেছেন 'স্ট্রাকচারড্‌নেস অভ্ বিহেভিয়ার'-এর উপর তাঁর যুগান্তকারী তত্ত্ব। তিনি দেখিয়েছেন প্রাণীর মৌলিক আচরণগুলি সহজাতভাবেই সৃষ্ট হয়। আচরণ বংশগতির মধ্যে দিয়ে পরিবাহিত হয়। তিনি বলেন, মানুষের আক্রমণাত্মক চরিত্র তার জন্মগত ব্যাপার।

'জন্মগত'—এই কথাটির বিরুদ্ধে অনেকেই সোচ্চার হয়েছেন। কারণ আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই এ কথা স্বীকার করতে চান নি। এখনও অনেকে মনে করেন, প্রত্যেক প্রাণীর বিভিন্ন আচরণের পেছনে নির্দিষ্ট কোন পটভূমিকা অবশ্যই আছে। তবে সেটা অনেক বেশি পরিবর্তনশীল (ফ্লেকসিবল্)। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর আচরণে এই পরিবর্তনশীলতা অবশ্য চোখে পড়ে না। লোরেঞ্জ পশুপাখিদের আচরণ দেখে মানুষের আচরণকে যদি ব্যাখ্যা করেন, তা হলে ভুলই করবেন। এ ধরনের প্রক্ষেপ ভ্রান্তিমূলক।

টিনবারগেন অবশ্য অতটা প্রক্ষেপ পছন্দ করেন না। বরং বাস্তব পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করেই সিদ্ধান্ত টানতে পছন্দ করেন তিনি। এইভাবেই শিশুদের কল্পনা প্রবণতাকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।

কার্ল ফন্ ফ্রিশ ছিলেন টিনবারগেনের অন্যতম সহযোগী এবং পরামর্শদাতা। ১৯৩০-এর দশকে তিনি মৌমাছিদের উপর কয়েকটি সুন্দর পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য যুগিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন অদ্ভুত এক পদ্ধতিতে মৌমাছিরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রেখে চলে। অপূর্ব এক সংকেত। সেই সাংকেতিক ভাষার উপর নির্ভর করেই তারা একত্রে সমবেত হয়। খাবারের সন্ধান করে। কতটা খাবার খুঁজে পেয়েছে তারা পরস্পর পরস্পরকে জানায়। এমনি কি কোথায় গেলে খাবার পাওয়া যাবে সে খবরও তারা পরস্পরের মধ্যে লেনদেন করে। এই সংযোগ সাধনের জন্যে তারা মিলিত ভাবে নানা ভঙ্গিমায় নাচে। তাঁর এই পর্যবেক্ষণের জন্যে অবশিষ্ট দু' জনের সঙ্গে ফ্রিশ্ নোবেল পুরস্কার পেলেন বটে, তবে সম্প্রতি তাঁর ওই 'নাচতত্ত্ব'টির সমালোচনাও করেছেন কেউ কেউ। সমালোচকদের বক্তব্য মৌমাছির খাদ্যানুসন্ধানের পেছনে আসলে যা কাজ করে, সেটা সম্ভবত তাদের ঘ্রাণের ব্যাপারে সংবেদনশীল এমন কোন প্রত্যঙ্গ, যা খাবার সন্ধানের সময় খাদ্যের ঘ্রাণই তাদের আচরণবিধি ঠিক করে দেয়। ঘ্রাণই সংকেত হিসেবে কাজ করে। তবে বিতর্কের ফলাফল যাই হোক না কেন, জীবন্ত প্রাণীর আচরণ জানার ব্যাপারে ফ্রিশের পদ্ধতিগুলি অসামান্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।



নোবেল পুরস্কার ১৯৭৪

পদার্থ বিজ্ঞান

আমাদের মাথার ওপর যে হাজারো নক্ষত্র, তাদের আমরা দেখতে পাই। কারণ সবাই তারা রাশি রাশি আলোকরশ্মি আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে। কিন্তু সব নক্ষত্রই তো আলো বিকীর্ণ করে না। কোন কোন নক্ষত্র সাধারণ আলো—যাদের আমরা দৃশ্যমান আলো বলে থাকি—যেমন বিকীর্ণ করে তার সঙ্গে অদৃশ্য রশ্মিও ছুঁড়ে দেয়। অদৃশ্য এই সব রশ্মির মধ্যে পড়ে মুখ্যত একস রশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি এবং বেতার তরঙ্গ। এই বেতার তরঙ্গ যথাযথভাবে ধরার ব্যাপারটা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে একটি বড় রকমের সমস্যা।

সাধারণ আলোর মাধ্যমে গ্রহ নক্ষত্র দেখার জন্যে দরকার সাধারণ দূরবীক্ষণ যন্ত্র। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় অপটিকেল টেলিসকোপ। বেতার তরঙ্গের মাধ্যমেও নক্ষত্র, নক্ষত্র জগৎ বা গ্যালাকসি অথবা নক্ষত্রের মত বস্তুকে দেখার জন্যে এক ধরনের টেলিসকোপ কাজে লাগান হয়ে থাকে। যার নাম রেডিও টেলিসকোপ। পদ্ধতিটি একই। কাঁচের দূরবীনের লেন্স অথবা অবতল দর্পণের সাহায্যে দূরবর্তী কোন উৎসের আলো ধরে যেমন আমরা দৃশ্যমান নক্ষত্রদের দেখে থাকি, রেডিও টেলিসকোপ বা দূরবীনের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি একটি ধাতব গামলা আকাশের দিকে মুখ করে বসিয়ে রাখা হয়। দূরবর্তী কোন উৎস থেকে বেতার তরঙ্গ ওই গামলার ওপর পড়লে সে বেতার তরঙ্গকে যন্ত্রের সাহায্যে দৃশ্যমান করে তোলা হয়। ফলে নক্ষত্রটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

শুনতে খুবই সহজ। কিন্তু বাস্তবে বাধা অনেক।

যেমন ধরুন, প্যালোমার মানমন্দিরের সেই দূরবীনটি। এই দূরবীনের লেন্সের ব্যাস ২০০ ইঞ্চি। এই লেন্সটি যে পরিমাণ আলো ধরতে পারে, কোন রেডিও টেলিসকোপকে যদি সেই পরিমাণ বেতার তরঙ্গ ধরতে হয় তা হলে ধাতব গামলার

মত বেতার তরঙ্গ সংগ্রাহকটির ব্যাস হওয়া দরকার কয়েক মাইলের মত। বলা বাহুল্য, ধাতুর তৈরি অতবড় গামলা তৈরি করে আকাশের দিকে মুখ করে রাখা, প্রয়োজনে দ্রষ্টব্য নক্ষত্র, নক্ষত্র-জগৎ অথবা নাক্ষত্রিক বস্তুর দিকে সেই থালার মুখটি ঘুরিয়ে দেয়া, সাধারণ আলোর মাধ্যমে কোন নক্ষত্রকে দেখতে গেলে দূরবীনের যেমন মুখ ঘোরাতে হয়, সেইরকমভাবে—সেটা অসম্ভব ব্যাপার। অথচ এ কথা হয়ত অনেকেই জানেন, কোন নক্ষত্র থেকে যত বেশি আলো দূরবীনের উপর পড়বে, নক্ষত্রটিকে তত বেশি উজ্জ্বল দেখা যাবে। আসলে এর জন্যেই দূরবীনের সামনের লেন্সটিকে অত বড় করে তৈরি করা হয়। বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে কোন কিছু স্পষ্ট করে দেখার ব্যাপারেও বেশি পরিমাণ বেতার তরঙ্গ সংগ্রহ করা দরকার। আর বেশি পরিমাণ বেতার তরঙ্গ সংগ্রহ মানেই বেশ বড়সড় একটি ধাতব গামলার স্থাপনা। বলতে বাধা নেই প্রযুক্তিগত কারণে সেটা সম্ভব নয়।

বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে আকাশ দর্শনের এই অসুবিধে দূর করার জন্যে অভিনব এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন ইংলন্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যার মার্টিন রাইল। এর জন্যে বড় একটি গামলার পরিবর্তে দশ গজ ব্যাসের ছোট ছোট কয়েকটি গামলা কাজে লাগান ; গামলাগুলি নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর বসান হল। এবং এমন ব্যবস্থা করা হল যাতে করে বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে যে নক্ষত্রটিকে দেখার কথা, সবকটি গামলা একই সঙ্গে তার দিকে মুখ করে স্থাপন করা যায়। ব্যাপারটা দাঁড়াল একটি বালতিতে যেখানে দশ মণ জল সংগ্রহ করার কথা—সেই দশ মণ জলই যেন দশটি বালতিতে সংগ্রহ করা হল। বলা নিষ্প্রয়োজন স্যার রাইলের অভিনব এই প্রচেষ্টার ফলে সুদূরবর্তী নক্ষত্র জগৎ এখন আমাদের দৃষ্টিসীমার অনেক কাছে এসে পড়েছে। এবং তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের দরুন নোবেল কমিটি এ বছর তাঁকে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করলেন। ইতিপূর্বে ১৯৬০ সালে তিনি নাইট উপাধিতে ভূষিত হন এবং ১৯৭২ সালে 'অ্যাসট্রোনমার রয়েল' রূপে বিশেষিত হন।

অবশ্য যুগ্মভাবে এই একই পুরস্কার আরও একজন লাভ করলেন। তিনিও ওই কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েরই আর একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ৫০ বছর বয়স্ক ডঃ অ্যান্টোনি হেউইশ। এ'র কৃতিত্ব ইনি এবং এর সহযোগী জেসেলাইন বেশ কয়েক বছর আগে মহাকাশে সর্বপ্রথম 'পালসার্স'-এর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে সমর্থ হন। উল্লেখ্য সেই প্রথম মহাকাশ থেকে বিশেষ ধরনের বেতার সংকেত পেয়ে অনেকেই মনে করেছিলেন, হয়ত বা ভিন্নতর কোন নক্ষত্র জগৎ থেকে অচিন কোন সভ্যতার মানব পৃথিবীর মানুষের উদ্দেশ্যে বেতার সংকেত পাঠাচ্ছে। পরে নিয়মিত পরীক্ষা চালিয়ে হেউইশ এবং আরও কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রমাণ করেছেন (অথবা যথেষ্ট যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন) পালসারস এক ধরনের নক্ষত্র। যাদের বলা হচ্ছে নিউট্রন নক্ষত্র। বলা হয়েছে অতিকায় কোন নক্ষত্রের পারমাণবিক জ্বালানি ক্রমান্বয়ে পুড়তে পুড়তে যখন প্রায় শেষ হয়ে যায়, নক্ষত্রটি তখন ভীষণভাবে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। এত সঙ্কুচিত

হয় যে তখন নক্ষত্রটির অবশিষ্ট ভর প্রচণ্ড চাপে যেন ঠেসে যায়। তখন এক ঘন সেন্টিমিটার জায়গায় যতটা বস্তু থাকে পৃথিবীর তুলনায় তার ওজন গিয়ে দাঁড়ায় কয়েক লক্ষ টনের মত। আর বস্তু বলতে শুধু নিউট্রন।

তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীদের বক্তব্য, নিউট্রন নক্ষত্র প্রচণ্ড গতিতে তার অক্ষের চারপাশে আবর্তন করে। যার ফলে তার চারপাশে সৃষ্ট হয় শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র। এই চৌম্বক ক্ষেত্র নক্ষত্রের পরিমন্ডলে আয়নিত গ্যাস ভাসমান অবস্থায় বিচরণ করে, তার সঙ্গে পারস্পারিক প্রতিক্রিয়া করে। এর ফলেই সৃষ্টি হয় সেই 'বেতার সংকেত'। নিউট্রন নক্ষত্রের আবর্তনের দরুন একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর পৃথিবীর বুকে সেই সংকেত ধরা পড়ে বলেই গোড়ায় মনে হয়েছিল ওই সংকেত দূর নক্ষত্র জগতের কোন বুদ্ধিমান প্রাণীই পাঠিয়ে থাকবে।

হেউইশের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে আমাদের মহাকাশের শুধু নিকটবর্তী অঞ্চলেই নয়, সুদূর নক্ষত্র জগতের মধ্যেও নিউট্রন নক্ষত্র সমানে বিচরণ করে চলেছে।

রসায়ন

রসায়ন শাস্ত্রে এ বছর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন মাত্র একজন। পল জে ফ্লোরি। বয়েস ৬৪। ঠিকানা স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। নোবেল কমিটির বক্তব্য, ম্যাক্রোমলেকুল বা অতিকায় রাসায়নিক অণু সম্পর্কিত মৌলিক গবেষণার দরুন ফ্লোরিকে ১৯৭৪ সালের নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হল।

প্রায়োগিক রসায়নে ফ্লোরি কিন্তু এর আগেই একটি শিরোনামরূপে চিহ্নিত হয়ে রয়েছেন।

বহুদিন আগেই বিজ্ঞানীরা সন্দেহ করেছিলেন, যাদের আমরা অতিকায় অণু বলে চিহ্নিত করি, তাদের তৈরি করার মূলে কাজ করে কিন্তু ছোট ছোট অর্থাৎ কমসংখ্যক পরমাণু দিয়ে তৈরি অণু। যেমন ধরুন ইথিলিন। এটি এক ধরনের গ্যাস। এর এক একটি অণুর মধ্যে থাকে দুটি কার্বন পরমাণু এবং চারটে হাইড্রোজেন পরমাণু। কিন্তু বিশেষ পদ্ধতিতে প্রচুর সংখ্যক ইথিলিনকে জুড়ে দিয়ে যা তৈরি হয়—তাদের বলা হয় পলিথেলিন। জোড় বাঁধার পর তখন তারা আর গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে না। হয় তরল, নতুবা কঠিন। কী হবে সেটা নির্ভর করছে কত সংখ্যক ইথিলিন অণু জোড়া হবে। এবং শুধু ইথিলিনেই নয়, জৈব রসায়ন নানা রকম সরলতম অণু পর পর জুড়ে যে অতিকায় অণু সৃষ্টি করে পরবর্তীকালে তা প্রমাণিত হয়েছে। ইংরেজিতে এ ধরনের অতিকায় অণুদেরই বলা হয় পলিমারস। নাইলন ও নানারকম কৃত্রিম তন্তু—এরা সবাই পলিমার। জীবদেহের বিভিন্ন উপাদান যেমন হিমোগ্লোবিন প্রভৃতি—এরাও পলিমার। উল্লেখ করা যেতে পারে আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে দ্য পণ্ট-এর যে গবেষকদলটি নাইলন তৈরী করে পৃথিবীতে যুগান্তর সৃষ্টি করেছিল, ফ্লোরি তাঁদের অন্যতম। পরবর্তীকালে তাঁর আবিষ্কৃত পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের পলিমারের ওপর গবেষণা এবং বিশ্লেষণের কাজকে সুগম করে তোলার ফলেই আজ বিভিন্ন শিল্প

প্রতিষ্ঠান তাঁদের ইচ্ছেমত প্লাস্টিক এবং নানারকম কৃত্রিম সামগ্রী তৈরি করতে সমর্থ
হয়েছে। এক এক ধরনের পলিমারের গুণাগুণ সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষার জন্যে যে এক
একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার প্রয়োজন, ওই তাপমাত্রা ছাড়া অন্যান্য তাপমাত্রায় তা করা যায়
না, এ তথ্য ফ্লোরিই প্রথম আবিষ্কার করেন। এই তাপমাত্রাকেই বলা হয় ফ্লোরির
তাপমাত্রা। এই আবিষ্কারের ফলে এখন বাজারে যে হাজার হাজার রকমের নাইলন,
প্লাস্টিক বা কৃত্রিম তন্তু দেখা যাচ্ছে, সেগুলি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

ফ্লোরি অতিকায় অণুর আরও নানারকম ধর্মও আবিষ্কার করেছেন। যেমন ধরুন,
এক ধরনের অণু ক্রমান্বয়ে জুড়ে লম্বা একটি শৃঙ্খলের মত বাড়তে শুরু করল। কিন্তু
কীভাবে সেটা বাড়ান যায়, কতটা বাড়ান যায়—এগুলি নিয়ন্ত্রিত করে নানা বৈচিত্র্যের
কত রকমের জিনিসপত্র তৈরি করাই না এখন সম্ভব হয়েছে।

তাঁর আরও একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার—ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'চেইন
ট্র্যানস্মিশন'। অর্থাৎ পর্যায়ক্রমিক সঞ্চালন। ব্যাপারটা এই। ধরুন একটি অণু
আর একটি অণুর সঙ্গে জুড়ে গিয়ে খুদে একটি শৃঙ্খল তৈরি করল। ওই শৃঙ্খলের
সঙ্গে এসে জুড়ল আরও একটি অণু। এইভাবে চলতে চলতে এক সময়ে এ কাজটি থামিয়ে
দেয়া যায়। এবং তখন যে অণুটি ধীরে ধীরে অতিকায় অণুতে রূপান্তরিত হচ্ছিল
সেই অণুটি তার বৃদ্ধি করার ক্ষমতা বা শক্তিকে পরস্পর অণুর মধ্যে সঞ্চারিত করে।
ফ্লোরির এই পদ্ধতিটি কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন শিল্পসংস্থা নানারকম কৃত্রিম তন্তু তৈরি
করেছে, যা নাইলনের চেয়ে তিনগুণ শক্ত অথচ ওজনে অনেক কম।

১৯৬১ থেকে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন
ফ্লোরি। এখনকার গবেষণা প্রাণী এবং উদ্ভিদের মধ্যে যে ধরনের পলিমার দেখা যায়
তাদের নিয়ে। তাঁর বক্তব্য. দেহত্বক, পেশী অথবা হাড় এবং শরীরের নানারকম তন্তু,
এ সব তো দীর্ঘশৃঙ্খল বিশিষ্ট অণু। প্রকৃতি ঠিক যেভাবে তাদের তৈরি করেছে,
গবেষণাগারে তেমনটি করা সম্ভব হলে কৃত্রিম হাড়, ত্বক—এ সব তৈরি করা হয়ত সম্ভব
হতে পারে।

শারীর এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান

না। পরিপূর্ণ একটি প্রাণী অথবা উদ্ভিদ নয়। প্রাণী এবং উদ্ভিদের মূল
গাঠনিক উপাদান—যার নাম জীব-কোষ। পৃথিবীর তাবৎ বিজ্ঞানীর কাছে তার
পরিমণ্ডল এখনও পর্যন্ত যেন এক রহস্যাবৃত পরিবেশ হিসেবেই থেকে গেছে, যদিও
অনেকেই হয়ত জানেন, এক একটি জীব-কোষ যেন এক একটি জটিল এবং অদ্ভুত
রকমের স্বনিয়ন্ত্রিত জগৎ। প্রাণী এবং উদ্ভিদের যাবতীয় খাদ্য শেষ পর্যন্ত এই সব
কোষের মধ্যেই গিয়ে পৌঁছয়, সেই সব খাবারের কোন কোনটি জীবদেহের পক্ষে
নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কোন কোনটি আবার যথেষ্ট ক্ষতিকর কিন্তু স্বনিয়ন্ত্রিত
এই জগতের এমনই ব্যবস্থাপনা, যে-সব খাবার প্রয়োজনীয় জীব-কোষ অনায়াসেই

তাদের গ্রহণ করে নেয়। অপ্রয়োজনীয় যারা, তাদের পরিত্যাগ করে। সেটা সরাসরি সম্ভব না হলেও অন্তত চেষ্টাও করে।

অথবা ভাবুন, কোন জীবাণু হয়ত বা কোন ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ, কিংবা কোন বিকিরণ জীব-কোষে গিয়ে ক্ষতি করার চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে এক অপূর্ব তৎপরতা শুরু হয়ে গেল তার পরিমন্ডলে। বাধা দিতে হবে। কোষের নিজস্ব স্বাভাবিকতা যাতে না ব্যাহত হয় তার চেষ্টা করা দরকার। এটা না করতে পারলেই শরীর অসুস্থ হয়ে পড়বে।

কিংবা ধরুন, একটি কোষ থেকে অনুরূপ আর একটি কোষের সৃষ্টি। তার পর আর একটি। আরও একটি এবং অবশেষে সৃষ্টির কাজটি থামিয়ে দেয়া। অথবা শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজনে প্রতিটি সজীব জীব-কোষের মত তৈরী হয় কত রকমেরই না সামগ্রী। তাদের কোন কোনটিকে বলা হয় এনজাইম বা উৎসেচক রস, কোন কোনটিকে হর্মন বা অন্তঃস্রাবী রস। বিপাকীয় কাজকর্মে যাদের ভূমিকা অপরিহার্য।

কিন্তু এ সবও তো পরের কথা। তার আগে উদ্ঘাটন করা দরকার জীব-কোষের আণুবীক্ষণিক জগতের আসল স্বরূপ। সেটা যতক্ষণ না জানা যায়, ততক্ষণ জীব-কোষের মধ্যে সত্যিই কী ঘটে, কেন ঘটে সে সব জানা যাবে কী করে ?

অজ্ঞাত এই কোষ-জগতের রহস্য উদ্ঘাটন ব্যাপারে অসামান্য গবেষণার জন্যে নোবল কমিটি তাঁদের জীববিদ্যা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান বিভাগের দরুন দেয় নোবেল পুরস্কার এ বছর তিনজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে অর্পণ করেছেন। এঁরা তিনজন যথাক্রমে ডঃ অ্যালবার্ট ক্লড। ইনি ফ্রি ইউনিভার্সিটি অভ্ ব্রুসেল-এর ইনসটিটিউট জুলে বোর্দে'র অধ্যাপক। ডঃ ক্রিশ্চিয়ান আর দ্য দুভে। নিউইয়র্কের রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এবং ৬১ বৎসর বয়স্ক ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অভ্ মেডিসিন-এর অধ্যাপক ডঃ জর্জ ই প্যালাডে। উল্লেখ করা যেতে পারে ডঃ দুভে এবং প্যালাডে এই দুজনের যা গবেষণালব্ধ ফলাফল তাদের মূল সূত্র কিন্তু বিজ্ঞানী ডঃ ক্লডের যুগান্তকারী কাজকর্মের ওপরই প্রতিষ্ঠিত।

অ্যালবার্ট ক্লডের জন্ম বেলজিয়ামে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। '১৯২৯ থেকে ১৯৪৯ দীর্ঘ এই কুড়ি বছর ধরে রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ে কোষ-জীববিদ্যার ওপর গবেষণা চালিয়ে ক্লড আধুনিক কোষ-জীববিদ্যার সোপানকে দৃঢ়তর করেছেন।' এ মন্তব্য নোবেল কমিটির। এর আগে জীব-কোষ বিজ্ঞানীদের কাছে যেন এক অপরিচিত জগৎরূপেই পরিগণিত হোত। ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে ক্লড জীবকোষের অজানা জগৎটিকে বিজ্ঞানীদের সামনে উন্মীলিত করতে এগিয়ে আসেন। যার ফলে পরবর্তীকালে জীব-কোষের সঠিক মানচিত্র তৈরি করার কাজটি সহজতর হয়। এছাড়া সেণ্ট্রিফ্যুগাল বা অপকেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনায় জীব-কোষের বিভিন্ন উপাদান পৃথক করার ব্যাপারে ক্লড কতকগুলি অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন।

বস্তুত জর্জ প্যালাডে ক্লডেরই পদ্ধতি অবলম্বন করে কোষের গঠন এবং তার বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে আরও বহুমুখী তথ্য আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছেন। প্যালাডের জন্ম রুম্যানিয়ায়। ১৯৪০-এর দশকে এই নিয়েই তিনি গবেষণা শুরু করেন রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ মাইটোকনড্রিয়ার সূক্ষ্ম-গঠন নিরূপণ। উল্লেখ্য, মাইটোকনড্রিয়া এক ধরনের জীব-কণা। যারা চরিত্রে ব্যাকটেরিয়ারই অনুরূপ। এরা মুখ্যত বাস করে সব রকম জীব-কোষের সাইটোপ্লাজমীয় পরিমণ্ডলে। একমাত্র ব্যাকটেরিয়া এবং নীলাভ সবুজ অলজী ছাড়া কোষ বিশেষে এদের সংখ্যা ভিন্নতর হয়ে থাকে, এবং এই সংখ্যা কখনও কখনও অন্তত ইঁদুরের প্লীহার কোষে ২৫০০ মতও দেখা গেছে। এরা চেহারায় কখনও খুদে লাঠির মত, কখনও সূক্ষ্ম সুতোর মত। জীব-কোষের মত এরাও বংশ বৃদ্ধি করে।

প্যালাডের আরও একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার রাইবোজোম নামে এক ধরনের কণা। পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে জীব-কোষের বিপাকীয় কাজকর্মের জন্য যে সব প্রোটিনের প্রয়োজন রাইবোজোম তাদের তৈরী করতে সাহায্য করে।

বেলজিয়ামের নাগরিক দ্য দুভে রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করতে আসেন ১৯৬২ সালে। এখানে তাঁর প্রধান কাজই ছিল ক্লড অপকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে কোষের বিভিন্ন উপাদান পৃথক করার যে উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন তাকেই আরো কার্যকর করে তোলায় সাহায্য করা। উল্লেখ্য, ১৯৪৯ সালে লোভেন (Louvain)-এ অবস্থিত ক্যাথোলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করার সময় তিনি এবং তাঁর কয়েকজন সতীর্থ প্রথম আবিষ্কার করেন, কোন কোন এনজাইম জীব-কোষের সাইটোপ্লাজমে ভাসমান এক ধরনের কণার মধ্যে যেন আবদ্ধ হয়ে থাকে। গোড়ায় এসব কণাদের চিনে ওঠা সম্ভবপর হয় নি। পরে ১৯৫৫ সালে দ্য দুভে ইলেকট্রোন মাইক্রোসকোপের সাহায্যে এদের চিহ্নিত করতে সমর্থ হন। এদের নাম রাখা হল লাইসোসোমস (Lysosomes)। এদের দেখতে কতকটা গোলাকার থলের মত। এই সব থলের মধ্যে থাকে নানা রকমের এনজাইম। এই এনজাইমগুলিই জীব-কোষের নানা রকম বস্তু, যেমন কার্বোহাইড্রেটস, ফ্যাট, প্রোটিন, নিউক্লেয়িক অ্যাসিড প্রভৃতি ভেঙ্গে শরীরে শক্তি যোগান অথবা মেরামতি বা গাঠনিক কাজ করতে সাহায্য করে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যাবতীয় রোগ তা সে সংক্রামিত বা শারীরবৃত্তীয় উপসর্গের দরুনই হোক অথবা বংশগতই হোক—যেমন, ক্যানসার, তাদের মূল উৎপত্তি কিন্তু কোষের মধ্যেই ঘটে থাকে। এবং তাদের মূলে কাজ করে লাইসোসোমের মধ্যে জমে থাকা নানারকম এনজাইম। এমন কথাও বলা হয়েছে, সিলিকোসিস এবং অ্যাসবেসটোসিস (অ্যাসবেসটস ঘটিত ক্যানসার) প্রভৃতির মূলেও লাইসোসোমঘটিত এনজাইম কাজ করে। এ সব ক্ষেত্রে ওই সব এনজাইম ডি এন এ অণুর সংকেতবাহী অংশগুলিকে নষ্ট করে দিয়ে শরীরের স্বাভাবিক বিপাকীয় ব্যবস্থাকে নষ্ট করে দেয় বলেই ওই সব রোগ হয়ে থাকে।

বলা বাহুল্য, ক্লড, প্যালাডে এবং দ্য দুভের গবেষণা দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ের ব্যাপারে যে যথেষ্ট সাহায্য করবে, সন্দেহ নেই।



নোবেল পুরস্কার ১৯৭৫

পদার্থ বিজ্ঞান

১৯৪৩। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করাল স্পর্শে সারা ইউরোপ তখন সন্ত্রস্ত। হিটলারের গেস্টাপো বাহিনী ইউরোপের প্রতিটি মানুষের কাছে যেন অমোঘ বিভীষিকা। ইংলণ্ডের গোপন সংস্থা 'ম্যাড' জার্মান আক্রমণকে প্রচণ্ড আঘাত হানার জন্যে গোপনে পরমাণু বোমা তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

ইংল্যাণ্ড থেকে বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী চ্যাডউইক ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে খবর পাঠালেন আর একজন বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানীর কাছে। নীলস বোর। আধুনিক পরমাণু গঠন-তত্ত্বের উদ্গাতা। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে চ্যাডউইক জানালেন, কোপেনহেগেন এক মুহূর্তের জন্যেও আর আপনার পক্ষে নিরাপদ নয়। আমরা চাই আপনি ইংল্যাণ্ডে চলে আসুন। সমস্ত রকম বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব আমাদের।

নীলস বোর কোনমতেই দেশত্যাগী হতে চাননি। কারণ তিনি জানতেন দেশ ছেড়ে চলে গেলে দেশের মানুষের মনোবল ভেঙ্গে পড়বে। কিন্তু অবস্থা এমন দাঁড়াল, তাঁকে রাজী হতে হল।

গোপন পথে নীলস বোর চলে এলেন সুইডেনে। একান্ত আদরের কনিষ্ঠ পুত্র অ্যাগের তখন বয়স ২১। পদার্থবিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র। কয়েকদিন পর গেস্টাপোদের চোখে ধুলো দিয়ে প্রাণ হাতে করে তিনিও বাবার সঙ্গে এসে মিলিত হলেন স্টকহোমে।

এর অব্যবহিত পর খোদ চার্চিলের বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা লর্ড চেরওয়েল ওরফে ডঃ লিনডেনম্যান-এর কাছ থেকে এল সরকারী আমন্ত্রণপত্র। নীলস বোর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। এবং জানালেন আমি চাই অ্যাগেও আমার সঙ্গে থাকুক, সে আমার সহকারী হিসেবে কাজ করবে!

সেটা অক্টোবর ১৯৪৩।

ইংলণ্ডে কিছু সময় অতিবাহিত করার পর বাবা ছেলে আবার পাড়ি দিলেন আতলান্তিকের ওপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ছদ্মনামে। বাবা নীলস বোর নিকোলাস বেকার। অ্যাগের নাম জেমস বেকার নিকোলাসের সেক্রেটারি। এর পর তাঁদের জীবনে একের পর এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়।

যুদ্ধ শেষ হলে পিতাপুত্র ফিরে এলেন আবার কোপেনহেগেনে। নিজেদের দেশে। এখানে প্রায় কুড়ি বছরের বেশী সময় নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গবেষণা চালিয়ে পরমাণুর গঠন-বৈচিত্র্যের ওপর অসামান্য তথ্য এবং তত্ত্ব দাঁড় করালেন অ্যাগে। এবং আরও দুজন।

বাবা নীলস বোর পারমাণবিক গঠন এবং পারমাণবিক বিক্রিয়া সংক্রান্ত যুগান্তকারী গবেষণার জন্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯২২ সালে। আইনস্টাইনের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির এক বছর পর। ১৯৭৫ সালে ওই একই বিষয়ের ওপর অসামান্য গবেষণার জন্যে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হলেন একত্রে তিনজন অ্যাগে বোর (৫৩) ডেনমার্কের আর একজন পদার্থবিজ্ঞানী বেঞ্জামিন মোটেলসন এবং জেমস রেইন ওয়াটার। প্রথম দুজন কোপেনহেগেনের নীলস বোর ইনস্টিটিউটের সঙ্গে জড়িত। রেইন-ওয়াটারের কর্মস্থল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। নোবেল কমিটির ঘোষণা ১৯৪০ এবং ১৯৫০-এর দশকে কণা পরমাণু বিজ্ঞান এবং পারমাণবিক গঠন সম্পর্কিত অসামান্য গবেষণার জন্যে এই তিন বিজ্ঞানীকে যুগ্মভাবে ১৯৭৫-এর নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

বলা বাহুল্য ১৯১৩ সালে নীলস বোর পদার্থের পরমাণুর যে ছবিটি তুলে ধরেছিলেন, তার চেহারাটি ছিল কতকটা সৌরমণ্ডলের মত। সূর্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কক্ষপথে যেমন গ্রহগুলি পরিক্রমণ করে ঠিক তেমনি, প্রতিটি পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করে একটি নিউক্লিয়াস বা পরমাণু-কেন্দ্র। এর চার পাশে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিক্রমণ করে ঋণাত্মক বিদ্যুৎধর্মী কণা ইলেকট্রন। আর পরমাণু কেন্দ্রের মধ্যে থাকে ধনাত্মক বিদ্যুৎ কণা প্রোটন এবং বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ কণা নিউট্রন। বোর বলেছিলেন, পরিক্রমণরত ইলেকট্রন কণার কার শক্তি কতটা হবে সেটা নির্ভর করবে, কোন্ ইলেকট্রন কোন্ পরিক্রমণ পথে বিচরণ করছে তার ওপর। বাইরে থেকে ফোটন অথবা বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিকিরণ ইলেকট্রনের ওপর আপতিত হলে ইলেকট্রন তাদের শোষণ করে উচ্চতর শক্তিসম্পন্ন কণায় রূপান্তরিত হয়। তখন ওই কণা তার নিজস্ব পরিক্রমণ পথ ছেড়ে ভিন্নতর পরিক্রমণ পথে সরে যায়। পরিবর্তে এক সেকেণ্ডের দশ কোটি ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে পরমাণু তার নিজস্ব ফোটন স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিত্যাগ করে এবং ওই ইলেকট্রন আবার তার স্থায়ী পরিক্রমণ পথে ফিরে আসে। উল্লেখ্য, বোর পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে কল্পনা করে নেন একটি গোলকের মত।

পরবর্তী কয়েক দশকে প্রমাণিত হয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন, মাত্র এই তিনটি মৌল-কণাই পদার্থে পরমাণুর একমাত্র উপাদান নয়। পরমাণু-কেন্দ্রকে চূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গে একে একে আবিষ্কৃত হতে লাগল আরও নানা রকমের কণা। এদের

কেউ ধনাত্মক বিদ্যুৎধর্মী, কেউ ঋণাত্মক বিদ্যুৎধর্মী, কেউ বা বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ। এছাড়া এটাও প্রমাণিত হল, পরমাণুর কিছু সংখ্যক ইলেকট্রন কণা ঋণাত্মক বিদ্যুৎধর্মী ভিন্নতর মৌল কণার সাহায্যে প্রতিস্থাপনও করা যায়। শেষোক্ত এই ধরনের ঘটনা নিয়ে ভাবতে গিয়ে পদার্থবিজ্ঞানী পরমাণুর গঠন সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করলেন। ইতিমধ্যে শক্তিশালী পরমাণু চূর্ণকারী যন্ত্রাবলী আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়তে লাগল নিত্যনতুন মৌল কণা। আবিষ্কৃত হল পজিট্রন। যার ভর ইলেকট্রনের ভরের প্রায় সমান। কিন্তু এই কণা ধনাত্মক বিদ্যুৎধর্মী। নিউট্রিনো, যার ভর ইলেকট্রনের চেয়ে কম, কিন্তু বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ। মেসন। এরা এমন ধরনের মৌল কণা যাদের ভর ইলেকট্রন এবং প্রোটনের ভরের মধ্যবর্তী পর্যায়ে পড়ে এবং যাদের কেউ ধনাত্মক বিদ্যুৎধর্মী, কেউ ঋণাত্মক বিদ্যুৎধর্মী, আবার কেউ বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ। এদের নাম যথাক্রমে পাইওন, মিউওন প্রভৃতি। এবারকার তিনজন নোবেল বিজ্ঞানীর (পদার্থবিজ্ঞানে) মধ্যে একজন জেমস রেইনওয়াটার মিউওন সংক্রান্ত পরমাণু নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণার কাজ করেছেন। এই গবেষণা পরমাণুর গঠন সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য যুগিয়েছে। বিশেষ করে, পরমাণুকেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন কণারা কিভাবে বিন্যস্ত থাকে সে সম্পর্কে তো বটেই। মিউওন নিয়ে কাজ করার সুবিধা এই, এই কণারা সরাসরি নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে, নিউক্লিও শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয় না, এবং একমাত্র প্রোটনের বিদ্যুৎ আধানের সঙ্গেই বিক্রিয়া করে।

অ্যাগে বোর, বেঞ্জামিন মোটেলসন এবং জেমস রেইনওয়াটারের গবেষণা পরমাণু কেন্দ্রের নানান বিচিত্র চরিত্রাবলী ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করেছে। কিভাবে পরমাণু-কেন্দ্রের মধ্যে অসংখ্য রকমের কণা ঘুরপাক খেয়ে বেড়ায় অথবা কম্পিত হয় এমন সব তথ্য। তাদের এ ধরনের আচরণের ফলে নিউক্লিয়াস বা পরমাণুকেন্দ্রের চেহারাটা, নীলস বোর যেমন বলেছিলেন 'গোলকের মত,' তেমনটি আর থাকে না। বরং তার চেহারাটা দাঁড়ায় ডিমের মত। তাঁদের তথ্যাবলী কণা পদার্থবিজ্ঞানের অনেক অসমাধিত ঘটনাবলীর কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় সহজতর করেছে।

রসায়ন

রসায়নে নোবেল পুরস্কারে বৃত হলেন দুজন। জন ভারকূপ কনফোর্থ (৫৮)। জন্ম সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ায়। বর্তমানে সাসেকস বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। এবং ভ্লাদিমির প্রেলগ (৬৯)। ইনি জড়িত রয়েছেন জুরিখ-এর সুইস ফেডারেল ইনস্টিটিউট অভ্ টেকনলজির সঙ্গে। এঁরা দুজনই কাজ করেছেন জৈব রসায়নের ওপর। কর্নফোর্থ বাল্যকাল থেকেই বধির। কেউ কেউ বলেন হয়ত এর জন্যে কর্নফোর্থ চিরদিনই স্বল্পভাষী। উনি মগজের কাজ চালান শুধু চোখের সাহায্যে। আর সে

কাজ নানা রকমের এনজাইম বা উৎসেচক রসের কেলাসের এবং অণুর ত্রিমাত্রিক গঠন-বৈচিত্র্যের সন্ধানে।

অনেকেই হয়ত জানেন জীবদেহের শারীরবৃত্তীয় কাজকর্মের জন্যে প্রয়োজন উৎসেচক রস। আপনি খাবার খেলেন সে খাবারকে হজম করতে হবে। তার জন্যে দরকার কয়েক ধরনের উৎসেচক রস। দেহের কোথায় কেটে গেল। রক্ত পড়া বন্ধ করার জন্যে কাটা জায়গায় রক্ত জমিয়ে দিতে হবে তার জন্যে চাই আর এক ধরনের উৎসেচক রস। শরীরের কাটা জায়গা জোড়া দেবার জন্যে যে নতুন কোষ-কলা তৈরি করতে হয় সেখানেও এই বস্তুর ভূমিকা অপরিহার্য। বস্তুত উৎসেচক রস জীবকোষের গঠনমূলক কাজই যে শুধু করে তা নয়, ওই সব কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণও করে।

উৎসেচক রস প্রোটিন অণু। গড়ে প্রতিটি জীবকোষে (মৃত নয়) প্রায় ৩০০০ রকমের উৎসেচক রস তৈরি হতে দেখা যায়। এদের এক একটির কাজ এক এক রকমের। শরীরে সমস্ত রকমের জীব রাসায়নিক বিক্রিয়াকে সাহায্য করাই এদের কাজ। বিশেষজ্ঞদের মতে কর্নফোর্থের গবেষণা এই সব উৎসেচক রসের কার্যকারণ রহস্য জানতে অনেক বেশি সাহায্য করবে।

কর্নফোর্থ পড়াশুনার জন্যে সিডনি থেকে ১৯৪১ সালে ব্রিটেনে চলে এসে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। পরে কিছু কালের জন্যে চলে যান কেন্টের সিটিংবোরন-এ অবস্থিত সেল রিসার্চ ল্যাবোরেটরিতে। বস্তুত এই গবেষণাগারেই স্টেরিও-রসায়ন এবং এনজাইমজনিত অণুঘটকের ওপর যে সব গবেষণা তিনি করেছিলেন সেই সব গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি নোবেল পুরস্কারে বৃত হলেন। তাঁর মৌলিক গবেষণার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোলেস্টারলের জৈবিক সংশ্লেষণ বা বাইও-সিনথেসিস ঘটিত পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ। অনেকে জানেন, নানা রকমের স্টেরয়েড যোগ যেমন কোলস্টারল হরমোন প্রভৃতির জন্যে প্রয়োজন মেভালোনিক অ্যাসিড। এনজাইম-ঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এ থেকে তৈরি হয় স্কুয়ালেন নামে এক শ্রেণীর রাসায়নিক যোগ। স্কুয়ালেন দীর্ঘ শৃংখল বিশিষ্ট রাসায়নিক যোগ। এই শৃংখলের ঠিক কোন কোন অংশের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন এনজাইম বিক্রিয়া করে এক-এক ধরনের স্টেরয়েড তৈরি করে কর্নফোর্থের গবেষণা তার কায়দাকানুন জানতে সাহায্য করেছে। এ ব্যাপারে তিনি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্য নেন।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের রসায়ন বিভাগের বিজ্ঞানী অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তীর মন্তব্য ঃ কর্নফোর্থের গবেষণা এনজাইম ঘটিত জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়ার অনেক রহস্যকে উদ্ঘাটন করবে।

বলা বাহুল্য, প্রেলগের কাজের ধারাও কর্নফোর্থের অনুরূপ। নানা রকম জৈব-রাসায়নিক যোগ এবং অ্যান্টিবাইওটিকস-এর আণবিক গঠন সংক্রান্ত সমস্যাবলী নিয়ে তাঁর কাজ। ওই সব কাজ অনেক মৌলিক তথ্য যোগাতে সাহায্য করেছে। বিশেষ করে স্টিরিওরসায়নের অনেক জটিল বিক্রিয়ায় ব্যাখ্যা তাঁর গবেষণা যথেষ্ট সহজতর করবে বলেই অনেকের বিশ্বাস।

শারীর এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান

চিকিৎসা বিজ্ঞানে ১৯৭৫-এর নোবেল পুরস্কারও মিলিতভাবে অর্জন করলেন তিনজন বিজ্ঞানী। রেনাতো দুলবেক্কো, (৬১)। জন্ম ইটালিতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। বর্তমানে লণ্ডনের একটি ক্যানসার গবেষণাগারের সঙ্গে জড়িত। হাওয়ার্ড টেমিন, (৪০)। ইনি জড়িত রয়েছেন উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। এবং ম্যাসাচুসেটস ইনসটিটিউট অভ টেকনোলজির বিজ্ঞানী হাওয়ার্ড বালটিমোর (৩৭)। নোবল কমিটির বক্তব্য, আর এন এ অথবা ডি এন ঘটিত ভাইরাসই মানুষের কোন কোন ক্যানসার রোগের যে কারণ এই তিন বিজ্ঞানীর গবেষণা এই তথ্যটি নির্ভর-যোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছে। এবং তাঁদের গবেষণা ভবিষ্যতে হয়ত ক্যানসার রোগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে।

এই তিন বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের পূর্বে অনেকের কাছেই এ তথ্যটি জানা ছিল, একাধিক রোগের মূলে কাজ করে ভাসরাস। এইসব ভাইরাস সরাসরি প্রাণীকোষের মধ্যে প্রবেশ করে ওই কোষের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত করে। এবং শুধু তাই নয় ওই কোষগুলিকে অনুরূপ ভাইরাস তৈরী করতে বাধ্য করে। কোপেনহেগের গেনটফটে হসপিটাল-এর জে নেরূপ এবং তাঁর সহকারীরা এমন কথাও বলেছেন কোন কোন ক্ষেত্রে বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস রোগ সৃষ্টির পেছনে কাজ করে এক ধরনের ভাইরাস। নাম Coxsackie B। কিন্তু প্রশ্ন এই এদের কাজ করার পদ্ধতিটি কি রকম ?

হ্যাঁ, ক্যানসারের কথাই ধরা যাক।

যে কার্জটির জন্যে টেমিন এবার নোবেল পুরস্কার পেলেন, সে কাজটি তিনি শুরু করেছিলেন ১৯৬৪-৬৫ সাল নাগাদ। এর আগে থেকে অনেকেরই জানা ছিল কোন কোন ভাইরাসই ক্যানসার রোগের কারণ। অবশ্য মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে। এই ধরনের ক্যানসার আক্রান্ত প্রাণীর দেহ থেকে ভাইরাস সংগ্রহ করে অনুরূপ কোন প্রাণীর দেহে প্রতিস্থাপিত করলে শেষোক্ত প্রাণীও ওই ধরনের ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়। এই সব ভাইরাসের জিনের উপাদান যদি ডি এন এ বা ডি অক্সি-রাইবো নিউক্লেয়িক অ্যাসিড হয়, তাহলে তাদের বলা হয় ডি এন এ টিউমার ভাইরাস বা ডি এন এ ক্যানসার ভাইরাস। আর এই উপাদানগুলি যদি আর এন এ বা রাইবো নিউক্লেয়িক অ্যাসিড হয় তাহলে বলা হয় আর এন এ টিউমার ভাইরাস।

আরও একটা ব্যাপার। অনেকেই লক্ষ্য করেছেন, ওই সব প্রাণীর কোষকলা ক্যানসারগ্রস্ত হয়ে গেলে ওই কোষকলায় সম্পূর্ণ ভাইরাস না থাকলেও চলে। যার অর্থ ওই ভাইরাসের সম্পূর্ণ অংশ অথবা ভগ্নাংশ সুস্থ কোষকলার সঙ্গে একীভূতভাবে মিশে গিয়ে যে কোষকলা সৃষ্টি করে, সেই কোষকলা পরিপূর্ণ কোষের মত কাজ করে (এক্ষেত্রে ক্যানসারদুষ্ট কোষ)। এবং বিভাজিত হয়ে দুষ্ট কোষই সৃষ্টি করে। এর অর্থ ওই ভাইরাসের জিন-এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

কিন্তু কথা হল, ডি এন এ ভাইরাসের জিনের প্রাণী-কোষের ডি এন এ'র সঙ্গে

একীভূত হয়ে (integrated) মিলে যাওয়া না হয় সম্ভব। তাই বলে আর এন এ ভাইরাসের জিন প্রাণী-কোষের ডি এন এ-র সঙ্গে সংযুক্ত হয় কি করে ?

এর জন্যেই টেমিন তখন প্রস্তাব করেন, একটা ব্যাপার ঘটলে কিন্তু এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সেটা হল, আর এন এ টিউমার ভাইরাসের জিনের আর এন এ থেকে যদি ডি এন এ তৈরি হয় (প্রতিলিপিত) তাহলে সেই ডি এন এ প্রাণীকোষের জিনের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে।

বাধা পেলেন টেমিন। কারণ প্রচলিত মতবাদ ডি. এন. এ থেকে আর. এন এ তৈরি হতে পারে, কিন্তু আর. এন এ থেকে ডি. এন. এ হওয়া সম্ভব নয়।

টেমিনও ছাড়ার পাত্র নন। তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত হলেন তাঁর বাল্যবন্ধু বালটিমোর। তাঁরা পৃথক পৃথক ভাবে আর. এন এ টিউমার ভাইরাস নিয়ে পরীক্ষা নলে আর. এন. এ থেকে সত্যি সত্যিই ডি. এন এ তৈরি করলেন। বিপরীতমুখী এই পদ্ধতিকেই বলা হয় রিভার্স ট্র্যানসক্রিপসন এবং যে এনজাইম এই কাজে সাহায্য করল তার নাম দেওয়া হল রিভার্স ট্র্যানসক্রিপটেজ। উল্লেখ্য, টেমিন প্রথম এই ব্যাপারটার প্রস্তাব করেন বলে এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় টেমিনিজম।

পরে বেশ কয়েক ধরনের টিউমার ভাইরাসের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এমন কি মানুষের লিউকোমিয়া বা স্তনের ক্যানসার কোষে বিশেষ ধরনের আর. এন. এ ভাইরাস পাওয়া গেছে (স্তনের ক্যানসার আক্রান্ত রোগীর দুধের মধ্যেই এই ভাইরাস পাওয়া যায়)। তাদেরও এই ধরনের বিপরীতমুখী বিক্রিয়া করার ক্ষমতা আছে। উল্লেখ্য, পরে মার্কিন দেশের বেথেসডাস্থিত ন্যাশনাল ক্যানসার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের রবার্ট গ্যালো এবং আরও অনেকে এই ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করেছেন। ভারতেও এ নিয়ে কাজ করেছেন টাটা ইনস্টিটিউট অভ্ ফানডামেন্টাল রিসার্চের ডঃ মনোহর রামচন্দ্র দাস এবং টাটা মেমোরিয়াল হসপিটালের ডঃ সত্যবতী সিরসাত প্রমুখ।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে তৃতীয় নোবেল বিজ্ঞানী দুলবেকোকার অবদান তাঁর দীর্ঘ গবেষণা জীবনে তিনি এমন কতকগুলি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন যাদের সাহায্যে ভাইরাস সংক্রান্ত এ ধরনের গবেষণার কাজ সহজতর হয়েছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ঘোষণার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর কলকাতার বসু বিজ্ঞানমন্দিরের বিজ্ঞানী ডঃ রাধাকান্ত মণ্ডলকে প্রশ্ন করেছিলাম এ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করুন।

ডঃ মণ্ডলের মন্তব্য ঃ শুধু যে আর এন এ টিউমার ভাইরাসেই এমন বিপরীতমুখী প্রক্রিয়া চলে তা নয়, প্রাণীদেহের যে সব কোষ দ্রুত বৃদ্ধিশীল যেমন ভ্রূণের কোষ সে ক্ষেত্রেও চলে। মুখ্য কৃতিত্ব টেমিনার। তিনিই প্রথম বলেন আর এন এ থেকে ডি এন এ হতে পারে। ক্যানসার চিকিৎসার পথ কতটা এ থেকে সুগম হবে এখনই বলা যায় না। তবে এর ফলে ভাইরাসের ক্ষমতা, জিনের কাজ করার কায়দা, সুস্থ কোষ কী করে ক্যানসার কোষে পরিণত হয়, এমন অনেক বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান অর্জন করতে সাহায্য করবে।



নোবেল পুরস্কার ১৯৭৬

পদার্থ বিজ্ঞান

পদার্থবিজ্ঞানে অসামান্য গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ এ বছর নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হলেন দুজন বিজ্ঞানী। ম্যাসাচুসেটস ইনসটিটিউট অভ্ টেকনলজির অধ্যাপক সামুয়েল সি সি টিং এবং ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড লিনিয়ার অ্যাকসেলারেটার (SLAC) কমপ্লেকসের অধ্যাপক বার্টন রিখটার। ১৯৭৪ সালের শেষের দিকে প্রায় একই সময়ে এঁরা নিজস্ব পদ্ধতিতে পৃথক পৃথক ভাবে সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের মৌলকণা আবিষ্কার করেন। রিখটার যার নাম দিয়েছেন 'সাই' (PSI) এবং টিং নাম দিয়েছেন 'জে' (J)। নোবেল পুরস্কার ঘোষণার প্রাক্কালে সুইডিশ রয়াল অ্যাকাডেমি অভ্ সায়েন্সেসের অধ্যাপক গোয়েস্টা একসপং-এর মন্তব্য : মৌলকণা বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত যা কিছু করা হয়েছে রিখটার এবং টিং-এর আবিষ্কার নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। পদার্থের সৃষ্টিরহস্যের সন্ধানে পৃথিবীর তাবৎ বিজ্ঞানী এতদিন যে পদ্ধতিতে কাজ করে আসছিলেন, রিখটার এবং টিং-এর গবেষণা সেই সব পদ্ধতিতে এনে দিয়েছে বড় রকমের এক পরিবর্তন।

যে সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে টিং এবং রিখটার এ বছর নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হলেন তার গৌরচন্দ্রিকায় কিন্তু সেই একই চিরায়ত প্রশ্ন : বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কতরকম বস্তুই না বিরাজ করছে। তাদের মূল উপাদান কি ?

গ্রীক শব্দ 'অ্যাটোমস' এসে দাঁড়াল 'অ্যাটম'-এ। যার অর্থ অবিভাজ্য। এই শব্দটিকেই বাংলায় আমরা বলে থাকি পরমাণু। এক সময়ে মনে করা হোত পরমাণুই বস্তুর অখণ্ড অবস্থা। কিন্তু ১৯১১ সালে ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী আর্নেস্ট রাদারফোর্ড প্রমাণ করলেন, কথাটা ঠিক নয়। যে কোন পরমাণুরই মধ্যে রয়েছে একটি ঘন অংশ। যার নাম দেওয়া হল নিউক্লিয়াস। আর এই নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে আবর্তন করে

আর এক ধরনের কণা। ইলেকট্রন। পরবর্তীকালে নিউক্লিয়াসকেও বিচূর্ণ করা হল। দেখা গেল নিউক্লিয়াসও অখণ্ডনীয় নয়। হাইড্রোজেন ছাড়া অবশিষ্ট তাবৎ মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসে থাকে দুরকমের কণা। প্রোটন এবং নিউট্রন। একমাত্র হাইড্রোজেনর নিউক্লিয়াসে থাকে একটি মাত্র প্রোটন, নিউট্রন থাকে না।

পদার্থবিজ্ঞানীরা তখন বললেন, স্থূলে চোখে লোহা, রুপো, সোনা, কার্বন, অকসিজেন প্রভৃতি যত মৌলিক পদার্থই আমরা দেখি না কেন তাদের মূল উপাদান কিন্তু তিনটি। ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন। কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর মধ্যে কতগুলি ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন রয়েছে তার ওপরই নির্ভর করবে পদার্থের সত্যিকারের স্বরূপ। যেমন, উদাহরণ হিসেবে বলা চলে হাইড্রোজেন পরমাণুতে থাকে একটি ইলেকট্রন ও প্রোটন, ফসফরাস পরমাণুর নিউক্লিয়াসে আছে পনেরটি প্রোটন এবং পনেরটি নিউট্রন। এবং তার নিউক্লিয়াসের চারপাশে আবর্তন করে পনেরটি ইলেকট্রন। অ্যালুমিনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকে ১৩টি প্রোটন এবং ১৪টি নিউট্রন। আর তার নিউক্লিয়াসের চার পাশে ঘোরে ১৩টি ইলেকট্রন। উল্লেখ্য, ইলেকট্রন ঋণাত্মক বিদ্যুৎধর্মী কণা। প্রোটন ধনাত্মক বিদ্যুৎধর্মী। উভয়ের বিদ্যুৎ-আধান চরিত্রে বিপরীতধর্মী হলেও, পরিমাণে কিন্তু সমান। নিউট্রন আধানশূন্য কণিকা। পদার্থ বিজ্ঞানীরা ধরে নিলেন, কোন পদার্থের পরমাণুতে যতগুলি ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন থাকে, তার ওপরই নির্ভর করে সেই পদার্থ সোনা না ইউরেনিয়াম, অথবা অন্য কিছু। অর্থাৎ এক কথায়, তখন মনে হয়েছিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থের মৌল উপাদান তিন রকমের মৌল কণিকা। ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন।

কিন্তু পরবর্তীকালে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ত্বরক যন্ত্র বা অ্যাকসেলারেটার আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে এ ধরনের ধারণারও মূলে পড়ল কুঠারাঘাত। ওই সব যন্ত্রের সাহায্যে প্রোটন কণা অথবা বিভিন্ন পদার্থের নিউক্লিয়াসকে বুলেট হিসেবে ব্যবহার করে একে একে বিভিন্ন পদার্থের নিউক্লিয়াসে প্রচণ্ড আঘাত করার পর দেখা গেল যাদের এতদিন মৌলিক কণা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল, সেই প্রোটন এবং নিউট্রন এরা মোটেই মৌলিক কণা নয়। প্রচণ্ড আঘাতের ফলে এরাও বিভাজিত হয়। বিভাজিত হয়ে উৎপন্ন করে অথবা বলা উচিত বিভাজিত হয়ে সৃষ্টি করে আরও নানা রকমের কণিকা। তাদের কেউ খুবই স্বল্পায়ু। এক সেকেণ্ডের কোটি কোটি ভাগের একভাগ সময়ের মত জীবনকাল। কেউ কেউ দীর্ঘায়ু। জীবনকাল ফুরিয়ে গেলে ভিন্নতর কণিকায় তাদের কেউ কেউ পরিবর্তিত হয়। কেউ কেউ ভিন্ন ভিন্ন কণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তৈরি করে ভিন্নতর কণা।

অর্থাৎ সেই একই প্রশ্ন থেকে গেল তখনও। এমন কি কোন মৌলিক কণা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, চরিত্রে যারা এরকম অদ্বিতীয়ম ?

গত ২৫ বছর এ নিয়ে যথেষ্ট তাত্ত্বিক এবং পরীক্ষামূলক গবেষণা হয়েছে। সেই সব গবেষণার ওপর ভিত্তি করে এখন বলা হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু মুখ্যত তিন শ্রেণীর কণা দিয়ে তৈরি। লেপটসন, হ্যাড্রনস এবং মাঝারি কণা বা

ইনটারমিডিয়েট পারটিকেলস্। শেষোক্ত এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে ফোটনস বা সাধারণ আলোর কণিকা।

লেপটনস বলতে যে সব মৌল কণাদের বলা হয়, তাদের সংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে মোট চারটি। ইলেকট্রন, ইলেকট্রন-নিউট্রিনো, মিউওন এবং মিউওন-নিউট্রিনো। এই সঙ্গে এদের প্রতি মৌল কণাদেরও অবশ্য ধরা হয়ে থাকে। যেমন, ইলেকট্রনের প্রতি মৌলকণা পজিট্রন। যার ভর ইলেকট্রনের ভরের সমান, শুধু বিদ্যুৎ-আধান ইলেকট্রনের বিপরীত ধর্মী। অর্থাৎ ধনাত্মক। বিজ্ঞানীরা এ সব বস্তুকণাদের এখন বলছেন আদর্শ মৌল-কণা। হ্যাড্রনদের তুলনায় এরা অত্যন্ত হাল্কা।

কিন্তু গোলমাল ওই হ্যাড্রনদের নিয়ে। এদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। বেরিওনস, অ্যান্টি-বেরিওনস এবং মেসনস। বেরিওনদের মধ্যে পড়ে প্রোটন এবং নিউট্রন। মেসনদের মধ্যে পড়ে পাইওনস প্রভৃতি। গত দশকে বলা হয়েছে, এই সব মৌল-কণা কেউই মৌল নয়। বরং একাধিক ভারী মৌলকণা দিয়ে এরা তৈরি। এই ভারী মৌল-কণাদের বলা হচ্ছে কোয়ার্ক। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বিশ্বের তাবৎ বস্তুর সৃষ্টির মূলে রয়েছে কোয়ার্ক এবং লেপটনস।

প্রশ্ন এই, কয় প্রকারের কোয়ার্ক থাকা সম্ভব?

১৯৬৪ পর্যন্ত অনেকে মনে করতেন মোট তিন রকমের কোয়ার্ক থাকা সম্ভব। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এখন বলা হচ্ছে, আরও একটি কোয়ার্ক থাকা সম্ভব। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'চার্ম' পারটিকেল। বলা বাহুল্য, টিং এবং রিখটারের আবিষ্কৃত 'সাই' কণা এই শেষোক্ত মতবাদকে বলিষ্ঠভাবে সমর্থন করেছে।

না। এ সাফল্য একদিনে আসেনি। রিখটার এ ব্যাপারে গবেষণা শুরু করেন ১৯৬১ সালে। সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতির যন্ত্রপাতি তৈরি করতেই তাঁর সময় লেগেছিলো বারো বছর। তারপর ত্বরক যন্ত্রের সাহায্যে ইলেকট্রন এবং পজিট্রনের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটান। সংঘর্ষ শক্তির পরিমাণ ৩.৬ গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট। (১ গিগা=১ বিলিয়ন)। সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট হয় সাই কণা। টিং-ও কাজ করছিলেন গত আট বছর ধরে। প্রথমে পশ্চিম জার্মানিতে (DESY)। পরে ব্রুকহেভেন গবেষণাগারে। তিনি 'সাই' কণা তৈরি করেন প্রোটনের সঙ্গে প্রোটনের সংঘর্ষ ঘটিয়ে। সংঘর্ষশক্তির পরিমাণ ৩.৭ গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট। উভয় ক্ষেত্রেই যে কণা তৈরি হয়, অর্থাৎ যাদের তাঁরা 'সাই' বা 'জে' কণা হিসেবে ব্যক্ত করেছেন, তারা যে হ্যাড্রন তা প্রমাণিত হয়েছে।

বলা হয়েছে, দুটি চার্ম কোয়ার্ক দিয়ে তৈরি এক একটি 'সাই' কণা। ওই দুটি চার্ম কোয়ার্কের একটি প্রতি-মৌলকণা বা অ্যান্টিপারটিকেল। সাধারণ ক্ষেত্রে কণা এবং প্রতি-কণা মিলিত হলে বিস্ফোরণের মাধ্যমে শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার কথা। এক্ষেত্রে তা হয়নি। কারণ Zweig-এর সূত্র অনুযায়ী চার্ম এবং অ্যান্টিচার্ম পাশাপাশি থেকেও শক্তিতে রূপান্তরিত হয় না। এবং যেহেতু 'সাই' কণার ক্ষেত্রে তা হয়নি বরং জীবনকালের শেষে সে 'সাই' হ্যাড্রনে রূপান্তরিত হয়েছে, এ থেকে কোয়ার্ক চার্ম মতবাদেরই সত্যতা প্রমাণিত হয়।

এত সব জানার পরও সতর্ক তার সঙ্গে নিজেদের পরীক্ষাটিকে যথেষ্ট খুঁটিয়ে দেখেন টিং এবং রিখটার। নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্যে গোপনে দুজনে মিলিত হয়ে কথাবার্তাও চালান। পরে যুগপৎ তাঁরা তাঁদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেন ১১ নভেম্বর, ১৯৭৪-এ। তারপর যথেষ্ট বিতর্কেরও ঝড় বয়ে যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণাগার তাঁদের ফলাফল যাচাই করে। এবং নিঃসন্দেহ হয়। আমেরিকান ফিজিকাল সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি ডাঃ ভোল ফগ্যাং প্যানোফস্কির মতে, 'সাই' কণার আবিষ্কারক চার্মকোয়ার্ক তত্ত্বকেই সমর্থন করে বেশি।

অর্থাৎ প্রথমে ছিল পরমাণু। অতঃপর যাবতীয় মৌলিক পদার্থের মূল উপাদান দাঁড়াল প্রোটন, ইলেকট্রন এবং নিউট্রন। তারপর এক বিরাট ধোঁয়াশা। একে একে আবিষ্কৃত হল নানান মৌল কণা। এখন আবার মনে হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু তৈরি হয়েছে মাত্র চার রকম কোয়ার্ক দিয়ে। 'সাই'এর আবিষ্কার এইভাবে বস্তুর মৌল গঠন-রহস্য উদ্ঘাটনে কি সাহায্য করবে ?

অধ্যাপক রিখটারের জন্ম ১৯৩১ সালে। নিউ ইয়র্কে। ১৮৫৬ সালে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অভ্ টেকনলজি থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ। এর পর তিনি স্ট্যানফোর্ডে গিয়ে ত্বরক যন্ত্র তৈরির কাজে মনোনিবেশ করেন এবং গবেষণা চালান যা শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করল।

অধ্যাপক টিং-এর বয়েস এখন ৪১। বাবা মা চীনের অধিবাসী ছিলেন। জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। জীবনে প্রথম শিক্ষা শুরু হয়েছিল যখন তাঁর বয়েস ১২ বছর তখন। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ ডি। এক সময়ে কালিফোর্নিয়ার বার্কলে এবং কলাম্বিয়ায় অধ্যাপনা করেন। বর্তমানে বছরে অর্ধেক সময় থাকেন ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অভ্ টেকনলজিতে, বাকি অর্ধেক সময় তাঁর কাটে জেনিভায়, ইউরোপিয়ান নিউক্লিয়ার রিসার্চ সেন্টারে।

রসায়ন

রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেলেন একজন। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ডঃ উইলিয়াম এন লিপসকমব। বোরোন এবং হাইড্রোজেন সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক যৌগ 'বোরেনস'-এর ওপর দীর্ঘ এবং জটিল গবেষণায় এক নতুন দিগন্ত উন্মীলিত করার স্বীকৃতি তাঁর এই নোবেল পুরস্কার। এ প্রসঙ্গে সুইডিস রয়্যাল অ্যাকাডেমি অভ্ সায়েন্সেসের মন্তব্য ঃ শুধু 'বোরেনস'ই নয়, ডঃ লিপসকম-এর আরও বড় অবদান, বিভিন্ন রকম এনজাইমের গঠন এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কলাকৌশল আবিষ্কার করে তিনি অনেক মৌলিক প্রশ্নের উত্তর যুগিয়েছেন।

বোরেনস। বরং বলি বোরোন হাইড্রাইডস।

১৯৫০ সালে মহাকাশ গবেষণায় জোয়ার আসার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীরা নানা রকম জ্বালানি উদ্ভাবনের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে লাগলেন। নতুন নতুন রকেট তৈরি হচ্ছে। তাদের জন্যে চাই প্রচণ্ড বিস্ফোরণক্ষম জ্বালানি। বোরনের নানা রকম হাইড্রাইড নিয়ে শুরু হল তুমুল গবেষণার কাজ। বিজ্ঞানীরা দেখলেন প্রতি গ্রাম ইথেন যেখানে দেয় ৪০ কিলো জুল-এর মত উত্তাপ শক্তি, সেখানে এক গ্রাম ডাইবোরেন (B_2H_6) বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উৎপন্ন করে ৫৫ থেকে ৭০ কিলো-জুলের মত উত্তাপ। ক্রমে উচ্চতর আণবিক ওজনের বোরন হাইড্রেড তৈরি হতে লাগল একের পর এক। এ সব গবেষণার জন্যে প্রচুর টাকা-পয়সাও খরচ হতে লাগল দিনের পর দিন। সেই সঙ্গে তৈরি হল বোরোনঘটিত নানা রকম রাসায়নিক যৌগ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল খাটুনিই সার। রকেটের জ্বালানি হিসেবে বোরোনের ব্যবহারে বাধা অনেক।

ব্যাপার স্যাপার দেখে প্রথম দিকে খানিকটা যেন মুষড়ে পড়েছিলেন ডাঃ উইলিয়াম এন লিপসকমব। কারণ বোরোনই তো ছিল তাঁর জীবনের স্বপ্ন।

কিন্তু কোন কিছুই বৃথা যায় না শেষ পর্যন্ত হয় ত। দেখা হল নোবেল বিজ্ঞানী লাইনুস পাউলিং-এর সঙ্গে। তাঁরই উৎসাহে শুরু করলেন আর এক ধারায় কাজ। অবশ্যই বোরোনদের সম্বল করে। তৈরি করলেন বোরোনঘটিত নতুন ধরনের রাসায়নিক যৌগ। মানসিক রোগ এবং মস্তিষ্কের টিউমার চিকিৎসায় যে সব যৌগ এখন যথেষ্ট সক্রিয় বলে বিবেচিত। লিপসকমব মনে করেন অন্যান্য ধরনের ক্যানসার নিরাময়ের ব্যাপারেও এ ধরনের যৌগ ভবিষ্যতে হয়ত কাজে লাগান যাবে।

জন্ম ৯ ডিসেম্বর ১৯১৯। কেনটাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং ক্যালিফোর্নিয়ার ইনসটিটিউট অভ্ টেকনলজির পি. এইচ. ডি. লিপসকমব জীবনের দীর্ঘ কুড়ি বছর শুধু বেরোনের ওপর গবেষণা করেই কাটিয়েছেন। বিশেষ ধরনের এক্স-রে ডিফ্র্যাকশন পদ্ধতি আবিষ্কার করে তিনিই প্রথম বিভিন্ন রকম বোরোনের গঠনের বৈশিষ্ট্য-স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন। এবং সেই অভিজ্ঞতা থেকে গবেষণাগারে বোরোনের কেলাস তৈরি করতে সমর্থ হন। তাঁর নোবেল পুরস্কার এই সাফল্যেরই ফলশ্রুতি।

শারীর এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান

শারীর-বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারের যুগ্ম শরিক হলেন এবার দুজন। পেনসিলভেনিয়া মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক বারুচ এস ব্লুমবার্গ এবং বেথেসডার (মেরিল্যান্ড) ন্যাশানাল ইনসটিটিউট ফর নিউরোলজিক্যাল ডিজিজেস-এর অধ্যাপক কারলটন গাজডিউসেক। কয়েকটি বিশেষ ধরনের সংক্রামক রোগের সূত্র এবং তাদের শারীরবৃত্তীয় কার্যকারণ সম্পর্কে মৌলিক তথ্য আবিষ্কারের কৃতিত্বকে স্মরণ করেই নোবেল পুরস্কারের প্রাপক হিসেবে অ্যাকাডেমি তাঁদের কথা বিবেচনা করছে।

ব্লুমবার্গ এবং গাজ্‌ডিউসেক প্রসঙ্গে সুইডিশ অ্যাকাডেমির এটাই ছিল মন্তব্য। উল্লেখ করা যেতে পারে, দক্ষিণ প্রশান্তসাগরীয় অঞ্চলের আদিবাসীদের রক্ত এবং শারীরবৃত্তীয় ঘটনাবলী নিয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়েই ব্লুমবার্গ এবং গাজ্‌ডিউসেক তাঁদের গবেষণার মূল সূত্রগুলি আবিষ্কার করেছিলেন। সেই আবিষ্কারের পথ ধরেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সম্মান নোবেল পুরস্কারে তাঁদের উত্তরণ।

বারুচ এস ব্লুমবার্গ তখন একাধারে চিকিৎসক অন্যদিকে নৃবিজ্ঞানী। অঞ্চল বিশেষে কয়েকটি বিশেষ ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাবের পেছনে সামাজিক এবং বংশগত কারণ কতটা সক্রিয় সে ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কখনও সুরিনামে, কখনও নাইজেরিয়া, সিঙ্গাপুর, ভারত, কুমেরু অঞ্চল এবং মার্শাল দ্বীপপুঞ্জে। যেখানেই যান সেখানকার মানুষের দেহ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে পরীক্ষা করেন। এইভাবে চলতে চলতে অস্ট্রেলিয়ার এক শ্রেণীর আদিবাসীর রক্তের সিরামে দেখতে পেলেন সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের অ্যান্টিজেন। অ্যান্টিজেন-এর কাজ শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি করে রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করা।

ব্লুমবার্গ দেখলেন যে অ্যান্টিজেনটি তিনি আবিষ্কার করেছেন সেটা এক ধরনের ভাইরাসের অংশ। যা বংশগতভাবে বা কারোর শরীরে রক্ত দেবার সময় সেই রক্তের ভেতর দিয়ে অপরের শরীরে সংবাহিত হতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে এক ধরনের বিপজ্জনক হেপাটাইটিস বা যকৃতের রোগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, এটাই তার প্রধানতম কারণ। অ্যান্টিজেনটির নাম রাখলেন তিনি 'অস্ট্রেলিয়ান অ্যান্টিজেন'।

পরে এই রোগের তিনি ভ্যাকসিন তৈরি করেন। সেই সঙ্গে রক্ত পরীক্ষার এক বিশেষ পদ্ধতি। যাতে করে একজনের শরীর থেকে আর একজনের শরীরে রক্ত দেবার সময় ওই ধরনের অ্যান্টিজেন না সংবাহিত হয়। এর ফলে অস্ট্রেলিয়ার বহু আদিবাসী অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে এখন রক্ষা পাচ্ছে। ব্লুমবার্গ মনে করেন তাঁর ভ্যাকসিন আফ্রিকা, দক্ষিণ চীন, তাইওয়ান, ফিলিপিনস এবং ম্যালেসিয়ায় যকৃতের ক্যানসার নিরাময়ে যথেষ্ট সাহায্য করবে। এ বছর নোবেল পুরস্কারের জন্যে তাঁর নির্বাচনের এটাই কারণ।

জন্ম নিউইয়র্কে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জীব রসায়নে পি এইচ ডি। বর্তমানে পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-নৃবিজ্ঞানের অধ্যাপক।

যে সাফল্যের জন্যে ডঃ গাজ্‌ডিউসেক নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হলেন তার সূত্রপাত নিউগিনিতে। এক সময় নিউগিনির আদিবাসীদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় নরভোজী ছিল। মৃত আত্মীয় স্বজনদের মস্তিষ্ক এবং নাড়িভুঁড়ি খাওয়া ছিল তাদের ধর্মীয় আচরণের অন্যতম অঙ্গ। এর ফলে এদের মধ্যে এক ধরনের মানসিক রোগের প্রকোপ দেখা দিত ভীষণ ভাবে। রোগটির নাম 'কুরু'। এই রোগে স্নায়বিক দৌর্বল্য ঘটে। মস্তিষ্ক অপুষ্ট হয়। আক্রান্ত মানুষের পঙ্গু হয়ে ধিকি ধিকি মৃত্যুর জন্যে সময় গোনা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। জীবনযাত্রা

পালটে যাওয়ায় এ অভ্যেস তারা ত্যাগ করায় রোগটির প্রাদুর্ভাব এখন কমের দিকে। দেখা গেছে এক ধরনের 'স্লো-ভাইরাস'ই এই রোগের কারণ। উল্লেখ্য সাধারণ ভাইরাস শরীরে ঢুকলে ১০ থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই যেমন রোগের উপসর্গ প্রকাশ পেতে শুরু করে, অথবা দেহের নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতার বলে তারা মরে যায়, স্লো-ভাইরাসের ক্ষেত্রে তেমন ঘটে না। এরা দীর্ঘকাল শরীরে বাসা বেঁধে থাকে, বংশ বৃদ্ধি করে এবং দীর্ঘ সময় কুরে কুরে শরীর নিঃশেষ করে দেয়।

ডঃ গাজডিউসেক নিউগিনির আদিবাসীদের মধ্যে থেকে এই ভাইরাসটিকে সনাক্ত করেন। অনেকের বিশ্বাস পারকিনসন নামে এক ধরনের রোগ যার প্রভাবে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাঁপে এবং ভেড়াদের মধ্যে যে 'স্ক্র্যাপি' বা চুলকানি রোগ দেখা যায় তারও মূলে কাজ করে এই ভাইরাস। মুশকিল এই, এই ভাইরাস আয়তনে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। উচ্চতর তাপমাত্রা, অতিবেগুনীরশ্মি এবং কড়া রাসায়নিক বস্তুর সংস্পর্শও এদের হত্যা করতে পারে না। ডঃ গাজডিউসেকের আবিষ্কার স্লো-ভাইরাস ঘটিত রোগ প্রতিরোধের ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

ডঃ গাজডিউসেকেরও জন্ম, নিউইয়র্কে। বাবা মা হাঙ্গেরীর অধিবাসী। রোচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় এবং হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুল থেকে ডিগ্রি লাভ। ১৯৫৮ সালে তিনি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অভ হেলথ-এ যোগ দেন।



নোবেল পুরস্কার ১৯৭৭

পদার্থ বিজ্ঞান

লেজার থেকে টেপ রেকর্ডার, অথবা নানা রকম বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, যেমন
যন্ত্রগণক, টেলিভিশন, রেডিও প্রভৃতি—এক কথায় বলা হয়, এরা 'সলিডস্টেট ফিজিকস'-
এর অবদান। তৈরি হয়েছে নানা রকম ট্র্যানজিসটার এবং প্রিনটেড সারকিট। এগুলি
তৈরি হয়েছে সলিড-স্টেট ফিজিকস-এরই এক এক তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে। পদার্থ
বিজ্ঞানে এ বছর যাঁরা নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁদের অবদান পদার্থবিজ্ঞানের এই
বিশেষ ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করেই বেড়ে উঠেছে।

তিনজন। এঁদের মধ্যে প্রবীণতম জন ফ্যান-ভ্লেক। বয়স ৭৮। এর আগে
নোবেল পুরস্কারের জন্যে বেশ কয়েকবার তাঁর নাম প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু কোন
বারই সফল হন নি। অবশেষে সাফল্য এল—এ বছর।

'কেমন লাগছে ?' প্রশ্ন করা হয়েছিল তাঁকে।

'এত পরিণত বয়েসে আমার কাছে এটা একটা বড় রকমের বিস্ময়।' ভ্লেকের
নির্লিপ্ত উত্তর।

বর্তমানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত এবং প্রাকৃত-দর্শনের এমারিটাস অধ্যাপক
ফ্যান ভ্লেক। অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির ছোটখাটো মানুষ। ১৯২০র দশকে কোয়াণ্টামবাদ
আবিষ্কৃত হওয়ার পর মুষ্টিমেয় যে ক'জন মার্কিন পদার্থবিজ্ঞানী তার তত্ত্ব নিয়ে
গবেষণা শুরু করেন, ভ্লেক তাঁদের অন্যতম। চুম্বকের বিভিন্ন ধর্ম ব্যাখ্যা করতে
গিয়ে তিনি কোয়াণ্টামবাদকে কাজে লাগিয়েছেন। তিনিই আবিষ্কার করেন, সুসংহত
জ্যামিতিক আকৃতির কেলাসে পরমাণু এবং আহিত কণা বা আয়নদের প্রোথিত করা
যায়। আর এইভাবে তাদের মধ্যেকার বিদ্যুৎ প্রবাহকে শ্লথ অথবা দ্রুতগতি করে
তোলা সম্ভব। তাঁর এই অবদানের জন্যে নতুন উপাধি পেলেন তিনি : 'আধুনিক
চৌম্বকের জনক।' পরবর্তীকালে তাঁর তত্ত্বকে অবলম্বন করে বিভিন্ন বিজ্ঞানী নানা

রকম সেমি-কনডাকটার, কেলাস, ট্রানজিসটারের বিভিন্ন অংশ, সৌর-কোষ এবং যন্ত্রগণকের মগজ প্রভৃতি তৈরি করতে সমর্থ হন।

ফ্যান ভ্লেকের আরও একটি বড় রকমের সাফল্য ছাত্র ফিলিপ অ্যানডারসন। হার্ভার্ডেই ফিলিপের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। সেখানেই একই পথে উভয়ের যাত্রা। অবশেষে নিজের অধ্যাপকের সঙ্গে নিজেও নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত।

১৯৫৮ সালে নিউ জার্সির মুরে হিলে বেল ল্যাবরেটারিতে গবেষণা করার সময় প্রথম সূত্রপাত। ওই বছর একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করে তিনি প্রস্তাব করলেন অ্যামরফাস বা অনমনীয় বস্তুও, যেমন, কাঁচ প্রভৃতি, সেমি-কনডাকটার হিসাবে কাজ করতে পারে। উল্লেখ্য, এ ধরনের বস্তুতে যে সব অণু থাকে তাদের সজ্জা কোন নিয়ম মেনে চলে না।

অ্যানডারসন বলেছেন, 'আমার এই ধারণা অনেকে উড়িয়ে দিলেন। রসিকতাও করলেন কেউ কেউ। ব্যতিক্রম শুধু একজন।'

এই 'একজন' আর কেউ নন, স্বয়ং স্যার নেভিল মট। ১৯৬১ সালে ইংলন্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে স্যার নেভিলের সঙ্গে দেখা করলেন অ্যানডারসন। অত্যন্ত খুশী হলেন তিনি। এর পর ১৯৬৭ সালে আবার তিনি স্যার নেভিলের সঙ্গে মিলিত হন এবং এক নাগাড়ে আট বছর গবেষণা করেন। এই সময় সিলিকন নিয়ে তাঁরা কাজ করেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি বুঝতে পারলেন, কাচের মত কেলাস অ্যামরফাস বস্তু থেকে সেমিকনডাকটার হিসেবে অনেক বেশি কার্যকর। কিন্তু বুঝলে কি হবে, প্রতিপক্ষ, অর্থাৎ অ্যামরফাস বা অ-কেলাস নিয়ে যাঁরা কাজ করছিলেন তাঁদের কাছে পাত্তা পেলেন না তিনি। ভগ্নমনোরথ হয়ে তিনি এ পথে গবেষণাই ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু অবশেষে অ্যানডারসন সফল হলেন। সফল হলেন তাঁর গুরু স্যার নেভিলও। কেলাস-সেমিকনডাকটার এখন অ-কেলাস কনডাকটারের চেয়ে বেশি কার্যকর হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। স্যার নেভিল মনে করেন, এই আবিষ্কারের ফলে অদূর ভবিষ্যতে খুব কম খরচে সিলিকন সৌর-কোষ তৈরি করা সম্ভব হবে।

প্রবীণ স্যার নেভিলও। জন্ম, ১৯০৫। বাবা পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষা ক্লিফটন কলেজের স্কুলে এবং সেন্ট জন'স কলেজে। গণিতে বৃত্তি পান। পরে তিন বছরের পরিবর্তে দু বছর খেটেই গণিতে ট্রাইপস পান। অতঃপর পদার্থবিজ্ঞানে চর্চা খোদ লর্ড রাদারফোর্ডের কাছে। ওই সময় কোয়ান্টামবাদের সাহায্যে রাদারফোর্ডের 'আলফা কণার বিচ্ছুরণ সূত্র' বা 'ফরমুলা ফর দ্য স্ক্যাটারিং অব আলফা পারটিকল্‌স'টি সমর্থনযোগ্য বলে প্রমাণিত করেন। তবে সেই সঙ্গে এ কথাও বলেন, আলফা কণা যে পারমাণবিক নিউক্লিয়াসে আঘাত করে সেটিও যদি আলফা কণা হয়, তা হলে ওই সূত্রের কিছু সংশোধন দরকার। পরবর্তীকালে তিনি ডেনমার্কে গিয়ে নীলস বর-এর সঙ্গেও গবেষণা করেছিলেন। দীর্ঘ সতেরো বছর কেমব্রিজে পদার্থবিজ্ঞানে ক্যাভেনডিস অধ্যাপকের পদেও বৃত ছিলেন তিনি। সেই সঙ্গে ক্যাভেনডিস

গবেষণাগারের প্রধান। এখানেই তিনি তৈরি করেন তাঁর বিখ্যাত 'সলিড-স্টেট
ফিজিকস'-এর গবেষণাকেন্দ্র। এখানে বসেই 'ধাতুর ইলেকট্রন চরিত্র', 'অতিপরিবাহিতা
এবং 'ধাতুর যান্ত্রিক ক্ষমতা' প্রভৃতির উপর উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন তিনি।
বিশিষ্ট বিজ্ঞানীই শুধু নন, দক্ষ প্রশাসক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি সর্বত্র। ১৯৬২ সালে
তাঁকে নাইট উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। 'সলিড-স্টেট ফিজিকস'-এ বিস্তৃত এবং
বহুমুখী সমস্যার ব্যাখ্যা এবং সমাধানের জন্যে প্রবীণ এই বিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কার
দিয়ে সম্মানিত করা হল।

রসায়ন

কথাটা শুনেছিলাম প্রায় নয় বছর আগে। বর্তমান লেখক তখন টেকসাস
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বলিষ্ঠ চেহারা। অত্যন্ত চটপটে। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের
বাড়িতে এসে এলিভেটারের তোয়াক্কা না করে সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতেন এক-এক
তলা। নিজের মনেই।

ছাত্র এবং গবেষক মহলে প্রচুর নাম। স্ট্যাটিসটিক্যাল মেকানিকস এবং
তাপগতিবিদ্যা বিভাগের প্রধান। বছরে ছ'মাস থাকেন টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ে।
ছ'মাস ব্রুসেলসের ফ্রি ইউনিভার্সিটিতে। গবেষকদের মুখে প্রায় শোনা যেত,
অসাধারণ পণ্ডিত। অল্পদিনের মধ্যে ইনি নোবেল পুরস্কার পাবেন।

হ্যাঁ, পেলেন। সত্যিই তিনি শেষ পর্যন্ত নোবেল পুরস্কার পেলেন। কারোর
সঙ্গে যুগ্মভাবে নয়। একক। ১৯৭৭-এর নোবেল পুরস্কার। রসায়নে।

ইলিয়া প্রিগোগিন কিন্তু অদ্ভুত মানুষ। পুরস্কার পেলেন রসায়নে। কম
করেও গত দুই শতক সত্যিকারের রসায়ন বলতে যা বোঝায় তার ধারে কাছেও
যান না তিনি।

জন্ম সোভিয়েত দেশে। প্রায় কুড়ি বছর আগে তিনি কয়েকটি গাণিতিক মডেল
তৈরী করেন। যার তিনি নাম দেন 'ডিসিপেটিভ স্টাকচারস'। কতকগুলি
পরিস্থিতির কথা চিন্তা করেই এই মডেলগুলি তৈরি করেন। তিনি ওই সব মডেলের
সাহায্যে প্রমাণ করেন, ওই সব পরিস্থিতির মধ্যে বস্তু তার উত্তাপ যেমন ছেড়ে দিতে
পারে, সেই সঙ্গে পরস্পর মিলিত হয়ে তৈরি করতে পারে বৃহত্তর এবং জটিল
বস্তুসামগ্রী। বিভিন্ন রাসায়নিক অণু মিলিত হয়ে এইভাবেই হয়তো তৈরি করেছে
পৃথিবীর জীবজগৎ, যাবতীয় প্রাণী এবং উদ্ভিদ। তাঁর এই মডেলগুলি থার্মোডায়নামিকস বা তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের পরিপন্থী। কারণ, এই সূত্রে যা বলা হয়েছে,
তার সরল অর্থ করলে দাঁড়ায়, সুসংহত কোন বস্তু (অথবা সিসটেম) থেকে যখন শক্তির
ক্ষরণ হয় তখন তার মধ্যে আর কোন সংহতি থাকে না, শুরু হয় বিশৃংখলা। প্রিগো-

গিনের অভিমত, আদিতে জীবন যখন সৃষ্ট হয় নি, বিভিন্ন রাসায়নিক যোগ যখন নিতান্ত বিশৃংখল অবস্থায় বিচরণ করছিল—প্রকৃতির বিচিত্র নিয়মে তাদের বিশেষ বিশেষ অণু পরস্পর মিলিত হয়ে কিভাবে তখন জীবন সৃষ্টি করল জীববিজ্ঞানীরা হয়তো একদিন ওই মডেলগুলির সাহায্যে তার উত্তর যোগাতে সমর্থ হবেন। প্রিগোগিনের কিছু রাসায়নিক বন্ধু মনে করেন, তাঁর এই তত্ত্ব ভবিষ্যতে নগর পরিকল্পনার ব্যাপারেও হয়তো সাহায্য করবে। বড় বড় শহর, তার বিস্তর সুড়ঙ্গ পথ, সেতু এবং জনপথ, তার মাধ্যমেই তো শহরে আনাগোনা করবে শক্তি এবং সামগ্রী। শহর বাড়বে। সেই আনাগোনায় আসবে ব্যস্ততা। অবশেষে শহর এক নতুন পরিস্থিতির মধ্যে গিয়ে পড়বে। ওই অবস্থায় তার জীবনযাত্রা, জীবন-সমস্যা প্রভৃতি কোন অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে তাঁর তত্ত্ব থেকে সে সবেরও হয়তো আমরা আভাস পাব। প্রিগোগিনের ধারণা, 'তাঁর কাজ যে ভৌত এবং মানব বিজ্ঞানের মধ্যে সেতুবন্ধনেরই প্রয়াস', নোবেল কমিটি সম্ভবত এ কথাটি বুঝতে পেরেছেন।

শারীর এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান

প্রসঙ্গ ইনস্যুলিন। ইনস্যুলিন এক ধরনের হরমোন বা অন্তঃস্রাবী রস। মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহে এই হরমোনটি নিঃসৃত হয়ে থাকে। নিঃসৃত হয় প্যানক্রিয়াস বা অগ্ন্যাশয়ের এক ধরনের কোষকলা আইলেটস অব ল্যাংগারহ্যানস থেকে। শরীরে চিনির বিপাকীয় কাজকর্ম স্বাভাবিক রাখার দায়িত্ব ইনস্যুলিনের। কোনো কারণে এই হরমোনটির নিঃসরণ যদি ব্যাহত হয়, অথবা যতটা দরকার ততটা না নিঃসৃত হয়, তখনই ঘটে ডায়াবিটিজ বা বহুমূত্র রোগ। অনেকের মতে এ রোগ বংশগত। ইনস্যুলিন ইনজেকশনই এ রোগের একমাত্র নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা পদ্ধতি।

এ তথ্য এখন অনেকেই জানেন। তবু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যাঁরা, তাঁরা লক্ষ্য করেছেন, কখনও কখনও ব্যতিক্রমও ঘটে। ডায়াবিটিজ রোগী ইনস্যুলিন নিলেন কিন্তু রোগের উপসর্গ যেন থেকেই গেল।

কেন এমন হয় ?

এই প্রশ্নের উত্তর যুগিয়েছেন রোজেলিন ইয়েলো। প্রাণীদেহে ইনস্যুলিনের বিপাকীয় কাজকর্ম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অদ্ভুত একটি ঘটনা তাঁর চোখে পড়ল। তিনি লক্ষ্য করলেন, ইনস্যুলিন নেবার পর অনেক ডায়াবিটিজ রোগীর দেহে এক ধরনের অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে থাকে। যার কাজ ওই হরমোনটির কার্যকারিতাকে ব্যাহত করা। শুধু লক্ষ্য করেই থামলেন না তিনি। শুরু হল পর্যায়ক্রমিক সমীক্ষা। রোজেলিন তখন ব্রনকস-এ (নিউইয়র্ক) ভেটারেনস অ্যাডমিনিসট্রেশন হসপিটালে শিরোনাম। এখানকার গবেষণাগারে কিছু সংখ্যক সহকারী নিয়ে তিনি তৈরি করলেন

নতুন একটি পদ্ধতি। ওই পদ্ধতির সাহায্যেই ইনস্যুলিন গ্রাহকদের শরীরে যে অ্যাণ্টিবডি তৈরি হয়, শুরু হল তার পরিমাপ।

'রোজেলিনের জীবন খুবই বিচিত্র', বলেছেন জনৈক পদার্থবিজ্ঞানী।

তাঁর বাল্যকাল কেটেছে দক্ষিণ ব্রনকস-এ। এই শহরেরই হানটার কলেজ থেকে তিনি পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক হন। কিছুদিন তাঁকে সেক্রেটারি হিসেবেও কাজ করতে হয়েছিল। অবশেষে পরমাণু বিজ্ঞানী হিসেবে জীবনের সূচনা। ওই সময় তাঁর পরিচয় ঘটে পরলোকগত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ সোলোমোন বারসনের সঙ্গে। রোজেলিন এবং বারসন মিলিতভাবে তৈরি করলেন এক ধরনের পদ্ধতি। যার নাম রেডিও-ইমিউনোঅ্যাসে বা RIA। রোগ প্রতিরোধ সমস্যার সঙ্গে নানা রকম হরমোন, এনজাইম এবং বিভিন্ন সামগ্রী জড়িত। রক্ত, প্রস্রাব প্রভৃতির সঙ্গে এরা মিশে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে এদের মাত্রা এত কম হয় যে, প্রচলিত পদ্ধতির সাহায্যে রক্ত বা প্রস্রাবে এদের উপস্থিতি জানা বা পরিমাপ করা প্রায় দুঃসাধ্যই হয়ে পড়ে। রোজেলিন দেখালেন, তাঁদের ওই পদ্ধতি RIA রক্তে ইনস্যুলিন মাপার ব্যাপারে অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে প্রায় হাজার গুণ বেশি কার্যকর।

এই RIA পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে রোজেলিন এবং বারসন প্রমাণ করলেন, শিশু বালকবালিকাদের মধ্যে যারা ডায়াবিটিজ রোগে আক্রান্ত হয় তাদের শরীরে ইনস্যুলিনের অভাব থাকে ঠিকই, তুলনায় বড়দের ব্যাপারটা ভিন্নতর। বয়স্কদের মধ্যে যারা এই রোগে ভোগেন, তাঁদের শরীরে ইনস্যুলিনের অভাব কিন্তু সব সময় থাকে না। সমস্যা এই, ইনস্যুলিনের কার্যকারিতা প্রতিরোধ করার জন্যে তাঁদের শরীরে তৈরি হয় এক ধরনের অ্যান্টিবডি—এই অ্যান্টিবডিই ওই রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের বাধা হিসেবে কাজ করে। উল্লেখ্য, ইদানীং RIA পদ্ধতির সাহায্যে ব্লাডব্যাঙ্কে যাঁরা রক্ত দেন, তাঁদের রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থাও করেছেন পৃথিবীর কোন কোন হাসপাতালের বিশেষজ্ঞরা। অনেক সময় ওই রক্তের মধ্যে থাকে হেপাটাইটিস প্রভৃতি রোগের ভাইরাস। চিকিৎসার প্রয়োজনে একের রক্ত অপরের শরীরে দেবার সময় ওই সব বিপজ্জনক ভাইরাস থাকছে কি না, তার জন্যেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ। সম্প্রতি ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রও এই ধরনের পদ্ধতি তৈরি করেছে। এই পদ্ধতির সাহায্যে সন্তানসম্ভবা মায়ের সন্তান পেটে থাকার সময় কি অবস্থায় আছে তা জানা যায়, জানা যায় ওই সন্তান অস্বাভাবিক হতে পারে কি না, এমন নানা রকম তথ্য। এই সব তথ্য আগাম জেনে নিয়ে প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে।

নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করতে গিয়ে রোজেলিন সম্পর্কে নোবেল কমিটির মন্তব্য : 'তার গবেষণা জীববিজ্ঞান এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় একটা বড় রকমের উত্তরণ।' পুরস্কারের অর্ধেক সম্মানমূল্য পাবেন তিনি। বাকী অর্ধেক পাবেন গিলেমিন এবং স্যালি।

ডঃ রোজার গিলেমিনের কর্মস্থল ক্যালিফোর্নিয়ার লা জোলায় অবস্থিত সলক ইনসটিটিউট এবং অ্যানড্রু ভি স্যালির কর্মস্থল নিউ অরলিনসের ভেটারেনস

অ্যাডমিনিসট্রেশন হসপিটাল এবং টুলেন। ওঁরা দুজনই গবেষণায় নেমেছিলেন একই সমস্যা সামনে রেখে। ওই একই সমস্যার সমাধান ওঁদের শেষ পর্যন্ত নোবেল পুরস্কারে বৃত করল।

ব্যাপারটা এই। মস্তিষ্কের নিচে একটি গ্রন্থি আছে। যার নাম পিটুইটারি গ্রন্থি। এই গ্রন্থির আবার দুটি অংশ। একটিকে বলা হয় অ্যানটেরিয়র পিটুইটারি বা পারস ডিসটেলিস। অপরটির নাম পসটেরিয়র পিটুইটারি বা পারস নারভোসা। অ্যানটেরিয়র পিটুইটারি থেকে নিঃসৃত হয় নানা রকম হরমোন। যাদের কোনটি প্রোটিন, কোনটি বা গ্লাইকোপ্রোটিন। এই সব হরমোন শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থিকে উদ্দীপ্ত করে (যাদের মধ্যে পড়ে থাইরয়েড, গোনাডস, অড্রিনেল করটেকস, ম্যামারি গ্রন্থি প্রভৃতি) ওই গ্রন্থিগুলির সংশ্লিষ্ট হরমোন নিঃসরণে সাহায্য করে। পসটেরিয়র পিটুইটারি থেকেও নিঃসৃত হয় নানারকম হরমোন। যাদের কোনটি সন্তান প্রসবের সময় যোনির সঙ্কোচন এবং সম্প্রসারণ ঘটায়, মায়ের বুকের দুধ তৈরি করতে সাহায্য করে ইত্যাদি।

১৯২৪ নাগাদ বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন, পসটেরিয়র পিটুইটারি গ্রন্থির মধ্যে যে সব হরমোন পাওয়া যায় তাদের হাইপোথ্যালামাসের মধ্যেও পাওয়া যায়। হাইপোথ্যালামাস মস্তিষ্কেরই একটি অংশ। মস্তিষ্কের নিচের দিকে এর অবস্থান। পরে জানা গেল, পসটেরিয়র পিটুইটারি হরমোনগুলি আসলে তৈরি হয় হাইপোথ্যালামাসেরই মধ্যে। পরে তারা হাইপোথ্যালামাসের স্নায়ুর সূক্ষ্ম সুতোর মত অংশগুলির মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে পসটেরিয়র পিটুইটারিতে এসে সঞ্চিত হয়। অবশেষে এখান থেকেই রক্তের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় অংশে।

কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়াল অ্যানটেরিয়র পিটুইটারিকে নিয়ে। প্রচুর অনুসন্ধানের পর আবিষ্কৃত হল, পসটেরিয়র পিটুইটারির মত অ্যানটেরিয়র পিটুইটারির সঙ্গে কোন স্নায়ুসংযোগ নেই।

বিজ্ঞানীরা বললেন, সত্যিই কি হাইপোথ্যালামাসের সঙ্গে অ্যানটেরিয়র পিটুইটারির কোন সংযোগ নেই?

এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল ১৯৩৬ সালে। আবিষ্কৃত হল, বিশেষ এক ধরনের সূক্ষ্ম রক্তনালী। হাইপোথ্যালামাসের নিচের অংশ থেকে নেমে এসে অ্যানটেরিয়র পিটুইটারির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এই নালীগুলি কেটে দিলে অ্যানটেরিয়র পিটুইটারির হরমোন নিঃসরণ থেমে যায়। কাটা নালী জুড়ে দিলে তাদের নিঃসরণ আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে।

এই তথ্যের উপর নির্ভর করে ১৯৪৫ সালে অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী জি ডব্লু হ্যারিস একটি মতবাদ তুলে ধরলেন। এই মতবাদে বলা হল অ্যানটেরিয়র পিটুইটারির হরমোন নিঃসরণ হাইপোথ্যালামাস নিয়ন্ত্রিত করে। যার অর্থ দাঁড়াল এই ঃ বিভিন্ন কারণে মস্তিষ্ক উদ্দীপ্ত হলে হাইপোথ্যালামাসের মধ্যে তৈরি হয় বিশেষ বিশেষ ধরনের হরমোন। যাদের বলা হয়, হাইপোথ্যালামিক হরমোন এরাই অ্যানটেরিয়র পিটুইটারির হরমোন নিঃসরণকে বাস্তবায়িত করে।

যেমন ধরুন, পিটুইটারি থেকে এক ধরনের হরমোন নিঃসৃত হয় যার নাম থাইরোট্রপিন থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন। পিটুইটারি থেকে এই হরমোন রক্তের মাধ্যমে থাইরয়েড গ্রন্থিতে গিয়ে হাজির হয়, হাজির হয়ে তাকে উদ্দীপ্ত করে। তখন থাইরয়েড থেকে বের হয়ে আসে আইওডিনঘটিত এক ধরনের হরমোন। যার কাজ শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি যথাযথ করা এবং মানসিক উন্মেষণে সাহায্য করা।

বিজ্ঞানীদের বক্তব্য, পিটুইটারি থেকে এই থাইরোট্রপিন কিন্তু এমনিতেই বের হয় না। এর জন্যে দরকার আর এক ধরনের হরমোন। নাম T.hreleasing factor বা থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন নিষ্ক্রান্তকারক হরমোন। শেষোক্ত এই হরমোনটি তৈরি হয় হাইপোথ্যালামাসে। তৈরি হওয়ার পর সেখান থেকে এই হরমোন সূক্ষ্ম রক্তবাহী নলের মধ্য দিয়ে এসে পৌঁছয় অ্যানটেরিয়র পিটুইটারির মধ্যে। অ্যানটেরিয়র পিটুইটারি তার প্রভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে তখন নিঃসৃত করে TSH। থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন নিষ্ক্রান্তকারককে বলা হয় TRF। হাইপোথ্যালামাসের মধ্যে আরও দুইরকম হরমোন নিষ্ক্রান্তকারকের সন্ধান পাওয়া গেছে। যাদের নাম LRE এবং FR I। যাদের কাজ অ্যানটেরিয়র পিটুইটারির লিউটেনাইজিং হরমোন (LRF) এবং ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (FSH) নিঃসরণে সাহায্য করা।

গিলেমিন এবং স্যালির গবেষণা এই হাইপোথ্যালামিক হরমোনেরই ওপর। গিলেমিন লিখেছন ঃ প্রচণ্ড শ্রমসাধ্য কাজ। গবেষণার জন্যে আমাদের সংগ্রহ করতে হয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ ভেড়ার মগজ। এক একটি মস্তিষ্কের গড় ওজন যদি ১০০ গ্রাম হয়, তা হলে দাঁড়াল, এর জন্যে আমাদের প্রায় ৫০০ টন ভেড়ার মগজ সংগ্রহ করতে হয়েছে। আর এ থেকে আমরা সংগ্রহ করেছি ৭ টন হাইপোথ্যালামাস কোষ। অবশেষে এই ৭ টন বস্তু থেকে ১৯৬৮ সালে আমি এবং আমার সতীর্থ মাত্র এক মিলিগ্রাম TRF নিষ্কাশিত করতে সমর্থ হই।

'১৯৬৯ নাগাদ শুরু হল TRF-এর রাসায়নিক গুণাগুণ নিয়ে গবেষণার কাজ। এত কম পরিমাণ TRF নিয়ে কাজ করতে গিয়ে কি প্রচণ্ড বাধাই না সহ্য করতে হয়েছে আমাদের। বের করতে হবে আণবিক গুরুত্ব। আমরা মাসস্পেকট্রোমেটারি এমন কি নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক স্পেকট্রোমেটারি এবং ইনফ্রারেড স্পেকট্রোমেট্রিরও সাহায্য নিয়েছি। লাভ হয় নি। পরে বিশেষ একটি পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে আমরা সফল হই।'

অবশেষে তাঁরা নিষ্কাশন করলেন তিনটি হরমোন রিলিজিং ফ্যাকটর ঃ থাইরয়েড, লিউটেনাইজিং এবং ফলিকল হরমোন রিলিজিং ফ্যাকটর। শুধু নিষ্কাশনই নয় সেই সঙ্গে এই সব বস্তুর আণবিক গুরুত্ব, আণবিক গঠন – সবই জানা গেল, যা পরবর্তীকালে তাদের সংশ্লেষণ করতে সাহায্য করেছে।

গিলেমিন এবং স্যালির সাফল্য দৈহিক এবং মানসিক কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে। সাহায্য করবে বিভিন্ন বিপাকীয় ব্যাধি নিরাময়ের ব্যাপারেও।



নোবেল পুরস্কার ১৯৭৮

পদার্থ বিজ্ঞান

স্টকহোম থেকে খবরটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্কোয় সরাসরি ডঃ কাপিতজার বাড়িতে যোগাযোগ করলেন জনৈক সাংবাদিক।

টেলিফোনে ওপার থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল ঃ বলুন, আমি ডঃ কাপিতজা বলছি।

অভিনন্দন, স্যার! নোবেল কমিটি এ-বছর আপনাকে পদার্থ বিজ্ঞানে আপনার অসামান্য গবেষণার দরুন নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

অপর প্রান্তের বক্তা মুহূর্তের জন্যে বিব্রত হলেন যেন। পরক্ষণেই উল্লসিত—বললেন, আমি না। আমার বাবা ডঃ পিটার লিওনিদোভিচ কাপিতজা।

তা হলে আপনি কে? অধৈর্য কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করলেন সাংবাদিক।

আমি তাঁর ছেলে ডঃ সেরগাই কাপিতজা। ওপার থেকে উত্তর এল।

মাফ করবেন, ডঃ কাপিতজা। আপনার বাবার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?

দুঃখিত। এখানে তাঁকে তো পাবেন না। এখন তিনি মস্কোর বাইরে গ্রামে গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন।

আমার দুর্ভাগ্য। সাংবাদিকটির কণ্ঠস্বরে তাৎক্ষণিক হতাশা।

কিন্তু পরমুহূর্তেই সেই ভাবটি কাটিয়ে উঠে সেরগেইকেই তিনি সরাসরি প্রশ্ন করে বসলেন, তা হলে আপনিই বলুন, স্যার। আপনার বাবা নোবেল পুরস্কার পাওয়াতে আপনি কতটা খুশি হয়েছেন?

দারুন খুশি হয়েছি। তবে বহুকাল ধরেই এই ঘটনাটির জন্যে আমি অপেক্ষা করছিলাম। মন্তব্য করলেন ডঃ সেরগেই কাপিতজা। যিনি নিজেও পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

ডঃ কাপিতজার এই সম্মান বহুদিন আগেই পাওয়া উচিত ছিল। মন্তব্য করেছেন

পৃথিবীর কয়েক ডজন বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী। 'কারণ যে লো-টেমপারেচার ফিজিকস-এর জন্যে তাঁকে এই পুরস্কারটি দেওয়া হলো, সে কাজ তো শেষ করেছেন তিনি প্রায় চার দশক আগে।

ডঃ পিটার লিওনিদোভিচ কাপিতজার জন্ম ২৬ জুন ১৮৯৪। জন্মস্থান রাশিয়ার ক্রনস্টাড নামে ছোট্ট একটি শহরে। বাবা এবং ঠাকুর্দা দুজনই ছিলেন জার সেনা বাহিনীর জেনারেল। বিজ্ঞান এবং কারিগরি শিক্ষার জন্যে তিনি পেট্রোগ্রাদ পলিটেকনিকেল ইনসটিটিউটে ভরতি হন। পরে সেখানকার পড়াশুনা শেষ করে ওই শিক্ষাকেন্দ্রেই অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন।

কম বয়েস থেকেই কাপিতজার ইচ্ছে ছিল চুম্বক নিয়ে কিছু গবেষণা করেন। আশা, এর জন্যে তিনি ইংলন্ডে যান। কারণ এসব গবেষণার স্বর্গরাজ্য তখন ইংলন্ড। সেখানে রয়েছেন স্যার আর্নেস্ট রাদারফোর্ড। তাঁর গবেষণাগার তখন বিশ্বখ্যাত।

১৯২১ সালে পেট্রোগ্রাদ থেকে কাপিতজা চলে এলেন কেমব্রিজে। সরাসরি রাদারফোর্ডের কাছে।

তরুণ প্রতিভাটিকে চিনতে ভুল করলেন না রাদারফোর্ড। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর চৌম্বক বিষয়ক গবেষণার কৃতিত্ব সবারই চোখে পড়ল। রাদারফোর্ড ভীষণ খুশী। ১৯২৪ সালে তিনি তাঁকে ক্যাভেনডিস গবেষণাগারের চৌম্বক গবেষণা বিভাগের সহকারী পরিচালকের পদে নিযুক্ত করলেন। পরের বছরই তাঁকে ট্রিনিটি কলেজের 'ফেলো' হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। ১৯২৯ সালে রয়েল সোসাইটির সদস্য। এটাও এক অসামান্য সম্মান কারণ এর আগে গত ২০০ বছরে রয়েল সোসাইটি আর কোন বিদেশী বিজ্ঞানীকে তাঁদের সদস্য পদে গ্রহণ করেন নি। ১৯২৩ সালে স্যার রাদারফোর্ডের উদ্যোগে এবং মুখ্যত কাপিতজার জন্যেই তৈরি হয়েছিল নতুন একটি গবেষণাগার। নাম মনড ল্যাবেরেটারি। ১৯৩০ সালে রয়েল সোসাইটি তাঁকে তাঁদের মাসেল রিসার্চ প্রফেসরের পদে বৃত করেন।

কেমব্রিজে থাকার সময় নানা রকম গবেষণার কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন ডঃ কাপিতজা। এই সময় প্রচন্ড শক্তিসম্পন্ন চুম্বক তৈরি করে কারিগরির ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ-এর মর্যাদা অর্জন করেন। এ ছাড়া কুড়ি জন পারমাণবিক বিজ্ঞানীকে নিয়ে কেমব্রিজে তিনি এক গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন। কাপিতজা তাঁদের কাছে ছিলেন বড় রকম অনুপ্রেরণা। প্রত্যেক সপ্তাহে বৈঠক বসতো তাঁদের। এই বৈঠকে পারমাণবিক গবেষণার বিভিন্ন তথ্য এবং তত্ত্ব নিয়ে তাঁরা বিশদ আলোচনা করতেন। পরে গোষ্ঠীটির নাম দেওয়া হল 'কাপিতজা ক্লাব'।

১৯৩৪ সালে 'হিলিয়াম' গ্যাসকে তরল করার একটি অভিনব যন্ত্র তৈরি করলেন কাপিতজা। সে যেন এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। হিলিয়ামকে এর আগেও তরল করা হয়েছে। কিন্তু সেই তরল হিলিয়ামে একটা খুঁত থেকে যেত। সব সময় তার মধ্যে থেকে যেত যৎসামান্য তরল হাইড্রোজেন। ওই হাইড্রোজেন পুরোপুরি সরিয়ে নেওয়া এতদিন সম্ভব হয়নি।

কাপিতজা তাঁর তরলীকরণ যন্ত্রে একটি নতুন পদ্ধতি কাজে লাগালেন। ইংরেজিতে যাকে বলা হয়, 'অ্যাডিয়াবেটিক একসপানশন' বা 'রুদ্ধতাপ সম্প্রসারণ' পদ্ধতি। তাঁর এই পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে তরল হাইড্রোজেন বিহীন বিশুদ্ধ তরল হিলিয়াম তৈরি করতে সমর্থ হন।

আরও একটি কথা। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন, মৌলিক পদার্থ হলেও হিলিয়াম গ্যাসকে যখন তরল অবস্থায় রূপান্তরিত করা হয়, তখন পাওয়া যায় দু রকম তরল হিলিয়াম। হিলিয়াম-১ এবং হিলিয়াম-২। যৎসামান্য তাপমাত্রার হেরফের করলেই (২·৯ ডিগ্রি অ্যাবসলিউট) হিলিয়াম-১ হিলিয়াম-২ এ পরিবর্তিত হয়। ১৯৩৮ সালে অ্যালেন এবং কাপিতজা পৃথক পৃথকভাবে প্রমাণ করেন, সাধারণ কোন তরল বস্তু কৈশিক নলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় যেমন বাধা পায়, হিলিয়াম-২-এর ক্ষেত্রে কিন্তু তেমনটি ঘটে না। বরং এ ক্ষেত্রে তেমন কোন বাধা ঘটে না বললেই চলে। এই ধর্মটির কথা ভেবে হিলিয়াম-২ এর ওঁরা নাম রাখেন 'সুপার ফ্লুইড লিকুইড'। এই আবিষ্কার পরে 'লো-এনার্জি কম্পিউটার' এবং 'কনট্রোল সিসটেম' বা স্বল্প শক্তিতে চলে এবং নিয়ন্ত্রণ করা যায় এমন ধরনের যন্ত্রগণক তৈরি করতে বিজ্ঞানীদের সাহায্য করেছে।

ক্যাভেনডিস গবেষণাগারে চৌম্বক, পরমাণু বিজ্ঞান এবং নিম্ন তাপমাত্রার পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় যেন মেতে উঠলেন কাপিতজা। মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ পেতেন মস্কোর বিজ্ঞানী মহল থেকে। তাঁদের অনুরোধ, আসুন। আপনার অসামান্য গবেষণার কিছু কথা আমাদের শুনিয়ে যান।

তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করেছেন কাপিতজা। আর যখনই সেখানে গেছেন তাঁর মনে পড়েছে লেনিনগ্রাদের কথা। সেখানে কী দারুণ দুর্ভিক্ষ সেবার। রোগে ভুগে মারা গেলেন স্ত্রী। এক সন্তান। আর তার পরই তো তিনি চলে আসেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নোবেল বিজ্ঞানী স্যার রাদারফোর্ডের কাছে গবেষণা করতে। হ্যাঁ, সেটা ১৯২১।

গোলমাল বাঁধল ১৯৩৪-এ। আগের মত বিজ্ঞানীদের সভায় যোগ দিতে কাপিতজা গেলেন সোভিয়েত দেশে। সভার শেষে এবার কিন্তু তাঁর আর ইংলণ্ডে ফেরা হলো না। বাদ সাধলেন সোভিয়েত সরকার। বাদ সাধলেন স্বয়ং স্তালিন। স্তালিন বললেন, রাশিয়া এখন বিপদের অপেক্ষায় দিন গুনছে। বিপদ জার্মান আক্রমণ। এমন অবস্থায় আপনার উচিত স্বদেশের স্বার্থে কাজ করা।

রাশিয়া তখন লৌহ যবনিকার দেশ। এর পর কী হয়েছিল তার সঠিক খবর দেওয়া শক্ত। তবে এই ঘটনার পর তিনি আর রাশিয়া থেকে কেমব্রিজে ফিরে আসতে পারেননি।

খবরটা শুনে মর্মাহত হলেন রাদারফোর্ড। মনে পড়ল তাঁর মনড গবেষণাগারের কথা। মনে পড়ল কত অধ্যবসায়, পরিকল্পনা এবং স্বপ্ন নিয়ে কাপিতজা গড়ে

তুলেছিলেন এই গবেষণাগারটি। এমন একটি গবেষণাগারের মত আর একটি কি কাপিতজা মস্কোয় গড়ে তুলতে পারবেন ?

রাদারফোর্ড রুশ সরকারকে জানালেন তাঁরা চাইলে মনড গবেষণাগারের যাবতীয় কিছু তিনি কাপিতজার স্বার্থে মস্কোয় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন, খবরটি পেয়ে সরকার খুশী। ১৯৩৫ সালে মনড গবেষণাগারটি মস্কোর সোভিয়েত আকাদেমি অব সায়ান্সেসের ইনসটিটিউট ফর ফিজিক্যাল প্রোবলেমস-এ পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সোভিয়েত সরকার এর জন্যে অবশ্য আর্থিক মূল্যও দিয়েছেন। সতীর্থ বিজ্ঞানীর জন্যে এমন সহযোগিতার উদাহরণ পৃথিবীতে বিরল। মস্কোর ওই ইনসটিটিউটের ডিরেক্টারের পদে কাপিতজাকে নির্বাচিত করা হয়। উল্লেখ্য, এর আগের বছর তিনি সোভিয়েত আকাদেমি অব সায়ান্সেসেরও সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে তিনি এক ধরনের টারবাইন আবিষ্কার করেন, যার সাহায্যে কম খরচে বাতাসকে তরল করা সম্ভব হয়েছিল। সেই সঙ্গে তরল অক্সিজেন। সোভিয়েত দেশের ইস্পাত উৎপাদন বাড়িয়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর এই আবিষ্কার খুবই সাহায্য করে।

মস্কোয় থাকার সময় পারমাণবিক গবেষণা ক্ষেত্রেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন কাপিতজা। পশ্চিমী বিজ্ঞানীরা এক সময় ধরে নিয়েছিলেন, গোড়ায় সোভিয়েত দেশ যে সব পারমাণবিক এবং হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করেছিল, তার পেছনে হয়ত কাজ করেছে কাপিতজারই মগজ। পরে জানা যায়, কথাটা ভুল। কাপিতজা পারমাণবিক বোমা তৈরি করার ব্যাপারে রাশিয়াকে সাহায্য করুন, স্তালিনের এই আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষাই করেছেন কাপিতজা। অন্য কেউ হলে এর জন্যে হয়ত তাঁকে মর্মান্তিক পরিণতিই ভোগ করতে হত। কিন্তু স্তালিন তাঁর মগজটির গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। ফলে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের বদলে নিজের ঘরেই গৃহবন্দী হলেন কাপিতজা।

১৯৫৫ সালে মস্কো থেকে ঘোষণা করা হয়, কৃত্রিম-উপগ্রহ বিষয়ক প্রকল্পের কোনো কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কাপিতজার ওপর। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁর সত্যিকারের ভূমিকা কি ছিলো, তার কোন বিশদ বিবরণ জানা সম্ভব হয় নি। তবে তাঁর নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'রকেটস, মিসাইল অ্যান্ড মেন ইন স্পেস' এ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান লেখক ডঃ উইলি লে উল্লেখ করেছেন, মস্কোয় কাপিতজার পরিচালনায় রকেটের জ্বালানি বিষয়ে গবেষণায় একটা বড় রকমের প্রকল্প চালু করা হয়।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা তাঁর নাম দিয়েছেন 'সোভিয়েত বিজ্ঞানের ডন কুইকজোট।' কারণ অনাড়ম্বর তাঁর জীবন। অনাড়ম্বর তাঁর গবেষণার প্রস্তুতি। আর বৈজ্ঞানিক ভাবনা চিন্তায় ডন কুইকজোটের মতই তিনি বহুমুখী। বয়েস এখন চুরাশি। কিন্তু এই বয়েসেও তাঁর ভাবনা চিন্তায় এখনও ভাটা পড়েনি। নোবেল পুরস্কার অনেক দেরিতে পেলেন ঠিকই, তবে এর আগে দেশ বিদেশে আরও অনেক পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। বিজ্ঞানীমহলে কাপিতজা বহু আগেই শিরোনাম।

পদার্থবিজ্ঞানে আর দুজন যাঁরা এবারে নোবেল পুরস্কার পেলেন কাপিতজার

তুলনায় বয়েসে তাঁরা অনেক তরুণ। তাঁদের গবেষণার বিষয়বস্তুও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

একজন ডঃ আরনো পেনজিয়াস। বয়স ৪৫। নাৎসী জার্মানি থেকে ইহুদী উদ্বাস্তু হিসেবে তাঁদের পরিবার মার্কিন দেশে এসেছিল। ছাত্র হিসেবে আরনো ছোট বয়েস থেকেই ছিলেন যথেষ্ট চৌকস। এখন নিউ জারসির বেল টেলিফোন ল্যাবোরেটারির রেডিও ফিজিকস বিভাগের প্রধান। অপরজন ডঃ রবার্ট উইলসন। বয়েস ৪২। তিনিও ওই একই গবেষণাগারে কারিগরি বিষয়ক পদে নিযুক্ত রয়েছেন।

নোবেল কমিটির মতে, বিগত কয়েক বছর পেনজিয়াস এবং উইলসন 'কসমিক মাইক্রোওয়েভ রেডিয়েশন' মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ বিকিরণ-এর ওপর বিশদ পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে আসছেন। তাঁদের এই গবেষণা 'বিগ ব্যাংগ' নামক মহাবিশ্বের সৃষ্টি তত্ত্বটি প্রমাণ করার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। উল্লেখ্য, 'বিগ ব্যাংগ' তত্ত্বে বলা হয়, বর্তমান যে মহাবিশ্ব, তার জন্মের কারণ অতিকায় এক মহাবিস্ফোরণ। নোবেল পুরস্কার তাঁদের ওই গবেষণারই স্বীকৃতি।

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার খবরটি জানতেই বেশ আত্মসচেতন হয়ে উঠেছিলেন ডঃ পেনজিয়াস। কোনরকম ভণিতা না করেই মন্তব্য করলেন, 'কেমন যেন একটা ধারণা আমাকে পেয়ে বসেছিল, আমার ভাগ্যে এ বছর নোবেল পুরস্কার ঝুলছে। কারণ আমার গবেষণা এ পর্যন্ত বহু পুরস্কারই তো পেয়েছে।

জন্মস্থান মুনিখ। এখন বাস করেন নিউ জারসির হাইল্যাণ্ড পার্কে।

'উদ্বাস্তু হিসেবে আমরা এসেছিলাম নিউ ইয়র্কে। মার্কিনরা স্বপ্ন দেখে। বড় বেশী স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখাটা ওদের কাছে একটা ফ্যাশন। ও সবে আমার কোন বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু পরে আর অবিশ্বাসী হতে পারি নি। এ দেশে এসেছিলাম রিক্ত অবস্থায়। কিন্তু ওই স্বপ্নের জন্যেই তো যা হোক কিছু পেয়েছি। ডঃ পেনজিয়াস বললেন। বললেন, 'চল্লিশ বছর আগে আমাদের পরিবার নাৎসী জার্মানি থেকে পোল্যাণ্ডে চলে আসে। সেখান থেকে মার্কিন দেশ। ভাল লাগছে, পুরস্কারটা এমন সময় পেলাম যখন আমরা আমাদের উদ্বাস্তু হওয়ার চল্লিশ বার্ষিকী উৎসবটি পালন করছি।'

ডঃ পেনজিয়াসের উচ্চ শিক্ষার শুরু নিউ ইয়র্কের সিটি কলেজে এবং তারপর কলামবিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৬১ সালে তিনি নিউ জারসির বেল টেলিফোন ল্যাবোরেটারিতে যোগ দেন। ইতিমধ্যে জর্জ গ্যামোর 'বিগ্ ব্যাংগ' নামক বিশ্বসৃষ্টির তত্ত্বটি তাঁকে আকৃষ্ট করে। তিনি এবং ডঃ উইলসন আবিষ্কার করেন মহাবিশ্বের পরিমণ্ডলে অনুতরঙ্গ বা মাইক্রোওয়েভ ছড়িয়ে রয়েছে। ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র এবং সমান হারে।

চুয়ান্ন বছর আগে এডুইন হিউবল আবিষ্কার করেন, মহাবিশ্বের যাবতীয় নক্ষত্র জগৎ বা গ্যালাক্সি ক্রমেই আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যেন মহাবিশ্ব একটি বেলুন। বেলুনের গায় অজস্র ফুটকি আঁকা। বেলুনটি যতই ফোলানো হচ্ছে, ফুটকিগুলি ততই পরস্পর পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ওই ফুটকিগুলিকে এক

একটি নক্ষত্র বা নক্ষত্র জগতের সঙ্গে কল্পনা করলেই পরিস্থিতিটি বোঝা যায়। একেই বলা হচ্ছে 'একস্‌প্যানডিং ইউনিভার্স' বা সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব।

হুবল-এর এই আবিষ্কারকে সমর্থন করার জন্যে তখন অনেকেই নানা রকম তত্ত্ব দাঁড় করাতে শুরু করে দিলেন। কেউ কেউ বললেন ঘটনাটা শুরু হয়েছিল এক হাজার থেকে দু'হাজার কোটি বছর আগে। আজকের মত মহাবিশ্বে তখন কোন গ্রহ, নক্ষত্র বা নক্ষত্রজগৎ ছিল না। তখন তার একমাত্র অস্তিত্ব বলতে ছিল শক্তি ফোটন হিসেবে। আর ছিল অকল্পনীয় উত্তপ্ত গ্যাস। যার উপাদান হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস বা প্রোটন, হিলিয়াম নিউক্লিয়াস এবং ইলেকট্রন। এরা সবাই মিলিতভাবে তৈরি করে রেখেছে অকল্পনীয় উত্তপ্ত অতিকায় অগ্নিকুণ্ডের মত একটি মহাজাগতিক বস্তু যার তাপমাত্রা তখন কয়েক হাজার কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস। এক সময় ওই বস্তুটির আভ্যন্তরিক চাপ প্রচণ্ড বেড়ে যায়। এবং তার ফলে ঘটল প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই বিস্ফোরণেরই নাম দিয়েছেন 'বিগ্‌ ব্যাংগ'।

'বিগ্‌ ব্যাংগ' তত্ত্বের সমর্থক মনে করেন, বিস্ফোরণের পর এই অতিনাক্ষত্রিক বস্তু থেকে উৎক্ষিপ্ত হয় গ্যাস এবং নানা রকম বস্তু কণা। পটকা ফোটালে তার পাথরকুচিগুলি যেমন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ওই গ্যাস এবং বস্তু কণাও সেই রকম বিস্ফোরণ কেন্দ্র থেকে প্রচণ্ড বেগে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই গ্যাস এবং বস্তু কণাই পরে পারস্পরিক বিক্রিয়া করে তৈরি করে নক্ষত্র এবং নক্ষত্রজগৎ। সৃষ্টির পর থেকে তারা ক্রমান্বয়ে পরস্পর পরস্পর থেকে দূরে যাচ্ছে, তাদের সেই ছোটা শেষ হয়নি বলে। সেই ছুটে চলা অনন্ত কাল ধরে চলবে।' মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণ কোন দিন থামবে না।

জর্জ গ্যামোর তত্ত্বটি হলো এই : 'সেই অতিকায় অগ্নিগোলকের বিস্ফোরণের পরবর্তী এক লক্ষ বছর মহাবিশ্বের অস্তিত্ব বলতে শুধু ছিল (ফোটন), হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম নিউক্লিয়াস। মহাবিশ্বে তখন চলেছে প্রচণ্ড গতিতে সম্প্রসারণের পালা।…ক্রমে ফোটনের শক্তি কমে এল। তাপমাত্রা কমল। মৌলিক কণা এবং নিউক্লিয়াসের ছোটাছুটিও এল কিছুটা কমে। ইলেকট্রনের গতিও অনেক শ্লথ হয়ে এসেছে। তখন নিউক্লিয়াসগুলি আশেপাশে ছুটন্ত ইলেকট্রনগুলিকে নিজেদের মধ্যে বন্দী করে তৈরি করে এক একটি মৌলিক পদার্থের পরমাণু।'....অতিকায় বিস্ফোরণের অব্যাহিত পর কিভাবে হাল্কা মৌলিক পদার্থগুলি তৈরি হয়েছিল সে সম্পর্কে প্রথম তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয় ১৯৪৮ সালে। উপস্থাপক রালফ্‌ এ অ্যালফের হানস বেদে এবং জর্জ গ্যামো।

১৯৬৫ সালে আবিষ্কৃত হলো আরও একটি নতুন ঘটনা। ব্যাপারটা কতকটা এই রকম। ধরুন, কাছাকাছি কোথাও একটা বোমা ফাটলো। সৃষ্ট হলো প্রচণ্ড শব্দ। সেই শব্দ কিন্তু সৃষ্টির পরমুহূর্তেই থেমে যায় না। তার অনুরণন চলতে থাকে আরও কিছুক্ষণ। বিজ্ঞানীরা বললেন, ঠিক এমন একটি ঘটনা মহাবিশ্বেও ঘটেছিল। কোটি কোটি বছর আগের সেই ঘটনা—'বিগ্‌ ব্যাংগ'। তাঁরা যেন দেখতে পেলেন

সেই মহানাক্ষত্রিক বিস্ফোরণেরও অনুরণন মহাজাগতিক পরিমণ্ডলে এখনও বিদ্যমান। সেই অনুরণনের শক্তিকেই বলা হচ্ছে 'ব্যাকগ্রাউণ্ড রেডিয়েশন'। এই রেডিয়েশন ধরা পড়ল অণুদৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গ হিসেবে। দেখা গেলো, কোন 'কৃষ্ণ বস্তু' তিন ডিগ্রি কেলভিন তাপমাত্রায় যে উত্তাপ শক্তি বিকীর্ণ করে, ওই বেতার-বিকিরণের শক্তি মাত্রাও সেই রকম। এই ব্যাকগ্রাউণ্ড রেডিয়েশনকেই বলা হয় সেই অতিকায় বিস্ফোরণের 'রেমনানট' বা 'অবশেষ'। এই 'অবশেষ' মহাবিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে।

'উইলসন এবং আমি এক সঙ্গে ১৯৬৩ এবং ১৯৬৫ সালে পরীক্ষা চালিয়ে সিদ্ধান্ত করি, এই ব্যাকগ্রাউণ্ড রেডিয়েশন কোন আঞ্চলিক ঘটনা নয়, মিলকিওয়ে বা ছায়াপথের ওপার থেকেও তারা আমাদের দিকে ছুটে আসছে। এবং এর উৎস সেই বিগ্ ব্যাংগ। মন্তব্য করেছেন ডঃ পেনজিয়াস।

আন্তর্নাক্ষত্রিক পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে রয়েছে হাইড্রোজেন এবং ডিউটেরিয়াম। বিজ্ঞানীদের ধারণা এই ডিউটেরিয়াম বিগ্ ব্যাংগ-এর অব্যবহিত পর তৈরি হয়েছিল। অনেকে এই ডিউটেরিয়ামের পরিমাণ হিসেব করে বলছেন, 'বিগ্ ব্যাংগ' তত্ত্বটিই অনেক বেশি জোরাল। অ্যারিজোনার কিট্‌পিক মানমন্দির থেকে ৩৯-ফুট ব্যাসের বেতার-দূরবীক্ষণের সাহায্যে এই নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে পর্যবেক্ষণ চালিয়েছেন পেনজিয়াস, উইলসন এবং তাঁদের আর একজন সতীর্থ কিথ বি জেফারটস। পর্যবেক্ষণ চালান ক্লাইনমান-লো নীহারিকার পরিমণ্ডলে। তাঁরা লক্ষ্য করেন, সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে হাইড্রোজেন এবং ডিউটেরিয়ম! যাদের অনুপাত ১০০,০০০ : ১। এই ধরনের মাত্রা তাঁরা মহাবিশ্বের অন্যত্রও লক্ষ্য করেছেন। যা 'বিগ্ ব্যাংগ'-কেই সমর্থন করে।

নোবেল কমিটি পুরস্কার ঘোষণার সময় মন্তব্য করেছেন, পেনজিয়াস এবং উইলসন যখন প্রথম ব্যাকগ্রাউণ্ড রেডিয়েশনের সন্ধান পান, তখন তাঁরা মনে করেছিলেন হয়ত তাঁরা কিছু দেখছেন। ওই তরঙ্গমাত্রার বেতার সংকেত হয়ত তাঁদের গ্রাহক যন্ত্রেই তৈরি হচ্ছে। অথবা কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে আসছে। পরে এই ভুল তাঁদের ভেঙ্গে যায়। তাঁরা আবিষ্কার করেন এই মাইক্রোওয়েভ আমাদের বহির্জগৎ থেকেও আসে। সব দিক থেকেই আসছে। এবং সমান মাত্রায়।

নোবেল কমিটির পক্ষ থেকে অধ্যাপক স্ভেন জোহানসনের বক্তব্য : পেনজিয়াস এবং উইলসনের গবেষণা মহাবিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিল। তাঁদের আবিষ্কার এমন একটি অভ্রান্ত পদ্ধতি (অ্যাবসলিউট সিসটেম) যোগালো যার সাহায্যে এখন থেকে পৃথিবী থেকে শুরু করে তাবৎ মহাজাগতিক বস্তুর চলাচলের ব্যাপারটা আমরা অনেক সূক্ষ্মভাবে মাপতে পারবো।

রসায়ন

ডঃ পিটার মিচেল। বয়স ৫৮। ঠিকানা : গ্লিন রিসার্চ ল্যাবরেটারিজ, করনওয়াল, ইংল্যাণ্ড।

সুইডিস অ্যাকাডেমি অব সায়ান্স-এর বক্তব্য ঃ ডঃ মিচেলের অসামান্য অবদান
তাঁর কেমিঅসমোটিক তত্ত্ব। জীব-কোষের কাজকর্ম চালাতে গেলে দরকার শক্তি।
বিভিন্ন রাসায়নিক পদ্ধতিতে সেই শক্তি জীবকোষ কী ভাবে অর্জন করে, কোষ-
প্রাচীরের মধ্য দিয়ে শক্তির স্থানান্তরই বা (Energy trans'er) ঘটে কী ভাবে, ডঃ
মিচেলের ওই তত্ত্ব সে সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা যোগাতে সাহায্য করেছে। এই অনবদ্য
গবেষণার জন্যে এ বছর তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হলো।
'প্রোটিসিটি'। এই শব্দটিরও উদ্ভাবক ডঃ মিচেল।
শব্দটি 'ইলেকট্রিসিটি'-রই অনুরূপ। 'ইলেকট্রিসিটি' বলতে আমরা বুঝি, কোন
পরিবাহীর মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনের প্রবাহ। আর ডঃ মিচেলের তৈরি 'প্রোটিসিটি'
শব্দটির অর্থ জীব-কোষ প্রাচীরের এক পাশ থেকে অন্য পাশে প্রোটনের প্রবাহ।
পরিবাহীর মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনের স্থানান্তর ঘটানোর দরুন বিদ্যুৎ-শক্তির যেমন
স্থানান্তর ঘটে, ঠিক তেমনি জীব-কোষ প্রাচীরের মধ্য দিয়ে প্রোটনের স্থানান্তরের
দরুন ঘটে জীব-কোষে শক্তির স্থানান্তর। ইলেকট্রন প্রবাহের জন্য দরকার এক ধরনের
বল। যাকে বলা হয় ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স (emf)। আর প্রোটন প্রবাহের জন্যে
যে বলের প্রয়োজন, তার নাম দেওয়া হয়েছে প্রোটনমোটিভ ফোর্স (pmf)।
সুইডিস অ্যাকাডেমি অব সায়ান্স-এর জীব রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ রবার্ট
মালমস্ট্রমের মন্তব্য ঃ ডঃ মিচেলের আবিষ্কার ভবিষ্যতে রাসায়নিক শক্তি থেকে
বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ব্যাপারে সাহায্য করবে। শক্তি সংরক্ষণ সমস্যারও হয়ত
সমাধান করবে।
প্রসঙ্গ ছিল উদ্ভিদ এবং প্রাণীর জীবন্ত কোষের মধ্যে শক্তি সংরক্ষিত হয় তাই
নিয়ে।
সবাই জানেন শক্তির মূল উৎস সূর্য। গাছের সবুজ পাতায় থাকে এক ধরনের
সবুজ কণা। নাম ক্লোরোফিল। সূর্যের বিকিরণ শক্তি যখন গাছের পাতায় এসে পড়ে
তখন ক্লোরোফিলের সাহায্যে সেখানে চলে এক ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া। পাতায় থাকে
সূক্ষ্ম ছিদ্র পথ। নাম স্টোমা। থাকে জল। বাতাসে মিশে কার্বন ডাই-অক্সাইড
ওই ছিদ্রের মধ্যে ঢুকে জলের সঙ্গে করে রাসায়নিক বিক্রিয়া। ক্লোরোফিল এই
বিক্রিয়ায় অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। আর বিক্রিয়াটি ঘটায় সৌর শক্তি। এবং
শুধু ঘটানোই নয়, জল এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড পরস্পর বিক্রিয়া করে যে সব
রাসায়নিক যৌগ তৈরি করে যেমন গ্লুকোজ, স্টার্চ, লিপিড প্রভৃতি ওই সৌরশক্তির
বেশ কিছু অংশ তাদের মধ্যে সংরক্ষিত হয়। আলোর সাহায্যে রাসায়নিক সংশ্লেষণ
চলে বলে এই পদ্ধতিকে বলা হয় ফোটোসিনথেসিস বা সালোকসংশ্লেষণ। বলা বাহুল্য,
গাছের পাতায় এই যে বিক্রিয়া ঘটল, এতে করে কার্বন ডাই-অক্সাইড বিজারিত হয়।
এর পর যখন শ্বাস কাজ চলে তখন অক্সিজেনের সঙ্গে ওই সব রাসায়নিক যৌগ
বিক্রিয়া ঘটিয়ে তৈরি করে আরও নানা রকম রাসায়নিক যৌগ, কার্বন ডাই-অক্সাইড
ইত্যাদি। তখন তাদের ভেতর সংরক্ষিত অবস্থায় যে শক্তি ছিল তা বেরিয়ে আসে।

এই শক্তি শরীরের তাপমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে, সাহায্য করে নানা রকম শারীরবৃত্তীয় কাজকর্ম করার ব্যাপারে। এটা জারণ পদ্ধতি। এক্ষেত্রেও ঘটে আরও একটি ঘটনা। যে পরিমাণ শক্তি বেরিয়ে এলো তার সবটাই যে তাৎক্ষণিকভাবে কাজে লাগে, তা তো নয়। বেশ কিছু পরিমাণ শক্তি উদ্‌বৃত্ত থেকে যায়। উদ্‌বৃত্ত এই শক্তি তখন সংরক্ষিত হয় বিশেষ এক ধরনের রাসায়নিক যৌগের মধ্যে। নাম অ্যাডেনসিন ট্রাইফসফেট বা সংক্ষেপে ATP।

আরও একটি কথা। উদ্ভিদ সরাসরি সূর্য থেকে শক্তি সংগ্রহ করে ঠিকই। কিন্তু প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নয় (যৎসামান্য ব্যতিক্রম কোথাও কোথাও অবশ্য দেখা যায়)। উদ্ভিদ থেকে আমরা সংগ্রহ করি কার্বোহাইড্রেট, চর্বি ইত্যাদি। আমাদের দেহকোষ এসব সামগ্রী থেকেই শক্তি সংগ্রহ করে নানা রকম বিপাকীয় কাজকর্ম চালিয়ে থাকে। এদের ভূমিকা যেন কয়লার মত। কয়লা পুড়িয়ে যেমন উত্তাপ শক্তি পাওয়া যায় শরীরে এদের জারণ ঘটার ফলে তেমনি তৈরি হয় শক্তি।

ভাল কথা। শক্তি না হয় তৈরি হলো কিন্তু সব শক্তিকে সব সময় সরাসরি কি কাজে লাগানো যায়? কয়লার কথাই ধরুন। কয়লা পুড়িয়ে আমরা উত্তাপ শক্তি পাই, সে তো সবাই আমরা জানি। কিন্তু তার সাহায্যে সরাসরি ইঞ্জিন চালাবেন সেটা তো সম্ভব নয়। উত্তাপ-শক্তির সাহায্যে প্রথমে জলকে ফুটিয়ে করা হয় বাষ্প। এর ফলে উত্তাপের বেশ কিছু অংশ ওই বাষ্পের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। তার জোরেই বাষ্প ধাক্কা মারে পিস্টনকে। পিস্টন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তখন ইঞ্জিন চালায়।

উদ্ভিদ এবং প্রাণিকোষের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা যেন দাঁড়ায় একই রকম। জীবকোষ বেশিরভাগ শক্তিই সংগ্রহ করে কার্বোহাইড্রেট এবং চর্বি থেকে, তাদের জারণ ঘটিয়ে। কোষের বৃদ্ধির জন্যে দরকার শক্তি, শক্তি তার বিভাজনের জন্যেও দরকার। শক্তি দরকার নানা রকম বিপাকীয় কাজকর্ম করার জন্যে। কার্বোহাইড্রেট এবং চর্বির জারণের দরুন শক্তি উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু সরাসরি তার সাহায্যে সব সময় যে সব কাজ হবে, এমন কোন কথা নেই। বাষ্পের মত এ ক্ষেত্রেও দরকার শক্তির বাহক। সেই বাহকটিও ওই 'এ টি পি'। জারণের দরুন যে শক্তি নির্গত হয় জীবকোষে সেই শক্তি কীভাবে 'এ টি পি' নামক রাসায়নিক যৌগটি তৈরি করে বিজ্ঞানীদের সেটা বড় রকমের একটি জিজ্ঞাসা।

স্তন্যপায়ী প্রাণীর পেশীর নির্যাস থেকে প্রথম 'এ টি পি' সংগ্রহ করেছিলেন ফিসকে এবং সাবব্যারো। সেটা ১৯২৯। পরবর্তী তিন দশক ধরে এই যৌগটি কীভাবে সৃষ্ট হয় তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা নানাভাবে জল্পনা করেছেন, ১৯৫০-এর দশকে কেউ কেউ বললেন জীবকোষের মধ্যে যে 'এ টি পি' এক ধাপেই তৈরি হয় তা নয়। কিছুটা শক্তি সংগ্রহ করে প্রথমে তৈরি হয় একটি যৌগ। এই যৌগটি আবার কিছুটা শক্তি সংগ্রহ করে তৈরি করে আর এক ধরনের যৌগ। এবং এইভাবে চলতে চলতে অবশেষে তৈরি হয় 'এ টি পি'। মুশকিল এই যুক্তির দিক দিয়ে কথাটা গ্রহণযোগ্য হলেও মাঝামাঝি পর্যায়ের ওই সব যৌগ 'চিহ্নিত' অথবা 'সংগ্রহ' করা সম্ভব হয়নি।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬১ সালে ডঃ পিটার মিচেল উপস্থাপিত করলেন নতুন একটি তত্ত্ব। কেমিঅসমোসিক তত্ত্ব'। সেই সঙ্গে তৈরি করলেন নতুন একটি শব্দ 'প্রোটিসিটি'।

ব্যাপারটা এই। ধরুন, একটি পাত্র নিলেন। সেই পাত্রের মাঝখানে বসিয়ে দেওয়া হলো একটি পর্দা। যাতে আছে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য ছিদ্র। পর্দাটি পাত্রের মধ্যে পাঁচিলের মত দাঁড়িয়ে রইলো। তার দু পাশে তৈরি হলো দুটি কক্ষ। এবার ওই কক্ষ দুটির মধ্যে রাখলেন দুটি দ্রবণ। ধরুন, দুটিই চিনি গোলা জল। তবে একটি কক্ষের দ্রবণে চিনির পরিমাণ বেশী বলে তার ঘনত্ব বেশী। অপর কক্ষের দ্রবণে চিনির পরিমাণ কম। তাই তার ঘনত্বও কম। দ্রবণ দুটি ওই অবস্থায় কিছুক্ষণ রেখে দিন। এক সময় দেখবেন, দুটি কক্ষের দ্রবণের ঘনত্ব সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কক্ষটিতে কম ঘনত্বের দ্রবণ ছিল সেখান থেকে খানিকটা দ্রাবক (এ ক্ষেত্রে জল) ওই পর্দার মধ্যে দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবাহিত হয়ে পাশের কক্ষে ঢুকে সেই কক্ষে দ্রবণের ঘনত্ব কমিয়ে দেওয়ার ফলেই এমনটি হয়েছে। এইভাবে সূক্ষ্মাতম ছিদ্র বিশিষ্ট পর্দার ভেতর দিয়ে কম ঘনত্ব বিশিষ্ট দ্রবণের দ্রাবকের বেশী ঘনত্বের দ্রবণের দিকে যাওয়াকেই বলা হয় 'অভিস্রাবণ'। ইংরেজীতে 'অসমোসিস'। লক্ষ্য করুন, এ ক্ষেত্রে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় নি।

কিন্তু এমন যদি হয়, ওই পাত্রের একটি কক্ষের দ্রবণে ঘটানো হল রাসায়নিক বিক্রিয়া। সেই রাসায়নিক বিক্রিয়ার দরুন ওই দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়নের সংখ্যা গেল বেড়ে। উভয় দ্রবণের হাইড্রোজেন আয়নের মাত্রা যাতে সমান অবস্থায় দাঁড়ায়, তার জন্যে কিছুটা হাইড্রোজেন আয়ন তখন অভিস্রাবণ পদ্ধতিতে পাশের কক্ষে প্রবাহিত হবে। এ ধরনের পদ্ধতিকেই বলা হয় 'কেমিঅসমোসিস'। এর ওপর নির্ভর করে 'এটিপি' তৈরি হওয়ার ব্যাপারে ডঃ পিটার মিচেল যে তত্ত্বটি তৈরি করেছেন, তারই নাম দেওয়া হয়েছে 'কেমিঅসমোটিক' তত্ত্ব।

কীভাবে 'এটিপি' তৈরি হয়?

ধরা যাক, মাইটোকনড্রিয়ার কথা। এরা জীবাণুরই মত এক ধরনের বস্তু কণা। থাকে জীব-কোষের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে। জীব-কোষের মত এদেরও থাকে কোষ-প্রাচীর। একটি বাইরে, অপরটি ভেতরে। ভেতরের অংশে থাকে দ্রবণ। সেই দ্রবণের মধ্যে থাকে নানা রকম রাসায়নিক যৌগ এবং খনিজ পদার্থ।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম। মাইটোকনড্রিয়ার ভেতরে দ্রবণ। আবার বাইরেও দ্রবণ (কারণ তারা ডুবে রয়েছে সাইটোপ্লাজমের রসের মধ্যে)। আর ওই উভয় দ্রবণের মাঝখানে রইলো মাইটোকনড্রিয়ার কোষ-প্রাচীর। যা সচ্ছিদ্র পর্দার মতই কাজ করে। জীব-রাসায়নিক পদ্ধতিতে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে তৈরি হলো অতিরিক্ত হাইড্রোজেন আয়ন বা প্রোটন। এর ফলে পাঁচিলের বাইরের এবং ভেতরের দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়নের মাত্রায় তারতম্য ঘটবে। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সাইটোপ্লাজমের মধ্যে যে শক্তি নির্গত হয় সেই শক্তির সাহায্যে ওই প্রোটন তখন পাঁচিলের মধ্যে দিয়ে

গিয়ে উপস্থিত হবে পাঁচিলের ওপারে। সেখানে থাকে অ্যাডেনোসিন ডাইফসফেট (ADP) নামে এ ধরনের যৌগ। থাকে খনিজ ফসফরাস।

এবং অতঃপর যে রাসায়নিক বিক্রিয়াটি হবে সেটা দাঁড়াবে এই রকম ঃ

ADP+P (ফসফরাস)+শক্তি ATP+জল

বলা বাহুল্য, প্রোটন পাঁচিলের ওপার থেকে যে শক্তি বহন করে এনেছে সেই শক্তিই শেষ পর্যন্ত ATPর মধ্যে সংরক্ষিক অবস্থায় থাকবে। যে শক্তির প্রভাবে পাঁচিলের মধ্যে দিয়ে প্রোটন প্রবাহিত হয়, তাকে বলা হয় প্রোটন মোটিভ ফোর্স।

ডঃ মিচেল বলেছেন, অন্তর্বর্তী কোন অস্থায়ী যৌগ নয়। আসলে কোষপ্রাচীরের দু পাশে রাসায়নিক বিক্রিয়ার দরুন যে প্রোটনবিভবের (তড়িৎ বিভবেরই অনুরূপ) পার্থক্য ঘটে সেটাই বরং ওই অন্তর্বর্তী যৌগের মত কাজ করে।

ডঃ মিচেল তাঁর তত্ত্বটি প্রমাণ করার জন্যে মাইটোকনড্রিয়া নয়, প্রথমে পরীক্ষা চালিয়ে ছিলেন মাইক্রোককাস লাইসোডিকটিকাস (Micrococus Lysodeikticus) নামের এক ধরনের ব্যাক্টেরিয়ার ওপর। তখন তাঁর সহকারী ছিলেন রবার্ট রীড। এই পরীক্ষায় তিনি সত্য বলে প্রমাণিত হন। পরে আরও কয়েকজন তত্ত্বটি পরীক্ষা করে তাঁকে সমর্থন করেছেন।

নোবেল পুরস্কারের সংবাদ ঘোষিত হওয়ার পর তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ঃ বলুন, কেমন লাগছে?

ধীর, অত্যন্ত বিনয়ী এবং সাবধানী স্বভাব ডঃ মিচেলের উত্তর ঃ আমি অবাকই হয়েছি। আসলে সম্মানে আমার আস্থা কম। ঠিক 'দাঁড়িয়ে যাওয়া' বলতে যাকে বোঝায়, আমি নিজে তেমন পর্যায়ে পড়ি না।

১৯৭৫-এ তাঁর এই কাজ সম্পর্কে লেখার জন্যে তাঁর দুই সতীর্থ তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন। ডঃ মিচেল তাঁদের বলেন, দাঁড়ান। এখন কী? আমার ওপর অবিচুয়ারি লেখার সময় কি এসে গেল?

আসলে তিনি কী বলতে চেয়েছিলেন, জানি না। অত্যন্ত প্রচারবিমুখ বলেই হয়তো এসব কথা বলেছেন। তবে পর্যবেক্ষকদের মতে, তাঁর অবদান 'বাইও এনার্জেটিকস'-এর ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের ঘটনা।

শারীর এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান

১৯৬০-এর দশকের ঘটনা। ব্যাকটেরিয়ার উপর ভাইরাসের প্রতিক্রিয়া কী, সেটা পরীক্ষা করার জন্যে তৎপর হয়ে উঠলেন সুইজারল্যাণ্ডের বাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক গবেষক। তিনি জানতেন, কিছু কিছু ভাইরাস আছে, যারা কোন ব্যাকটেরিয়ার শরীরে প্রবেশ করে, কিছুক্ষণের জন্যে সেখানে বাস করে, আবার চলে যায়। এ ধরনের ভাইরাসকে বলা হয় প্যাসেঞ্জার ভাইরাস। মূলতঃ, এরা ব্যাকটেরিয়ার কোন ক্ষতি করে না। আর এক ধরনের ভাইরাস আছে, যাদের ভূমিকা আক্রমণাত্মক। তারা

ব্যাকটেরিয়ার শরীরে শুধু প্রবেশই করে না, তাদের ধ্বংসও করে। কোন কোন রোগ জীবাণুর আক্রমণে যে ঘটনা আমাদের জীবনেও ঘটে, সেই রকম ; এ ছাড়া আছে তৃতীয় এক শ্রেণীর ভাইরাস, এই সব ভাইরাস কোন কোন ব্যাকটেরিয়ার দেহে ঢুকলে নিজেরাই সাবাড় হয়ে যায়।

ভদ্রলোক পরীক্ষা শুরু করলেন এক শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়া নিয়ে। নাম ই কোলি। এই ব্যাকটেরিয়া আমাদের খাদ্যনালীর মধ্যেই পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে।

তিনি দেখলেন, কোন কোন জাতের ই কোলির ওপর কোন কোন ভাইরাস কোন আক্রমণাত্মক ভূমিকাই নিতে পারে না। বরং, ই কোলির মধ্যে ঢুকলে তারা নিজেরাই খতম হয়।

ভাইরাসের মূল উপাদান বলতে দুটি। একটি 'ডি এন এ' অণু। আর সেই অণুকে ঘিরে অবস্থান করে চর্বি জাতীয় পদার্থ। ভদ্রলোক জানতেন ভাইরাস যখন কোন ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে, তখন তার ওই 'ডি এন এ' গিয়ে ঢোকে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে। এবং ঢোকার পর ব্যাকটেরিয়ার 'ডি এন এ' অণুকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। যার ফলে ব্যাকটেরিরা আর বেঁচে থাকতে পারে না। কিন্তু এবার পেলেন নতুন অভিজ্ঞতা। তিনি দেখলেন বিশেষ জাতের ই কোলিকে ভাইরাস কিছুই করতে পারছে না। বরং ওই ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ঢোকার পর তাদের 'ডি এন এ'-ই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

নিজেকে তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারেন না। ভাবলেন, ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার 'ডি এন এ' পারস্পরিক বিক্রিয়া করে যে সব রাসায়নিক যোগ তৈরি করছে হতেও তো পারে তাদের তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। এমনও হতে পারে, ভাইরাস নয়, অন্য কোন কিছু এই কাজটি চালাচ্ছে। যদি এমনও হয় ভাইরাসই খতম হচ্ছে, তা হলেও দেখা দরকার, ঠিক কোন কোন ভাইরাসে বলি হচ্ছে এখানে। তাদের চেনা দরকার। আর এ কথাটি ভাবার পরই, তিনি ভাইরাসের 'ডি এন এ'র সঙ্গে জুড়ে দিলেন তেজস্ক্রিয় পরমাণু। পাঁচটা ভেড়ার মধ্যে আমারটা কোনটা সেটা জানার জন্যে যেমন তার গায়ে কালি দিয়ে একটা দাগ কেটে দেওয়া হয়, ব্যাপারটা কতকটা সেই রকম দাঁড়াল।

এবার তেজস্ক্রিয় পরমাণু লাগানো ভাইরাস দিয়ে আক্রমণ করা হলো ব্যাকটেরিয়াকে। হ্যাঁ, যা ভেবেছিলেন, ঠিক তাই। ভাইরাস সাবাড়। পরিবর্তে ব্যাকটেরিয়ার দেহের মধ্যে পাওয়া গেল কতকগুলি ছিন্নভিন্ন রাসায়নিক যোগ। তাদের সঙ্গে জোড়া তেজস্ক্রিয় অণু। তার মানে ভাইরাসের 'ডি এন এ' খণ্ডিত হয়ে গেছে।

কিন্তু ব্যাপারটা কি? এমন ঘটনা ঘটলই বা কীভাবে? ব্যাকটেরিয়া 'ডি এন এ' বেশ বহাল তবিয়তে রইল, অথচ যে আক্রমণকারী সেই খতম হয়ে গেল?

ভদ্রলোক দাঁড় করালেন একটি নতুন তত্ত্ব। এই তত্ত্বে বলা হলো এক ধরনের 'এনজাইম'-ই এর জন্যে দায়ী। আর এই 'এনজাইম' থাকে অথবা উৎপন্ন হয়, ওই ব্যাকটেরিয়ারই মধ্যে। ভাইরাস 'ডি এন এ' যখন তাকে আক্রমণ করে, তখন এই

এনজাইম রাসায়নিক বিক্রিয়া করে তার 'ডি এন এ' অণুটি ভেঙ্গে দেয় বলেই, ওই ভাইরাস ওইভাবে সাবাড় হয়।

প্রশ্ন দাঁড়াল তাই যদি হয়, ওই 'এনজাইম' ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে থেকেও তার নিজস্ব 'ডি এন এ'কে ভাঙ্গছে না কেন ?

ভদ্রলোক বললেন, এনজাইমটির অণুকে ব্যাকটেরিয়া এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যাতে করে ওই 'এনজাইম' তার নিজের 'ডি এন এ'কে খণ্ডিত করতে পারে না, কিন্তু আক্রমণকারী ভাইরাসের ক্ষতি করতে পারে। ধরুন, ভাইরাসটির 'ডি এন এ'র একটি বিশেষ অংশ কাটতে হবে। সেই অংশটি চিনে নিয়ে ওই এনজাইম যাতে কাটার কাজটি সারতে পারে ব্যাকটেরিয়া সেইভাবেই তাকে তৈরি করে দেয়। ভদ্রলোক এই ধরনের 'এনজাইমে'র নাম রাখলেন 'রেসট্রিকশন এনজাইম'। উল্লেখ্য 'এনজাইম' এক শ্রেণীর জীব রাসায়নিক যৌগ, যারা মধ্যস্থ অনুঘটক বা ক্যাটালিস্ট হিসেবে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে।

তিনি অর্থাৎ ওই ভদ্রলোক, নাম ডঃ ভারনার আরবের। বয়েস ৪৯। ব্যাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবাইওলজি বিভাগের অধ্যাপক।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অসামান্য গবেষণার জন্যে ক্যারোলিনসকা ইনস্টিটিউট এ বছর যে তিন জনকে মিলিতভাবে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন, ডঃ আরবের তাঁদের অন্যতম। বাকি দুজন হলেন মার্কিন বিজ্ঞানী। ডঃ ডানিয়েল নাথানস, ৪৯ এবং ডঃ হ্যামিলটন স্মিথ, ৪৭। দু জনই বাল্টিমোরের জনহপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী। তাঁরাও মাইক্রোবাইওলজিস্ট।

স্মিথ এক সময়ে মার্কিন নৌবিভাগে মেডিক্যাল অফিসারের কাজ করতেন। এবং মার্কিন স্বাস্থ্য বিভাগের সদস্য। পরে 'জেনেটিক' নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। আর এই গবেষণা করতে করতেই ১৯৭০ সালে প্রকাশ করলেন দুটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা-পত্র। এই গবেষণা-পত্রে একটি 'রেসট্রিকশন এনজাইম' আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করা হয়। স্মিথ এই এনজাইমটি আবিষ্কার করেছেন হেমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা' নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে। ওই ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে এটি প্রস্তুত হয়। এবং এই এনজাইম আক্রমণকারী ভাইরাসের 'ডি এন এ'কে খণ্ড খণ্ড করে কেটে দিতে পারে। স্মিথের গবেষণার সব চাইতে উল্লেখযোগ্য দিকটি হলো, তিনি দেখিয়েছেন, এক একটি 'রেসট্রিকশন এনজাইম' ডি এন এ-এর এক একটি অংশেই শুধু প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা রাখে। এ পর্যন্ত একশটি 'রেসট্রিকশন এনজাইম' আবিষ্কৃত হয়েছে।

ডঃ নাথানস ডঃ স্মিথের সতীর্থ। নাথানস স্মিথের আবিষ্কৃত 'রেসট্রিকশন এনজাইম'-এর সাহায্য নিয়ে পরীক্ষা চালান এক ধরনের ভাইরাসের ওপর। যার নাম SV40। এই ভাইরাস তিনি সংগ্রহ করেন বানরের দেহ থেকে। অনেকের ধারণা এই ভাইরাস প্রাণিদেহে ক্যানসার সৃষ্টি করে। তবে প্রাণীদের মধ্যে ব্যতিক্রম শুধু মানুষ। এরা মানুষের কোন ক্ষতি করে না। স্মিথের আবিষ্কৃত 'রেসট্রিকশন এনজাইমে'র সাহায্যে নাথানস SV40 ভাইরাসকে এগারোটি নির্দিষ্ট খণ্ডে বিভক্ত করতে

সমর্থ হন। সেটা ১৯৭১ সালের ঘটনা। এর দুই বছর পর ওই ধরনের আরও দুটি
এনজাইমের সাহায্যেও ওইভাবে তিনি SV40 ভাইরাসকে টুকরো করেছিলেন। এবং
এইভাবে ওই ভাইরাসের 'ডি এন এ'র গঠনবৈচিত্র্যের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরেন।
ইংরেজীতে যাকে এখন বলা হচ্ছে 'ডি এন এ ম্যাপিং।' পরে বিভিন্ন বিজ্ঞানী নাথানসের
এই পদ্ধতিটির সাহায্য নিয়ে আরও জটিল 'ডি এন এ'র 'ম্যাপ' তৈরি করেছেন।

এই গবেষণার ফলাফল অদূর ভবিষ্যতে রোগ নিরাময় বা শারীরবৃত্তীয় ত্রুটি দূর
করার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করবে বলে অনেকে মনে করছেন। কারণ শরীরের
গঠন থেকে শুরু করে তার যাবতীয় কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে 'জিন'। 'ডি এন এ'
তৈরি হয় জিনের সমন্বয়ে। এখন 'ডি এন এ'র যদি ম্যাপ তৈরি করা সম্ভব হয় তা
হলে জানা যাবে কোন জিনটি 'ডি এন এ'র কোথায় অবস্থান করছে। এবং তাদের
মধ্যে কোনটি স্বাভাবিক, কোনটি স্বাভাবিক নয়। যদি দেখা যায় সেখানে
অস্বাভাবিক কোন জিন রয়েছে, তা হলে 'রেসট্রিকশন এনজাইমে'র সাহায্যে সেই জিনটি
'ডি এন এ' থেকে ছেঁটে বাদ দেওয়া যাবে। এবং অন্য কোন ডি এন এ থেকে ওই
ধরনের গঠনবিশিষ্ট 'জিন' সংগ্রহ করে 'ডি এন এ-লাইগেজ' নামক এক ধরনের
এনজাইমের সাহায্যে সেখানে জুড়ে দেওয়া যাবে। সম্প্রতি কয়েকজন গবেষক এই
পদ্ধতিতে 'ই কোলি' নামক ব্যাকটেরিয়ার 'ডি এন এ'র মধ্যে জিন বসিয়ে ওই
ব্যাকটেরিয়া থেকে এক ধরনের হরমোন উৎপাদন করতে সমর্থ হয়েছেন। হরমোনটির
নাম 'সোমাটোসটাটিন'। এই হরমোন স্তন্যপায়ী প্রাণীর মস্তিষ্কে ক্ষরিত হয়।
বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এইভাবে হরমোন উৎপাদনের ব্যবস্থা করে ভবিষ্যতে অনেক
মানসিক রোগ সারিয়ে তোলা যাবে। কয়েকমাস আগে ওই একই পদ্ধতিতে 'ই
কোলির মধ্যে 'ইনস্যুলিন' উৎপাদনকারী জিন স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। অনেকের
ধারণা এতে ভবিষ্যতে যথেষ্ট ইনস্যুলিন' উৎপাদন করা যাবে। তখন 'বহুমূত্র রোগ
সারানো সহজতর হবে।'

ডঃ আরবের এখন বাসেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইক্রোবাইওলজি বিভাগের অধ্যাপক।
১৯৫৮-৫৯ সালে সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক হিসেবে কাজ করেন।
১৯৭০-৭৭ বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মলেক্যুলার বাইওলজির ভিজিটিং
ইনভেসটিগেটার হিসেবেও কাজ করেছেন।

ডঃ নাথানস এখন জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবাইওলজি বিভাগের
ডিরেকটর। ১৯৬৯ সালে অ্যামেরিকান ক্যানসার সোসাইটির গবেষক হিসেবে তিনি
ইজরাইলের ভাইজমান ইনসটিটিউট অব সায়েন্সেও গবেষণা চালান।

নোবেল পুরস্কার পেয়ে নাথানস খুশী। তাঁর মন্তব্য : আমি খুশি কারণ এই
পুরস্কার একই সঙ্গে আমার সতীর্থ স্মিথও পেলেন। আর পেলেন আরবের, যিনি
আমাদের গবেষণার আসল ভূমিটি তৈরি করে দিয়েছেন।



নোবেল পুরস্কার ১৯৭৯

পদার্থ বিজ্ঞান

খবরটি স্টকহোম থেকে প্রচারিত হয় সোমবার, ১৫ অকটোবর ১৯৭৯। সংবাদে বলা হয়, পদার্থবিজ্ঞানে অসামান্য গবেষণার জন্যে রয়াল সুইডিস অ্যাকাডেমি অভ সায়ান্সেস এ বছর তিনজন বিজ্ঞানীকে সমবেতভাবে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। এই তিন বিজ্ঞানী পাকিস্তানের অধ্যাপক আবদাস সালাম (৫৩), অধ্যাপক স্টিভেন ভিনবার্গ (৪৬) এবং অধ্যাপক শেলডন এল গ্ল্যাশো (৪৬)। নোবেল কমিটির মন্তব্য ঃ "পরমাণুর কেন্দ্রে যে 'উইক ফোর্স' বা দুর্বল বল সক্রিয় অবস্থায় দেখা যায় তার চরিত্র যে তড়িৎ-চৌম্বক বলেরই মত—সালাম, ভিনবার্গ এবং গ্ল্যাশো সেটাই বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন তাঁদের তত্ত্বে। পদার্থ বিজ্ঞানে যে চারটে মৌলিক ক্ষেত্রের কথা বলা হয়ে থাকে তাদের একীকৃত করার ব্যাপারে এই তত্ত্ব এক বলিষ্ঠতম পদক্ষেপ। এ কার্জটির জন্যে আইনস্টাইন দীর্ঘ তিরিশ বছর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সফল হতে পারেননি।"

প্রসঙ্গ ঃ ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরি বা একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্ব।

সালামের লেখাপড়া ইংলণ্ডের কেমব্রিজে। ১৯৫৭ সাল থেকে তিনি লণ্ডনের ইমপিরিয়াল কলেজ অভ্ সায়ান্সেস এবং টেকনলজির তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক পদে বৃত রয়েছেন। এ ছাড়াও ইটালির ত্রিয়েস্তেতে অবস্থিত ইনটারন্যাশনাল সেণ্টার অভ থিওরেটিক্যাল ফিজিকস-এর তিনি ডিরেকটর। পৃথিবীর বিশিষ্টতম এই গবেষণাকেন্দ্রটি তাঁরই উদ্যোগে গড়ে উঠেছে।

গ্ল্যাশো ১৯৬৭ সাল থেকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে কাজ করছেন। ১৯৫৯ সালে এখান থেকেই তিনি ডক্টরেট হন। ভিনবার্গ ডকটরেট হন প্রিন্সটন থেকে ১৯৫৭ সালে। ১৯৭৩ থেকে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হিগ্‌গিনস অধ্যাপক।

নোবেল কমিটির বক্তব্য, বিচারকমণ্ডলীর এবার দৃষ্টি গিয়ে পড়েছিল নিউট্রাল

কারেণ্ট' বা নিরপেক্ষ প্রবাহের উপর। ১৯৬০-র দশকে এই 'নিউট্রাল কারেণ্টে'র অস্তিত্ব প্রথম প্রমাণ করেন সালাম এবং ভিনবার্গ। তাঁদের এই তত্ত্বের পরীক্ষালব্ধ প্রমাণের জন্য যে ধরনের যন্ত্রপাতি দরকার সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন গ্যাশো। কাজটি তিনি স্বাধীনভাবেই করেছেন। অতএব তিনিও পুরস্কারের উপযুক্ত।

কী এই 'নিউট্রাল কারেণ্ট'? 'ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরি' বা একীকৃত ক্ষেত্র তত্ত্বের সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কী?

পদার্থবিজ্ঞানীরা মনে করেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ বস্তুকণা থেকে শুরু করে গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির সৃষ্টি, রূপান্তর এবং কার্যকারণের মূলে রয়েছে চার রকম মৌলিক বল বা শক্তি। মাধ্যাকর্ষণ, উইকফোর্স বা দুর্বল বল, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বা তড়িৎ-চৌম্বক বল এবং স্ট্রংফোর্স বা প্রবল বল। এই চারটি বলের মধ্যে দুটি বলের সঙ্গে কিন্তু সবাই আমরা পরিচিত। এরা মাধ্যাকর্ষণ বল এবং তড়িৎ-চৌম্বক বল। মাধ্যাকর্ষণ বল আছে বলেই তার প্রভাবে চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে পরিক্রমণ করে, সৌরমণ্ডলের তাবৎ গ্রহ পরিক্রমণ করছে সূর্যের চারপাশে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ নক্ষত্র, ধূমকেতু থেকে শুরু করে সমুদ্রের বুকে জোয়ার-ভাটা, 'বৃন্তচ্যুত ফলে'র পতন-এর সমস্তই নিয়ন্ত্রণ করে মাধ্যাকর্ষণ বল। গ্রহ নক্ষত্রের পরিক্রমণের কথা ভাবলে মনে হয়, মাধ্যাকর্ষণের ক্ষমতা কত প্রচণ্ড। কিন্তু মজার ব্যাপার এই, মাধ্যাকর্ষণের ক্ষমতা বাকি তিনটি বলের চেয়ে অনেক কম। বিশেষ করে পারমাণবিক কণা বা সাব-অ্যাটমিক পারটিকেলসের ক্ষেত্রে তো বটেই। যেমন ধরা যাক প্রোটন। প্রোটন একটি পারমাণবিক কণা। থাকে যে কোন পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে। একটি প্রোটনের ভর ১.৭×১০^{-২৭} কিলোগ্রাম। এমন অকিঞ্চিৎকর ভর সমন্বিত দুটি প্রোটনকে যদি কাছাকাছি আনা যায়, দেখা যাবে তাদের মধ্যে যে মহাকর্ষ বল কাজ করছে তার পরিমাণ অকল্পনীয় রকম নগণ্য।

তৃতীয় তড়িৎ-চৌম্বক বলের ক্ষমতা অনেক বেশী। এই বলটির সঙ্গেও কিন্তু অনেকে পরিচিত। যেমন, উদাহরণ স্বরূপ একটি ধাতব তারের কথা ধরুন। ধাতু মাত্রই বিদ্যুৎ পরিবাহী। এখন এই তারটি একটি কম্পাসের কাছাকাছি রেখে তারটির মধ্যে দিয়ে যদি বিদ্যুৎশক্তি প্রবাহিত করা হয়, দেখা যাবে কম্পাসটির কাঁটা একপাশে সরে যাবে। ব্যাপারটা যেন, যে মুহূর্তে ওই পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎশক্তি প্রবাহিত হলো, পরিবাহীর সান্নিধ্যে তৈরি হলো একটি চৌম্বক ক্ষেত্র। এই চৌম্বকক্ষেত্রই কম্পাসের চুম্বক কাঁটাটিকে একপাশে সরে যেতে বাধ্য করেছে। বলা বাহুল্য, ধাতব তারটির মধ্যে বিদ্যুৎশক্তি প্রবাহিত না করে তারটির সান্নিধ্যে যদি একটি চুম্বককে আন্দোলিত করা হয়, সে ক্ষেত্রে দেখা যাবে তারটির মধ্যে বিদ্যুৎশক্তি ধরা পড়েছে। ম্যাকসওয়েল প্রমাণ করলেন, তড়িৎক্ষেত্র এবং চৌম্বকক্ষেত্র পরস্পর কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং তারা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিদ্যুৎ এবং চৌম্বকশক্তির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার দরুন এক ধরনের বলের সৃষ্টি হয়। এই বলকেই বলা হয়

ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স বা তড়িৎ-চৌম্বক বল। বেতার তরঙ্গ অথবা আলোক সৃষ্টির পেছনে এই বলটিই কাজ করে।

স্ট্রংফোর্স বা প্রবল বলের ব্যাপারটা কিন্তু মহাকর্ষ বা তড়িৎ-চৌম্বক বলের মত প্রাত্যাহিক অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। এই বলটির অস্তিত্ব একমাত্র পরমাণুর নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে ধরা পড়ে। নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন। নিউট্রন বিদ্যুৎনিরপেক্ষ কণা। কিন্তু প্রোটন তো তা নয়। প্রোটনের মধ্যে থাকে পজিটিভ বিদ্যুৎ চার্জ বা আধান। যার অর্থ এক একটি প্রোটনকে ঘিরে অবস্থান করছে তড়িৎচৌম্বক বল। এবং যেহেতু নিউক্লিয়াসের মধ্যে একাধিক প্রোটন অবস্থান করে (হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস ছাড়া, হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসে থাকে একটি মাত্র প্রোটন) এবং যেহেতু বৈদ্যুতিক গুণাগুণের দিক দিয়ে তারা সমধর্মী, অতএব তাদের পারস্পরিক বিকর্ষণ হওয়ার কথা। আর তার ফলে কোন নিউক্লিয়াসের মধ্যে একাধিক প্রোটন থাকা সম্ভব নয়।

কিন্তু বাস্তবে এর ব্যতিক্রমটাই চোখে পড়ে। প্রোটন কণাগুলি বিকর্ষণ বল উপেক্ষা করে নিউক্লিয়াসের মধ্যে বাস করে। ব্যাপারটা যেন, তারা পরস্পর পরস্পর থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে চাইলেও অপর কোন একটি বল প্রচণ্ড শক্তিতে তাদের সংবদ্ধ অবস্থায় রেখে দেয়। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বলের তুলনায় যার ক্ষমতা এক হাজার গুণ বেশী। এই বলকেই বলা হয় স্ট্রংফোর্স বা প্রবল বল। প্রবল বলের প্রভাবে পড়ে প্রোটন এবং নিউট্রন কণাগুলি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে আটকে থাকে।

তুলনায় উইকফোর্স বা দুর্বল বলের ভূমিকাটি ভিন্ন ধরনের। এই বলটির প্রতিক্রিয়ার দরুন মৌলকণা কিছুটা শক্তি ক্ষরণ করে স্থায়ী বা স্থিতিশীল মৌলকণায় রূপান্তরিত হয়।

এবার প্রশ্নটি দাঁড়াচ্ছে এই রকম। যখনই আমরা কোন বলের কথা বলি, সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথাও এসে পড়ে। সেই বলের প্রভাব থাকে একটি গণ্ডীর মধ্যে। অথবা বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে। ওই গণ্ডী বা অঞ্চলকেই বলা হয় বলের ক্ষেত্র বা ফিল্ড। মাধ্যাকর্ষণের বেলায় এই ক্ষেত্রকে বলা হয় গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড বা মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র এবং অনুরূপভাবে দুর্বল, প্রবল এবং তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের নাম করা যেতে পারে। আইনস্টাইন থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে মৌলকণা পদার্থবিজ্ঞানীরা এই চারটি ক্ষেত্রের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে আসছেন। তাঁদের মূল লক্ষ্য এমন একটি তত্ত্ব দাঁড় করানো, যে তত্ত্ব এটাই প্রমাণ করবে, বাস্তবে মাধ্যাকর্ষণ, দুর্বল, প্রবল এবং তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রকে পৃথক পৃথক সত্তা হিসেবে মনে হলেও আসলে তারা একই সত্তার বহুমুখী প্রকাশ (এক্ষেত্রে চার)। দার্শনিকের ভাষায় বলা যেতে পারে 'নির্বাণ' অবস্থা। বিজ্ঞানীরা সেই পরম তত্ত্বটিরই নাম দিয়েছেন 'ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরি' বা একীকৃত ক্ষেত্র তত্ত্ব।

প্রশ্ন এই, এই পরমতত্ত্বটি দাঁড় করানোর ব্যাপারে এ পর্যন্ত কতটা এগোতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা ?

যে কয়টি বলের কথা বললাম, তাদের সবক'টির সঙ্গে সবক'টির সমন্বয় সাধন করা অবশ্য এ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। একমাত্র তড়িৎ-চৌম্বক এবং দুর্বল বল ছাড়া। আর এ কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন সালাম এবং ভিনবার্গ।

১৯৬৩ সালে সালাম এবং ভিনবার্গ এককভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তড়িৎ-চৌম্বক প্রতিক্রিয়া (ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইনটারঅ্যাকশন) এবং দুর্বল প্রতিক্রিয়া (উইক ইনটারঅ্যাকশন) একই বলসূত্রের দুটি পৃথক দিক। তাঁদের এই সিদ্ধান্ত গোড়ার দিকে বিতর্ক সৃষ্টি করলেও পরে উটরেখ্‌ট্‌ গবেষণাগারের গেরহার্ড টি'হুফট এবং নিউইয়র্কের স্টোনিব্রুক গবেষণাগারের বেঞ্জামিন ডব্লু, লী দেখালেন ওই সিদ্ধান্ত সমর্থনযোগ্য।

ভিনবার্গের তত্ত্বে বলা হলো ঃ উইক্‌ ইনটার অ্যাকশনের সময় মৌলকণা থেকে শক্তির যে ক্ষরণ ঘটে (বিটা রশ্মি হিসেবে ; আসলে এই বিটা রশ্মি হলো ইলেকট্রন কণা), একমাত্র চার্জ কারেন্টের মাধ্যমেই তার প্রকাশ সীমাবদ্ধ নয়। এক্ষেত্রে আরও এক ধরনের প্রবাহ প্রকট হতে পারে, যাকে বলা যায় 'নিউট্রাল কারেন্ট'।

ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই ঃ উইক ইনটারঅ্যাকশনের সময় মৌলকণা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে বিটা রশ্মি অর্থাৎ ঋণাত্মক তড়িৎ আধান—ইলেকট্রন। এই ইলেকট্রন যে তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করবে তাকে বলা হলো 'চার্জড কারেন্ট'। আবার ওই একই সময় আর এক ধরনের কণার প্রবাহ দেখা দিতে পারে। এই কণা তড়িৎ-নিরপেক্ষ বা ইলেকট্রিকালী নিউট্রাল। এ ধরনের প্রবাহকেই বলা হচ্ছে 'নিউট্রাল কারেন্ট'।

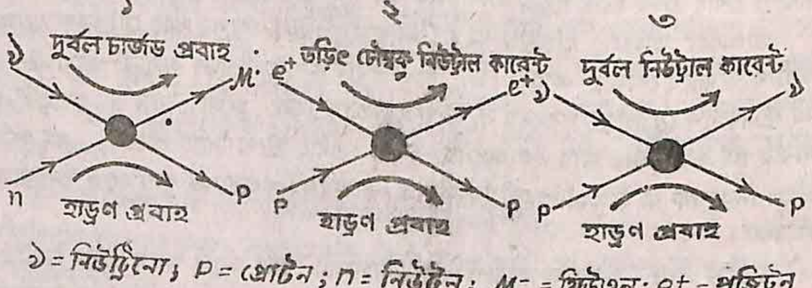
'চার্জড' এবং 'নিউট্রাল কারেন্ট'-এর ব্যাপারটা বিশদ করার আগে 'উইক ইনটার-অ্যাকশন' সম্পর্কে আরও দুই একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। এ প্রসঙ্গে পারমাণবিক কণার তেজস্ক্রিয় ক্ষরণ বা 'রেডিওঅ্যাকটিভিটিকে' নিয়ে কথা বলা যেতে পারে। যেমন ধরুন প্রোটন। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকে প্রোটন। কখনও কখনও নিউক্লিয়াসের একটি প্রোটন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে যায়। ভেঙে গিয়ে সৃষ্টি করে একটি নিউট্রন, একটি পজিট্রন এবং একটি নিউট্রিনো। উল্লেখ করা যেতে পারে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে ব্যাপারটা অসম্ভব। কারণ নিউট্রনের ভর প্রোটনের ভরের চেয়ে বেশী। যদি তাই হয়, তা হলে কম ভরের বস্তু দিয়ে বেশি ভরের বস্তু সৃষ্টি করা কী করে সম্ভব ? আসলে এক্ষেত্রে যা হয়, সেটা হলো এই ঃ প্রোটন থেকে নিউট্রন তৈরি হওয়ার সময় নিউক্লিয়াসের ভেতরের 'প্রবল বল' বা স্ট্রংফোর্সের (শক্তি) কিছুটা অংশ ভরে রূপান্তরিত হয়। প্রোটন ভেঙে যাওয়ার পর অতিরিক্ত যেটুকু ভর সৃষ্টি হয়ে থাকে, ওই রূপান্তরিত ভরই তার কারণ।

যাই হোক, এই বিক্রিয়ায় দুই শ্রেণীর পারমাণবিক কণার সাক্ষাৎ মেলে। এদের একটি শ্রেণীর নাম 'হ্যাড্রন্‌স'। নিউট্রন প্রোটন থেকে শুরু করে পাই-মেসনস্‌ কে-

মেসনস্ এবং আরও নানা রকম মৌল কণা এই শ্রেণীর অন্তর্গত এই সব কণার উপর তড়িৎ-চৌম্বক অথবা দুর্বল বলের কোন প্রভাব নেই বললেই চলে। অপর শ্রেণীটির নাম 'লেপটন্‌স'। এর মধ্যে পড়ে ইলেকট্রন, নিউট্রিনো এবং তার প্রতিবস্তু কণা বা অ্যান্টিপার্টিকল্‌স এবং মিউওন। 'লেপটনস' শ্রেণীর কণারা আবার প্রবল বল বা স্ট্রং ফোর্সের সঙ্গে একেবারেই কোন প্রতিক্রিয়া করে না।

যেমন ধরুন, বেশ পুরু একটি ধাতু বা কংক্রিটের ব্লক নেওয়া হলো। এই ব্লকের এক পাশে হ্যাড্রন কণা, অর্থাৎ নিউট্রন অথবা প্রোটন দিয়ে আঘাত করুন। যেহেতু ধাতব ব্লক, অতএব তার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য পরমাণু। অর্থাৎ অগণিত প্রোটন এবং নিউট্রন। হ্যাড্রন কণাগুলি ব্লকের অভ্যন্তরে ঢুকে একের পর এক ঠিকরে পড়বে ওইসব প্রোটন এবং নিউট্রনের উপর। এবং প্রবল বলের প্রতিক্রিয়ায় ব্লকটির মধ্যে বন্দী হয়ে যাবে। ফলে ব্লকটির বিপরীত তলের বাইরে তাদের আর দেখা যাবে না।

লেপটনের ক্ষেত্রে ঘটনাটি ঘটে বিপরীত। লেপটন কণারা দেখা যাবে ব্লকটির একপ্রান্ত থেকে ঢুকে অপর প্রান্ত দিয়ে অবলীলাক্রমে বেরিয়ে যাবে। যার অর্থ, ব্লকের মধ্যেকার অগণিত নিউক্লিয়াসের প্রবল বল কোন মতেই তাদের উপর প্রতিক্রিয়া করতে



ν = নিউট্রিনো; p = প্রোটন; n = নিউট্রন; M^- = মিউওন; e^+ = পজিট্রন

[দুই রকমের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া: (এক) নিউট্রিনো এবং নিউট্রনের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় নিউট্রিনো ঋণাত্মকতড়িৎধর্মী কণা মিউওনে রূপান্তরিত হওয়ার সময় তৈরি করেছে দুর্বল চার্জড কারেন্ট। (দুই) তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রে পজিট্রন প্রোটনের সঙ্গে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া করে সৃষ্টি করেছে তড়িৎ-চৌম্বক নিউট্রাল কারেন্ট (লেপটন কারেন্ট)। আবার প্রোটন এবং নিউট্রিনোও পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে দুর্বল নিউট্রাল কারেন্ট (লেপটন কারেন্ট)।]

পারেনি। অবশ্য এক্ষেত্রে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার ওইসব লেপটন কণা যদি বিদ্যুৎ আধান বহন করে, অর্থাৎ যদি তারা 'চার্জড' কণা হয়, সেক্ষেত্রে তারা অবশ্য ব্লকের মধ্যেকার অন্যান্য আধানের (ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি) সঙ্গে তড়িৎচৌম্বক প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত থেমে পড়বে।

উইক ইনটারঅ্যাকশনের ক্ষেত্রে নিউট্রিনোর ভূমিকাটির কথা একবার ভেবে দেখা যাক। নিউট্রিনোর কোন ভর নেই, কোন আধানও নেই। প্রবল বলের সঙ্গে এই কণা কোন প্রতিক্রিয়াও করে না। যেটুকু প্রতিক্রিয়া সেটা করে একমাত্র উইকফোর্সের সঙ্গে। তারও সম্ভাবনা কম। পদার্থবিজ্ঞানীদের বক্তব্য, একটি নিউট্রিনো কণা পৃথিবীকে ১০০০০০০০০০০০০০০০ বার ভেদ করার পরও দুর্বল বলের সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকে মাত্র ৫০ শতাংশ।

১৯৭৩ সালে জেনিভার ইউরোপীয়ান নিউক্লিয়ার রিসার্চ সেন্টারের (সি ই আর এন) গবেষকরা প্রোটন-সিনকোট্রন ত্বরক যন্ত্রের সাহায্যে প্রচণ্ড শক্তিশালী নিউট্রিনো উৎপাদন করে দুর্বল বলের সান্নিধ্যে তাদের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করেছিলেন। এই পরীক্ষায় নিউট্রিনো কণাকে একখণ্ড ধাতুর উপর নির্ভর করা হয়। যাকে বলা হয় টার্গেট। ধাতুখণ্ডের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার পর একটি নিউট্রিনো একটি ইলেকট্রন অথবা একটি মিউওনে রূপান্তরিত হয়। বলা বাহুল্য, ইলেকট্রন অথবা মিউওন উভয়ই আহিত কণা বা চার্জড পারটিকলস্। অথচ নিউট্রিনো বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ কণা। অতএব বলা চলে, প্রতিক্রিয়ার সময় টার্গেট থেকে বিদ্যুৎ-আধান বা চার্জ নিউট্রিনোতে পরিবাহিত হওয়ার ফলে নিউট্রিনো ইলেকট্রন অথবা মিউওনে রূপান্তরিত হয়েছে। এ ধরনেরও বিদ্যুৎ প্রবাহকেই বলা হচ্ছে 'চার্জড কারেন্ট'। আর টার্গেটের মধ্যে নিউট্রিনোর যদি কোন পরিবর্তন না ঘটে অর্থাৎ সেখান থেকে নিউট্রিনো হিসেবেই তা বেরিয়ে আসে তখন সেই প্রতিক্রিয়াকে বলা হয় 'নিউট্রাল কারেন্ট ইনটারঅ্যাকশন'। বলাবাহুল্য নিউট্রিনোর এই প্রবাহই হলো 'নিউট্রাল কারেন্ট'।

উইক ইনটারঅ্যাকশন তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয়েছিল, চার্জড কারেন্টের' উদ্ভব হওয়াটা উইক ইনটারঅ্যাকশনের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টার-অ্যাকশনের সংগে এখানেই তার মতপার্থক্য। সালাম এবং ভিনবার্গ প্রমাণ করলেন, নিউট্রাল কারেন্টের উদ্ভব হওয়াটাও উইক ইনটারঅ্যাকশনের একটি বৈশিষ্ট্য। যে বৈশিষ্ট্যটি তড়িৎ-চৌম্বক প্রতিক্রিয়ায় ঘটে থাকে। তাঁরা তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ করেছেন তড়িৎচৌম্বক প্রতিক্রিয়া এবং দুর্বল প্রতিক্রিয়া যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

অধ্যাপক সালাম একবার মন্তব্য করেছিলেন, প্রবল বল এবং তড়িৎচৌম্বক বল। এবার থেকে দাঁড়ালে তিনটি বল। মাধ্যাকর্ষণ, প্রবল বল এতদিন ছিলো চারটি বল। মাধ্যাকর্ষণ, দুর্বল বল, এবং দুর্বল ও তড়িৎচৌম্বক মিলিয়ে একটি বল।

কী নাম দেবেন, নতুন এই বলের ?

সালামের উত্তর, জানি না, নাম একটা হবে নিশ্চয়।

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর জনৈক সাংবাদিক সালামকে প্রশ্ন করেছিলেন, কেমন মনে হচ্ছে আপনার ?

সালামের উত্তর : কী, আমার প্রতিক্রিয়া ? আমার কাছে এই পুরস্কার আল্লার অপার করুণা।

সোমবার রেডিও মারফৎ নোবেল পুরস্কারের সংবাদটি যখন গিয়ে পৌঁছলো,

অধ্যাপক ভিনবার্গ তখন দাঁড়ি কামাচ্ছেন। খবরটি শুনেই তিনি মন্তব্য করেন, সপ্তাহের শুরুটা বেশ ভালোভাবেই হলো।

অধ্যাপক গ্লাশোর প্রতিক্রিয়া ঃ এ খবর আমার কাছে অত্যন্ত রমণীয়। তবে আমি বলবো, নোবেল কমিটি আমাদের পুরস্কার দিয়ে খানিকটা ঝুঁকিই নিচ্ছেন। কারণ পরম উদ্দীপনায় সেই কণার অস্তিত্ব এখনও কিন্তু আমরা নির্ভরযোগ্যভাবে পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করতে পারিনি। তেমন কোন যন্ত্র এখন পর্যন্ত কেউ তৈরী করতে পারেননি, যা এ কাজে সাহায্য করতে পারে।

উল্লেখ্য, আপেক্ষিক কোয়ান্টামবাদ অনুযায়ী বলা হয়ে থাকে, যখনই কোন নতুন ক্ষেত্রের কথা বলা হবে, বুঝতে হবে, সেখানে থাকবে একটি নতুন "বল" বা নিউ ফোর্স এবং নতুন কণার অস্তিত্ব। এ ধরনের ক্ষেত্রের নাম দেওয়া হয়েছে গেইজ ফিলডস (Gauge fields)। উদাহরণস্বরূপ "ফোটনের" (আলোককণা ঃ কোয়ান্টামবাদ অনুযায়ী আলোকে কণার সঙ্গে তুলনা করা হয়) কথা ধরা যাক। যেখানেই তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র, সেখানেই তড়িৎ-চৌম্বক বলও থাকবে। আর তার সঙ্গে থাকবে "ফোটন"। তড়িৎবল এবং চৌম্বক বল মিলে যে তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে, সেই ক্ষেত্রের প্রমাণ ফোটনের অস্তিত্ব। ফোটনকে বলা হয় "গেইজ পারটিকল"। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এবং উইক ফোর্সের সমন্বয়েও যদি কোন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়, তা হলে বলতে হয় এক্ষেত্রেও পাওয়া যাবে নতুন ধরনের কোন "কণা"। যেমন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ক্ষেত্রের বেলায় পাওয়া যায় "ফোটন"। গ্ল্যাশো তাঁর মন্তব্যে এই "নতুন ধরনের কণার" কথাই বলতে চেয়েছেন।

নোবল কমিটির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক বেংগট নাগেলের মন্তব্য, ঠিক এই মুহূর্তে তাঁদের আবিষ্কারের কোন প্রায়োগিক সম্ভাবনা অবশ্য নেই। তবে ভবিষ্যতে শক্তির ব্যাপারে এই তত্ত্ব সাহায্য করতে পারে। আবার এমনও সম্ভব, আগামী দশ অথবা কুড়ি বছরে তাঁদের তত্ত্বটাই ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন হতে পারে। তবে তার মানে এই নয় সেই সঙ্গে তত্ত্বটি তার গুরুত্ব হারাবে।

রসায়ন

এ বছর রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পেলেন অধ্যাপক জর্জ ভিটিগ এবং অধ্যাপক হারবার্ট ব্রাউন।

সুইডিস অ্যাকাডেমি অভ্ সায়ান্সের মন্তব্য ঃ জৈব-রাসায়নিক সংশ্লেষণের ক্ষেত্রে ভিটিগ এবং ব্রাউনের গবেষণা একটি নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করেছে। বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে নানা রকম রঞ্জন পদার্থ, নাইট্রোগ্লিসারিন, সংশ্লেষিত তন্তু বা সিনথেটিক ফাইবারস, ভিটামিন কীটনাশক রাসায়নিক যোগ প্রভৃতির উৎপাদন ভিটিগ এবং ব্রাউনের মৌলিক গবেষণার অসামান্য ফলশ্রুতি।

"সাধারণ মানুষের কাছে ভিটিগের আবিষ্কার যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর তত্ত্বের সাহায্যে যে সব রাসায়নিক যৌগ এ পর্যন্ত তৈরি হয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও তৈরি হবে বলে আমরা মনে করি, তাদের সাহায্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন আরও অনেক গুণ বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হবে। পৃথিবীর বুভুক্ষু মানুষের কাছে এটা আশার কথা।" নোবেল নির্বাচক কমিটির সদস্য হিসেবে নিজের মতামত জানাতে গিয়ে এ কথা বলেছেন অধ্যাপক সালো গ্র্যানোভিট্জ।

অধ্যাপক ভিটিগের বয়েস এখন ৮২। জন্ম বার্লিনে। মার্বুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত তিনি হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনসটি-টিউট অভ্ কেমিস্ট্রির প্রধানের পদে বৃত ছিলেন। তারপর থেকে ওই একই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তিনি প্রফেসর এমেরিটাস।

তুলনায় অধ্যাপক ব্রাউন বয়েসে তরুণ। ১৯৭৯ সালে তিনি ৬৭ বছরে পদার্পণ করেছেন। জন্ম লণ্ডনে। যখন বয়েস মাত্র দুই বছর, ওই সময়েই তিনি ইংলণ্ড ছেড়ে বাবা মার সঙ্গে চলে যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তারপর সেখানেই পড়াশুনা। সেখানেই গবেষণা। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট অধ্যাপক ব্রাউন ১৯৫৯ সাল থেকে পার্ডিউ বিশ্ববিদ্যালয়ের উইদহেল রিসার্চ প্রফেসারের পদে আসীন।

"ছেলেবেলায় চরম দারিদ্র্য এবং প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্যে আমাদের পরিবারটিকে টিঁকে থাকতে হয়েছিল।" নোবল পুরস্কার পাওয়ার পর কতকটা আত্মমগ্নভাবেই মন্তব্য করেছেন ব্রাউন। নিজের গবেষণালব্ধ ফলাফলের পেটেন্টের টাকায় এখন তিনি কোটিপতি।

ব্রাউনের জীবনে কৃতিত্বের দৃঢ় সোপানটি তৈরি হয়েছিল ১৯৩০ এর দশকে। তখন তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে সবে গবেষণার জীবন শুরু করেছেন। বোরন এবং হাইড্রোজেন পরস্পর রাসায়নিকভাবে সংযুক্ত হয়ে তৈরি করে এক শ্রেণীর রাসায়নিক যৌগ, যাদের বলা হয় বোরোহাইড্রাইড্স বা বোরোন্স। ব্রাউন আবিষ্কার করলেন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বোরন্সের ভূমিকা বিজারক হিসেবে অসামান্য। তিনি দেখালেন, এদের সাহায্য নিয়ে কিভাবে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনগুলিকে বিজারিত করে অ্যালকোহল তৈরি করা যেতে পারে। অসম্পৃক্ত এই হাইড্রোকার্বনগুলিকে বলা হয় 'অলেফিনস' বা 'অ্যালকেনস'। ইথিলেন, প্রপিলেন, বিউটিলেন প্রভৃতি এদের মধ্যে পড়ে।

যেমন ধরা যাক, অরগ্যানো বোরেন (বোরেনের জৈব-যৌগে) কুড়ি থেকে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তৈরি করে অ্যালকোহল। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিক্রিয়া। অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনগুলিকে বোরেনের সাহায্যে বিক্রিয়া ঘটিয়ে বড় বড় অণুর হাইড্রোকার্বনও তৈরি করা যায়। উল্লেখ্য, জ্বালানি তেলের মধ্যে থাকে বড় বড় অণুর হাইড্রোকার্বন। বোরেনের সাহায্যে ওই ধরনের হাইড্রোকার্বন সংশ্লেষণ করা সম্ভব। এতে করে জ্বালানি সমস্যার সুরাহা হতে পারে। ব্রাউন বোরেনের সাহায্যে প্রাইমারি অ্যামাইন সংশ্লেষণ করতেও সমর্থ হয়েছেন এবং অনায়াসে। তাঁর আবিষ্কার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউরেনিয়াম যৌগ

থেকে পারমাণবিক বিক্রিয়ার উপযুক্ত গুণসম্পন্ন বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম জ্বালানি উৎপাদন করতে সাহায্য করেছে। যুদ্ধোত্তরকালে বৃহত্তর বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে নানা রকম কীট-নাশক রাসায়নিক যোগ। যাদের সাহায্যে পৃথিবীর মানুষ ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে ক্ষেতের ফসল বাঁচাতে সক্ষম হচ্ছে। সংরক্ষিত খাদ্যশস্যের অপচয় কমানো সম্ভব হয়েছে। শোধন করা হচ্ছে শস্যবীজ।

এক ধরনের রাসায়নিক যোগ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, যা পুরুষকীটদের আকর্ষণ করে। চাষীরা এই যোগ যখন ক্ষেতখামারে ছড়িয়ে দেন, তার আকর্ষণে ঝাঁকে ঝাঁকে পুরুষ-কীট সেখানে গিয়ে হাজির হয়। আসলে এই রাসায়নিক যোগ নির্গত হয় স্ত্রী-কীটের দেহ থেকে। তার গন্ধে পুরুষ-কীট স্ত্রী-কীটের সঙ্গে মিলনের জন্যে ছুটে আসে। ব্রাউনের আবিষ্কারই ওই রাসায়নিক যোগ উৎপাদন করার ব্যাপারে সাহায্য করেছে। তার ফল দাঁড়িয়েছে এই, ওই যোগ এখন বিপুল পরিমাণে পাওয়া যায়। মাঠে ছড়িয়ে দিলে তার আকর্ষণে সেখানে এসে হাজির হয় পুরুষ-কীট। তারা স্ত্রী-কীটের সান্নিধ্যলাভের জন্য অন্ধের মত ছোটাছুটি করে। এবং এক সময়ে মারা যায়, অথবা অন্য কোন প্রাণীর দেহে আহার্য হিসেবে আশ্রয় নেয়।

অধ্যাপক ভিটিগের আবিষ্কারও ব্রাউনেরই অনুরূপ। তাঁর তত্ত্বও রাসায়নিক শিল্পকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছে। তাঁর আবিষ্কার, কার্বনিল ঘটিত রাসায়নিক যোগকে খুব সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে এবং সহজে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বা 'অলেফিনস'-এ রূপান্তরিত করা যায়। কার্বনিল গ্রুপের মধ্যে থাকে একটি কার্বন পরমাণু। কার্বনিল গ্রুপের এই অক্সিজেন পরমাণুটি প্রতিস্থাপিত করা হয় একটি অ্যালকিলিডেনা গ্রুপের সাহায্যে। আর এ কাজে সাহায্য করে অ্যালকিলিডেন ট্রিপল্ ফিনাইল ফসফরেন নামে এক শ্রেণীর রাসায়নিক যোগ।

ভিটিগের তত্ত্ব জৈব-রাসায়নিক যোগে পরস্পর দুটি কার্বন পরমাণুর মধ্যে একটি 'ডাবল্‌বন্ড' (C C) সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে। এবং শুধু সাহায্যই নয় কোন জৈব যোগে, বিশেষ করে অসম্পৃক্ত হাইড্রো কার্বনের অন্দর কোন আকাঙ্ক্ষিত জায়গায় 'এই কার্বন ডাবল্ বন্ড' স্থাপনের কাজটি অনায়াস করেছে।

ভিটিগের এই আবিষ্কারের ফলে সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে ভিটামিন 'এ'-র উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। দেহের ত্বক এবং বিশেষ করে চোখের ব্যাপারে এই ভিটামিনটির ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ, এ কথা এখন কে না জানেন। সংশ্লেষণ করা সম্ভব না হলে, ভিটামিন 'এ' এত কম পয়সায় সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া দুষ্করই হতো।

ভিটিগের আবিষ্কার আরও এক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক যোগ সংশ্লেষণের কাজ বিশেষভাবে সাহায্য করছে। যোগটির নাম কারবো-ডাই-ইমাইড। এই যোগের সাহায্যেই পরবর্তীকালে পেপটাইডস এবং নিউক্লিওটাইডস সংশ্লেষিত করা হয়। এরাই পরবর্তীকালে খোরানা, টড প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের নিউক্লেয়িক অ্যাসিড সংশ্লেষণে সাহায্য করেছে। উল্লেখ্য এই নিউক্লেয়িক অ্যাসিডই 'ডি এন এ' এবং 'আর এন এ'-র পূর্বসূরী যাদের এখন আমরা বলছি 'জেনেটিক কোড'—প্রাণ গঠনের মূল ভিত্তি।

নোবেল কমিটির মন্তব্য ঃ অধ্যাপক ভিটিগের কৃতিত্ব, তিনি 'ভিটিগা রি-এজেন্টস'
বা 'ভিটিগ বিক্রিয়ক'-এর আবিষ্কর্তা। এই বিক্রিয়ক ফসফরাস ঘটিত এক শ্রেণীর যৌগ।
যাদের বলা হয় 'ফসফরেন্স'। এই যৌগ নানা রকম রাসায়নিক যৌগ সংশ্লেষণে প্রচন্ড-
ভাবে সাহায্য করেছে। এই সব যৌগের মধ্যে 'প্রোস্টাগ্ল্যানডিনস'-ও আছে।
উল্লেখ করা যেতে পারে, এই 'প্রোস্টাগ্ল্যানডিন'গুলিকে বলা হচ্ছে, 'সর্বরোগহর'
ওষুধ। সন্তানধারণ থেকে শুরু করে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি, হৃদরোগ থেকে শুরু করে নানা
রকম বিপাকীয় ত্রুটিজনিত রোগ—অনেক কিছুই এই শ্রেণীর ঔষধ দিয়ে নিরাময়
করা সম্ভব।

ব্রাউন সম্পর্কে নোবেল কমিটির মন্তব্য, তিনি অসাধারণ কার্যক্ষমতার অধিকারী
এক শ্রেণীর রাসায়নিক যৌগ তৈরি করেছেন, যাদের বলা হচ্ছে 'অরগ্যানো বোরেন।'
এই যৌগের সাহায্যে বহু জৈব রাসায়নিক যৌগের কার্যরত অংশটিকে (ফাংশনাল গ্রুপ)
পরিবর্তন করা সম্ভব হয়েছে।

ভিটিগ এবং ব্রাউনের অবদানে বহু নতুন ওষুধ পত্রের বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন
এখন সম্ভব। এই সব ওষুধের মধ্যে আছে 'হাইড্রোকরটিসন'। গেঁটে বাতের কষ্ট
লাঘবের জন্যে ইদানীং হামেশাই যা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

হ্যাঁ, ভিটিগের বয়েস হয়েছে ঠিকই। তবু মনের দিক দিয়ে এখনও তিনি তরুণ।
হাইডেলবার্গের কেমিক্যাল ইনস্টিটিউটে এখনও তাঁকে দেখা যাবে। সপ্তাহে তিন
দিন। সকালে। আর মাঝে মাঝে দেখা যাবে, পাহাড়ের বুকে হেঁটে বেড়াচ্ছেন
তিনি। কারণ উচ্ছ্বসিতভাবে পাহাড়ে চড়া, আমরা যাকে বলি 'মাউনটেনিয়ারিং—
ভিটিগের সেটা পুরনো 'হবি' নেশা।

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সংবাদ শুনে ভিটিগের মন্তব্য আমার কাছে এ খবরটা
অবাক হওয়ার মত। আমি এখন বৃদ্ধ। এমন পরিণত বয়েসে কোন পুরস্কার
অথবা সম্মান পাওয়ার প্রত্যাশা করা বৃথা।

ব্রাউনকে যখন খবরটি জানানো হয়, তখন তিনি ছিলেন নিউ-জার্সির লিনডেনে।
সেখানকার একসোন রিসার্চ অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থার গবেষণাগারে। মেজাজে
বিজ্ঞানী এবং ব্যবসায়ী—দুই-ই। উপদেষ্টা হিসেবে প্রায়ই তিনি এখানে আসেন।
তাঁর মন্তব্য ঃ কোন মানুষের সারা জীবনের কাজের এ ধরনের স্বীকৃতি সত্যিই
সুন্দর। বলা অনাবশ্যক, আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি।

শারীর এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান

কম্পিউটারাইজড্ অ্যাকসিয়াল টমোগ্র্যাফি বা সংক্ষেপে CAT।
প্রসঙ্গটি তুলতেই সুইডেনের ক্যারোলিনস্কা ইনসটিটিউটের সদস্যদের মধ্যে উঠলো
বিতর্কের ঝড়। চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার দায়িত্ব এই ইনসটিটিউটির
উপর ন্যস্ত। এত বড় দায়িত্ব যেখানে, সেখানে ব্যাপারটা ভেবে দেখতে হবে বইকি?

নোবেল নির্বাচক কমিটির মোট সদস্য সংখ্যা পনের। সদস্যদের মধ্যে কেউ বললেন, এ বছর চিকিৎসাবিজ্ঞানের পুরস্কারটি এঁদের দিন। কেউ বললেন, এঁদের নয়, ওঁদের। শেষ পর্যন্ত অনেকেই আর একমত হতে পারলেন না। ফলে চুয়ান্ন জন সদস্যের নোবেল পরিষদের কাছে নাম পাঠানো হলো একাধিক। সেই সঙ্গে তুলে ধরা হলো একাধিক বিষয়ের কথা।

এবার খোদ নোবেল পরিষদেই শুরু হলো আর এক প্রস্ত বিতর্ক। দীর্ঘ বিতর্ক। পরিষদ নির্বাচক কমিটির সুপারিশগুলি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন। এবং শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করিলেন, ১৯৭৯-র নোবেল পুরস্কার টমোগ্র্যাফির উপরই দেওয়া হোক।

কোন কোন সদস্য সমালোচনা করে বললেন, 'টমোগ্র্যাফি তো একটা টেকনোলজি। ঠিক কথা চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই টেকনোলোজির ভূমিকা অসামান্য। কিন্তু এটা তো কোন মৌলিক গবেষণার ব্যাপার নয়? তা ছাড়া, পুরস্কারের জন্যে যাঁদের নাম করা হচ্ছে তাঁদের কেউ জীববিজ্ঞানী, শারীরবিজ্ঞানী বা চিকিৎসকও নন।

নোবেল পুরস্কারের আদর্শের কথা উল্লেখ করে এর উত্তরে প্রতিপক্ষ মন্তব্য করলেন, মানব কল্যাণে টমোগ্র্যাফির ভূমিকা সুদূরপ্রসারী। এ ধরনের টেকনোলজি চিকিৎসাবিজ্ঞানকে অনস্বীকার্যভাবে সমৃদ্ধ করেছে। আর এই অসামান্য অবদানের জন্যে শ্রীগডফ্রে নিউবোল্ড হাউনসফিল্ড এবং অধ্যাপক অ্যালেন ম্যাক-লিওড করম্যককে ১৯৭৯ সালের নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হোক।

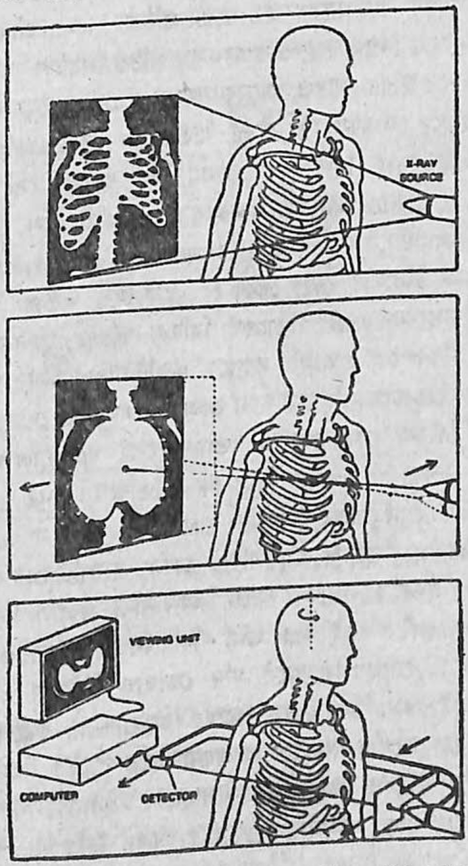
বিতর্কে হাউনথফিল্ড (৬০) এবং করম্যাক (৫৫ ছাড়া আর কাদের নাম উঠেছিল নোবেল কমিটি তাঁদের কথা অবশ্য প্রকাশ করেন নি।

কী এই টমোগ্র্যাফি?

এটা এক ধরনের পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সাহায্যে দেহের ভেতরকার যে কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অথবা তার অংশবিশেষের অজস্র একস-রে ছবি তুলে সেই ছবিগুলিকে গাণিতিক উপায়ে সংযুক্ত করে ওই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা তার অংশবিশেষের থিড্রাইমেনশনাল বা ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য গাণিতিক উপায়ে সংযুক্তিকরণের কাজটি করে থাকে যন্ত্রগণক।

সংক্ষেপে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম। ধরুন কারোর দেহের হাড় ভেঙ্গে গেল, অথবা আঘাতের দরুন তাতে চিড় ধরলো। এমন একটি ঘটনা দেহের বাইরে থেকে পরীক্ষা করা খুবই শক্ত কাজ। চিকিৎসকরা এই কাজটি দুটি উপায়ে করে থাকেন। যে জায়গাটি ভেঙ্গে গেছে অথবা চিড় ধরেছে বলে মনে হয়, হাতের স্পর্শের সাহায্যে সে জায়গাটি অনুভব করেন তাঁরা। তারপর সন্দেহজনক সেই জায়গাটির একস-রে ছবি তোলেন। অথবা ধরুন চিকিৎসক সন্দেহ করলেন কারোর মস্তিষ্কে অথবা দেহের অভ্যন্তরে কোথাও টিউমার হয়েছে। সেই টিউমারটি দেহের অভ্যন্তরে ঠিক কোন জায়গায় কী অবস্থায় আছে, অথবা তা ক্যানসারে পরিণত হয়েছে কী না, এ সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সংগ্রহের জন্যেও তাঁরা কখনও একস-রে ছবি তোলেন, কখনও বা শল্যব্যবস্থার (বায়োপসি) সাহায্য নেন। কখনও বা রোগীর দেহে ঢুকিয়ে দেন

তেজস্ক্রিয় বস্তু (রেডিওঅ্যাক্টিভ ট্রেসার)। তেজস্ক্রিয় বস্তু টিউমার কোষে হাজির হয়ে সেখান থেকে বিকীর্ণ করে তেজস্ক্রিয় বিকীরণ। সেই বিকিরণ পরীক্ষা করে অনেক সময় টিউমারটির চরিত্র সম্পর্কে নানারকম তথ্য জানা যেতে পারে। যেমন টিউমারটি শরীরের মধ্যে ঠিক কোন্ জায়গায় গজিয়েছে, সেটা কী অবস্থায় আছে, তার আয়তনই বা কত, এমন সব তথ্য। তবে এসব ক্ষেত্রে একস-রে ছবির ভূমিকা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। একস-রে ছবিতে শরীরে অভ্যন্তরের কোন প্রত্যঙ্গ, হাড়—সেখানে কোথাও বাতাসের বুদবুদ জমেছে কী না এ সব ধরা পড়ে ঠিকই। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে যে ধরনের ছবি পাওয়া যায় তার সবই দ্বিমাত্রিক। অর্থাৎ এ ধরনের ছবির দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থ আছে কোন গভীরতা নেই। এর ফলে অনেক সূক্ষ্ম পরীক্ষার কাজ ব্যাহত হয়।



[(ক) একপাশে একস্-রে উৎস ; আর এক পাশে ফটোগ্রাফিক প্লেট। মাঝখানে রোগী (খ) একস্-রে উৎসটি এক পাশে সরানো হচ্ছে, আর একই সঙ্গে তার বিপরীত দিকে সরানো হচ্ছে ফটোগ্রাফিক

প্লেট। তোলা হচ্ছে সামতলিক ক্ষেত্রের উপর একটি টিউমারের প্রস্থচ্ছেদের ছবি (কালো বিন্দু)। লক্ষ্য করুন, বিন্দুটি কত স্পষ্ট। ওই বিন্দু যে তলে অবস্থান করছে সেই তলটি ছাড়া বিভিন্ন গভীরতায় দেহের অবশিষ্ট তলের ছবি অস্পষ্ট। (গ) প্লেট থেকে টিউমারের ছবিটির পুনর্গঠন করা হয়েছে]

যেমন, ধরুন, সাধারণ ক্যামেরায় ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল হলের ছবি তুললেন। ছবিতে হল এবং তার সামনের রাস্তা এবং গাছপালাও রইলো। সব রইলো ঠিকই, কিন্তু ছবিটি দ্বিমাত্রিক হওয়ার দরুন, ছবি দেখে ওই সব গাছপালা পথ প্রভৃতি হলটি থেকে ঠিক কত দূরে, তাদের পারস্পরিক কৌণিক অবস্থান—এ সব সঠিক বুঝে ওঠা শক্ত। কথাটা চিড় ধরা হাড় অথবা টিউমারের দ্বিমাত্রিক এক্স-রে ছবির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এ ধরনের ছবি পরীক্ষা করে হাড়ের চিড় কতটা গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত, অথবা কোন্ টিউমারের অভ্যন্তরে সঠিক কোন্ জায়গায় ক্যানসার দানা বেঁধেছে অথবা বাঁধতে চলছে কখনও কখনও তা সঠিক নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না।

প্রচলিত এক্স-রে ছবির আরও অনেক সমস্যা আছে। যেমন ছবি তোলার সময় এক্স-রে ক্যামেরাটিকে ফোকাস করা হলো টিউমারের কোন একটি বিন্দুতে এ ক্ষেত্রে যে ছবিটি উঠবে তাতে ওই বিন্দুটি যে তলের উপর আছে, সেই তলের অংশটুকুই পরিষ্কার দেখা যাবে, তুলনায় অন্য অংশের ছবি হবে কিছুটা অস্পষ্ট।

এই সব অসুবিধের দরুন চিকিৎসকরা অনেক সময় একই জায়গার একাধিক এক্স-রে ছবি তুলে থাকেন বিভিন্ন কোণ থেকে। এতে করে ওই সব ছবির এক একটিতে ফুটে ওঠে দেহের ভিতরকার একই প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন অংশের তুলনামূলক চেহারাটি। যা পরীক্ষা করে চিকিৎসকরা প্রত্যঙ্গটি সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি করে নিতে পারেন।

টমোগ্র্যাফির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঘটে অন্য রকম। এখানেও দেহের ভেতরকার এক্স-রে ছবি তোলা হয় বিভিন্ন কোণ থেকে। তারপর সেই ছবিগুলি গাণিতিক পদ্ধতিতে একসঙ্গে জুড়ে তৈরী করা হয় একটি ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব। এই প্রতিবিম্বের সাহায্যে চিকিৎসকরা বুঝতে পারেন দেহের অভ্যন্তরে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা তাদের অংশবিশেষের আয়তন কতটা সঠিক, আকৃতিই বা কী, নির্দিষ্ট কোন্ অংশটি তার কতটা জায়গা জুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন নানা রকমের 'কোয়ানটিটেটিভ' বা পরিমাণমাত্রিক তথ্যাবলী। এই সব তথ্য চিকিৎসকদের আরও নির্ভরযোগ্যভাবে সাহায্য করতে পারে। দেহের অভ্যন্তরে যদি কোথাও টিউমার থাকে, তাঁরা বুঝতে পারেন, টিউমারটি কী রকম, ঠিক কোন বরাবর অস্ত্রোপচার করলে অথবা তেজস্ক্রিয় বিকিরণ প্রয়োগ করলে রোগীর নিরাময় সহজতর হতে পারে। গাণিতিক পদ্ধতিতে এইভাবে প্রতিবিম্ব তৈরি করে তার সাহায্যে ইদানীং টিউমার মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচার হৃৎপিণ্ড, হাড় আলসার প্রভৃতির শল্য চিকিৎসা যথেষ্ট সুগম করা সম্ভব হয়েছে।

এ ধরনের প্রতিবিম্ব তৈরীর ব্যাপারে প্রথম আলোকপাত করেছিলেন অস্ট্রিয়ার বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ জে রাদোন ১৯১৭ সালে প্রকাশিত তাঁর একটি গবেষণা বিষয়ক প্রবন্ধে।

১৯২২ সালে বেশ কয়েকজন রেডিওলজিস্ট ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং কেউ কারোর সহায়তা না নিয়ে এক্স-রের সাহায্যে ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব তৈরির কাজটির যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। টমোগ্র্যাফিক যন্ত্রের কার্যপদ্ধতিটি এইরকম: এই যন্ত্রে থাকে একটি এক্স-রে উৎস এবং ফটোগ্রাফিক ফিল্ম। যার ছবি তোলা হবে তাকে রাখা হয় ওই এক্স-রে উৎস এবং ফিলমের অন্তর্বর্তী একটি জায়গায়। এবার কল্পনা করুন, রোগীর দেহটি যেন কতকগুলি তলের সমাবেশ। রোগীর দেহের ভেতর ঠিক যে জায়গাটির ছবি তুলতে চান, সেই জায়গাটি যেন ওই সব তলের কোন একটির উপর অবস্থান করছে। ওই জায়গাটিকে লক্ষ্য করে এবার এক্স-রে ক্যামেরাটিকে ওই তলের উপর ফোকাস করুন। তা হলে, এ ক্ষেত্রে ফিলমের উপর যে ছবিটি ধরা পড়বে তাতে ওই তলটির চেহারাই ফুটে উঠবে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে। তুলনায় অবশিষ্ট তলগুলি দেখা যাবে অস্পষ্ট অবস্থায়। ছবি তোলার সময় রোগীকে রাখা হয় স্থির অবস্থায়। এক্স-রে উৎসটি ধীরে ধীরে এক পাশে সরানো হতে থাকে, এবং তার সঙ্গে তাল রেখে



[এক্স-রে ছবি প্রথমে ভিডিও সংকেতে রূপান্তরিত করা হয়। এই সংকেত গাণিতিক প্রতীক চিহ্নিত করা হয় যন্ত্রগণকে। যন্ত্রগণকের সাহায্যে ছবি পুনর্গঠন করা হয়। এ ধরনের ছবির সাহায্যে দেহের কোন অংশের প্রতিটি তলের বিবরণ অনেক স্পষ্ট হয়। এতে করে চিকিৎসকরা বুঝতে পারেন গোলমালটা ঠিক কোন্ জায়গায় হয়েছে, কিভাবে তার চিকিৎসা করতে হবে। প্রয়োজনে অস্ত্রোপচারের জায়গাটিও তাঁরা সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারেন। ফলে এক জায়গায় কাটা ছেঁড়া করতে গিয়ে অন্য জায়গাটির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কম।]

ওই একই সময়ে ফটোগ্রাফিক প্লেটটি এক্স-রে উৎসটির বিপরীত দিক বরাবর সরানো হয়। বিভিন্ন কোণ থেকে এইভাবে যে ছবি তোলা হলো সেই ছবির সমস্ত অংশ গাণিতিক সংখ্যায় রূপান্তরিত করে যন্ত্রগণকে সঞ্চিত করা হয়। ধরা যাক যে তলটির ছবি তোলা হলো, সেই তলটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে। এক একটি বর্গক্ষেত্রকে এবার সূচিত করা হলো এক একটি সংখ্যার সাহায্যে। অর্থাৎ কোন একটি সংখ্যা যেন ওই তলের কোন একটি বর্গাকার অংশের প্রতিবিম্ব। এ ধরনের প্রতিবিম্বকে বলা হয় পিক্সেল (Pixel)। পিক্সেলের সংকেত সঞ্চিত থাকে যন্ত্রগণকে। রোগীর

দেহের যে অংশটির ছবি তোলা হলো সেই অংশটি পর পর অসংখ্য তলে এবার পৃথক করা যাক। এক একটি তলের অসংখ্য পিক্সেল। প্রত্যেকটি তলের পিক্সেলগুলি সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত করে যন্ত্রগণকে সঞ্চিত করা যেতে পারে। প্রতিবিম্ব তৈরির সময় প্রথমে একটি তলের পিক্সেলগুলি সাজিয়ে নেওয়া হয়। তারপর ওই তলের উপর সাজানো হয় অপর তলের পিক্সেল এবং এইভাবে পর্যায়ক্রমে একের পর এক তলের নির্দিষ্ট পিক্সেলগুলি সাজিয়ে নিলে পাওয়া যাবে ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব। উল্লেখ্য, কোন তলের কোন জায়গায় একস্-রশ্মির ঘনত্ব পিক্সেলগুলির মধ্যেই ধরা থাকে।

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরী প্রথম টমোগ্র্যাফিক যন্ত্রটি তৈরি করে ইংলণ্ডের একটি প্রতিষ্ঠান। নাম ই এম আই। আর সেই যন্ত্রটিরই উদ্ভাবক ছিলেন ওই প্রতিষ্ঠানেরই সেণ্ট্রাল রিসার্চ ল্যাবোরেটারির প্রযুক্তিবিদ জি এন হাউনসফিল্ড। যন্ত্রটির নাম দেওয়া হয় ই এম আই স্কানার। এই কোম্পানি তাঁদের তৈরি।

এই যন্ত্র প্রথম মার্কিন দেশে পাঠিয়েছিলেন ১৯৭৩ সালে। সেটি বসানো হয় মেয়ো ক্লিনিকে। এটা মুখ্যত তৈরি হয়েছে মস্তিষ্কের ত্রিমাত্রিক ছবি তোলার জন্যে। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর অনেক হাসপাতালেই এই স্ক্যানার এখন দেখতে পাওয়া যাবে। তবে প্রসঙ্গত বলা যায়, এ ধরনের পরীক্ষা-পদ্ধতি খুবই ব্যয়বহুল। কারণ এক একটি স্ক্যানারেরই দাম এখন দুই থেকে সাত লক্ষ ডলারের মত, এবং একবার পরীক্ষা করতে খরচ পড়ে প্রায় দু'শ ডলার।

হাউনসফিল্ডের বক্তব্য, টমোগ্রাফির সাহায্যে মস্তিষ্ক অথবা শরীরের অন্য কোন জায়গায় ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্বই শুধু নয়, তাদের প্রস্থচ্ছেদ তলের প্রতিবিম্বও তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এতে করে শরীরের অভ্যন্তরে রোগ নির্ণয় করা সহজ হয়।

কাম্যাকের জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকায়। পেশায় পদার্থবিজ্ঞানী। তিনিই যন্ত্রগণকে চালিত টমোগ্র্যাফির তাত্ত্বিক পদ্ধতির উদ্ভাবক। পদার্থবিজ্ঞানী হয়েও তিনি এক সময় দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউন হাসপাতালের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সেখানে তাঁর দায়িত্ব ছিলো তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সাহায্যে ক্যানসার নির্ধারণ এবং তার চিকিৎসা।

১৯৫৬ সালের করম্যাক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। সেখানে গোড়ার দিকে তিনি মানুষের দেহের বিভিন্ন কোষকলা বা টিস্যুর একস-রে শোষণ-ক্ষমতা জানার ব্যাপারে গবেষণা চালান। তবে গত পনের বছর তিনি পারমাণবিক কণার উপর তাত্ত্বিক গবেষণা চালিয়ে আসছেন।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ শুনে করম্যাক যেন কিছুটা অবাকই হয়েছেন। তাঁর মন্তব্য আসলে টমোগ্র্যাফিটা আমার কাছে ছিলো "সাইড লাইন"।

করম্যাক এবং হাউনসফিল্ডের মধ্যে পারস্পরিক কোন দেখা সাক্ষাৎ ঘটেনি এখনও।

'হ্যাঁ, করম্যাকের নাম আমি প্রথম শুনেছিলাম ১৯৭২-৭৩ সালে। ওই সময় জানতে পারি, আমার একটি গবেষণাপত্রের পরীক্ষক হিসেবে কোন একটি জার্নাল তাঁকে নির্বাচিত করেছে। বলেছেন হাউনস্‌ফিল্ড। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার।

হাউনস্‌ফিল্ড গ্রামের মানুষ। খামার বিষয়ক শিক্ষা দিয়ে তাঁর বাল্যকালের

সূচনা, 'ছেলেবেলায় আমি বেশির ভাগ সময় কাটাতাম খামারের যন্ত্রপাতি নেড়েচেড়ে। আর একঘেয়েমিতা দূর করার জন্যে মাঝে মাঝে নিজেকেই প্রশ্ন করতাম—যন্ত্রপাতি-গুলি কীভাবে কাজ করে?

'গত কয়েক বছর ধরে আমার সময়ের অর্ধেকটাই আমি ব্যয় করেছি স্ক্যানার বিষয়ক গবেষণায়, বাকি অর্ধেক অন্য কাজে।' বলেছেন হাউনসফিল্ড। সম্প্রতি তিনি ৭০০০ নামে নতুন একটি স্ক্যানার নিয়ে কাজ করছেন। এটি এখনও পরীক্ষাধীন। তাঁর মতে এই যন্ত্রটি ১৮র পরিবর্তে দেহের ভেতরকার যে কোন অংশ ৩ সেকেণ্ডেই স্ক্যান করতে পারবে। অর্থাৎ ৩ সেকেণ্ডের মধ্যেই দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব তৈরি করতে সমর্থ হবে নতুন এই টমোগ্র্যাফিক যন্ত্র।

দেহের অভ্যন্তরে আমাদের হৃৎপিণ্ডটি সব সময়ই চঞ্চল। কোন কোন পেশীর মাঝে মাঝে স্পন্দিত হয়। কিন্তু সচল হৃৎপিণ্ড অথবা চঞ্চল পেশীরও ত্রিমাত্রিক ছবি তুলতে সমর্থ হয়েছেন হাউনস্‌ফিল্ড। তিনি মনে করেন, ঠিকমত ব্যবহার করলে তাঁর উদ্ভাবিত স্ক্যানারে চিকিৎসা করার খরচ অনেকটা কমানো যেতে পারে।



নোবেল পুরস্কার ১৯৮০

পদার্থ বিজ্ঞান

"ওঁরা যা বলতে চান, সেটা স্পষ্ট করে বোঝানোর জন্যে হয়তো একজন নতুন আইনস্টাইনের দরকার হবে।" পদার্থবিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের দরুন ১৯৮০ সালে সম্মিলিতভাবে দুইজন পদার্থবিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। তাঁদের লক্ষ্য করেই এই মন্তব্য। মন্তব্য নোবেল-কমিটির জনৈক সদস্যের। যাঁরা পুরস্কৃত হলেন, তাঁদের একজন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের কণা-পদার্থ বিজ্ঞানী ভাল ফিচ্। বয়েস ৫৭। দ্বিতীয় জন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানী জেমস ক্রনিন। বয়েস ৪৯। নোবেল কমিটির বক্তব্য, ফিচ্ এবং ক্রনিনের তত্ত্ব অনন্যসাধারণ। বিতর্কমূলকও।

প্রসঙ্গ পারমাণবিক কণার সৃষ্টিতত্ত্ব এবং প্রতিসাম্য সূত্র অর্থাৎ 'ল অভ্ সিমেট্রি'।

বিজ্ঞানীরা এক সময় মনে করতেন, পরমাণুই পদার্থের অন্তিম অবস্থা। পরমাণু অখণ্ডনীয়। কিন্তু পরে জানা গেল, পরমাণুকে মুখ্যত দুটি অংশে ভাগ করা যায়। একটিকে বলা হল কেন্দ্রীয় অংশ। যার নাম দেওয়া হল 'নিউক্লিয়াস'। অপরটি পরমাণুর নিজস্ব পরিমণ্ডল। পরমাণু সংলগ্ন এই পরিমণ্ডলের মধ্যে নিউক্লিয়াসের চারপাশে পরিক্রমণ করে এক ধরনের কণা। যার নাম ইলেকট্রন। ইলেকট্রন ঋণাত্মক তড়িৎধর্মী কণা। সূর্যের চারপাশে যেমন বিভিন্ন গ্রহ পরিক্রমণ করে, ঠিক তেমনি নিউক্লিয়াসের চারপাশে পরিক্রমণ করে ইলেকট্রন।

প্রশ্ন দাঁড়াল তখন, ইলেকট্রন তো ঋণাত্মক বিদ্যুৎধর্মী কণা? যদি তাই হয়, যেহেতু পরমাণু ঋণাত্মক বিদ্যুৎধর্মী কণার আধার, তা হলে সাবিকভাবে পরমাণুরও তো ঋণাত্মক তড়িৎধর্মী হওয়ার কথা? কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, সাধারণ অবস্থায় মৌলিক পদার্থের পরমাণু বৈদ্যুতিক চরিত্রের দিক দিয়ে নিষ্ক্রিয় (ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল)।

অতএব বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করলেন, পরমাণুর নিউক্লিয়াস নিশ্চয় ধনাত্মক তড়িৎধর্মী কণা। নিউক্লিয়াসের ধনাত্মক বিদ্যুৎ ইলেকট্রনের ঋণাত্মক বিদ্যুৎকে প্রশমিত করে বলেই স্বাভাবিক অবস্থায় পরমাণুমাত্রই বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ বা 'ইলেক-ট্রিক্যালি নিউট্র্যাল" অবস্থায় বিরাজ করে।

অবশেষে আবিষ্কৃত হল, পরমাণুর নিউক্লিয়াসও অখণ্ডনীয় নয়। হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে একটি প্রোটন। প্রোটন ধনাত্মক তড়িৎধর্মী কণা। একটি প্রোটনের মধ্যে যে পরিমাণ ধনাত্মক বিদ্যুৎ আধান থাকে, একটি ইলেকট্রনের মধ্যেও থাকে ঠিক সেই পরিমাণই ঋণাত্মক বিদ্যুৎ আধান। হাইড্রোজেন পরমাণুতে সমপরিমাণ এবং বিপরীতধর্মী ওই বিদ্যুৎ কণা তাই প্রশমিত অবস্থায় বিরাজ করে আর এর জন্যেই স্বাভাবিক অবস্থায় হাইড্রোজেন পরমাণু বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ।

একমাত্র হাইড্রোজেন ছাড়া অন্যান্য পদার্থের পরমাণুর ছবিটি দাঁড়াল ভিন্নতর দেখা গেল তাদের নিউক্লিয়াসের চারপাশে ইলেকট্রন আবর্তন করে ঠিকই, কিন্তু তাদের নিউক্লিয়াসের মধ্যে রয়েছে দুই ধরনের কণা। প্রোটন এবং নিউট্রন। প্রোটন ধনাত্মক বিদ্যুৎধর্মী কণা, একথা আগেই বলেছি। দেখা গেল নিউট্রন কিন্তু বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ বা 'নিউট্রাল' কণা। অতএব পরমাণুর বৈদ্যুতিক অবস্থার ব্যাপারে নিউট্রনের কোন ভূমিকা নেই।

আরও একটি ঘটনা লক্ষ্য করলেন বিজ্ঞানীরা। বাস্তবে মৌলিক পদার্থের সংখ্যা প্রচুর। সমস্থানিক বা আইসোটোপগুলি বাদ দিলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৯২। এদের মধ্যে কতক রকম মৌলিক পদার্থ দৈনন্দিন জীবনে নিজেরাই তো আমরা নাড়াচাড়া করি, অথবা যাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সবাই আমরা অবহিত। লোহা, সোনা, রুপো অ্যালুমিনিয়াম আরও কতরকম ধাতু আছে। অধাতু, যেমন গন্ধক, কার্বন প্রভৃতি। দেখা গেল বাস্তবে এদের পৃথক পৃথক বলে মনে হলেও এদের সবারই গঠনের মূলে কাজ করছে তিন রকমের কণা। ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন। বিভিন্ন সংখ্যক ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন নিয়েই তৈরী হয়েছে এক একটি মৌলিক পদার্থের পরমাণু। ব্যতিক্রম শুধু হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসে আছে একটি প্রোটন কণা, কোন নিউট্রন নেই। আর তার নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে চার পাশে পরিক্রমণ করে একটি ইলেকট্রন কণা। হাইড্রোজেন ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন এবং নিউট্রন থাকে; এবং স্বাভাবিক অবস্থায় নিউক্লিয়াসের মধ্যে যতগুলি প্রোটন থাকে, নিউক্লিয়াসের চারপাশে পরিক্রমণরত অবস্থায় থাকে ততগুলিই ইলেকট্রন। এর জন্যেই মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলি 'বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ বা ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল' অবস্থায় বিরাজ করে।

বিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছিলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু-জগতের সৃষ্টির মূলে কাজ করে ওই তিন রকম কণা—ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন। এই 'ত্রয়ী কণারা' একটি প্রতিসাম্য অবস্থায় বিরাজ করে এক একটি মৌলিক পদার্থ হিসাবে রূপ পরিগ্রহ করে। এরাই মৌল কণা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির এরাই শেষ কথা নয়। একে একে আবিষ্কৃত হতে লাগল একের পর এক মৌল কণা। যাদের বলা হচ্ছে পারমাণবিক কণা। আবিষ্কৃত হল 'পজিট্রন'। দেখা গেল, এই কণাটির ভর ইলেকট্রনের ভরেরই অনুরূপ। তবে ইলেকট্রনের মধ্যে রয়েছে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ আধান। আর পজিট্রনে রয়েছে ধনাত্মক বিদ্যুৎ আধান অর্থাৎ পজিট্রন যেন ইলেকট্রনেরই প্রতিবিম্ব। পজিট্রনকে তাই বলা হল ইলেকট্রনের প্রতি কণা বা 'অ্যান্টি পারটিকল'। এই দুই কণা পরস্পর মিলিত হলে তাদের কণা-অস্তিত্বের বিলোপ ঘটে। রূপান্তরিত হয়ে দেয় বিকিরণ শক্তি। এ ক্ষেত্রে 'গামা' রশ্মিই সেই বিকিরণ। ইলেকট্রন এবং পজিট্রনের মধ্যে লক্ষ্য করা গেল একটা প্রতিসাম্যরূপ বা 'সিমেট্রি'।

দেখা গেল, শুধু পজিট্রনই নয়, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতিরও প্রতি কণা আছে। যাদের বলা হয় অ্যান্টি প্রোটন, অ্যান্টি-নিউট্রন প্রভৃতি।

১৯৪০-এর দশকে মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন আর এক শ্রেণীর বিদ্যুৎ আধানযুক্ত কণা যাদের নাম রাখা হয় 'মেসনস'। এরা খুবই ক্ষণস্থায়ী কণা। এদের ভর ইলেকট্রন এবং প্রোটনের মাঝামাঝি পর্যায়ে পড়ে। মানুষের তৈরি প্রথম মেসন কণাদের বলা হয় 'পাইওনস' বা পাই মেসনস। ১৯৪৮ সালের বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইক্লোট্রনের সাহায্যে এই পাই-মেসন কণা তৈরি করা হয়েছিল। দেখা গেল পাইমেসন কণা তিন রকম। ধনাত্মক পাই-মেসন, ঋণাত্মক পাই-মেসন এবং বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ পাই-মেসন। এরা যেন বৈদ্যুতিক ধর্মের দিক দিয়ে প্রোটন ইলেকট্রন এবং নিউট্রনকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। অর্থাৎ দেখা গেল এ ক্ষেত্রেও বিরাজ করছে প্রতিসাম্য রূপ বা 'সিমেট্রি'। অতঃপর আবিষ্কৃত হল আরও দুই শ্রেণী মেসন। যাদের বলা হল মেসনস মিউমেসনস বা মিউওনস এবং কে-মেসনস বা 'কেওনস'। এদের মধ্যেও ধরা পড়ল ধনাত্মক ঋণাত্মক এবং বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ অবস্থা। প্রতিসাম্য এক্ষেত্রেও। উল্লেখ্য, প্রাকৃতিক সৃষ্টির মধ্যে এই প্রতিসাম্য অবস্থা শুধু পারমাণবিক জগতেই নয়, বৃহত্তর জাগতিক ক্ষেত্রেও দেখা যায়। মাধ্যাকর্ষণে গ্রহগুলি সূর্যের চার পাশে ঘুরছে; উপগ্রহ গ্রহের চার পাশে; নক্ষত্র জগৎ নিয়ত পরিক্রমণ করছে; গ্রহ নক্ষত্রের আকৃতি এবং প্রকৃতির মধ্যেও একটা প্রচ্ছন্ন মিল—এ সবও তো প্রতিসাম্য বা 'সিমেট্রি'রই চিহ্ন।

আরও একটি ব্যাপার আবিষ্কার করলেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা দেখলেন স্বাভাবিক অবস্থায় পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন (একমাত্র হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস ছাড়া)। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে কখনও কখনও পরমাণুর একটি ইলেকট্রনকে ভিন্ন ধরনের কোন ঋণাত্মক কণার সাহায্যে প্রতিস্থাপন করা যায়। শেষোক্ত এই পরমাণুকে বলা হয় বিদেশী পরমাণু বা একসোটিক অ্যাটম। এই প্রতিস্থাপনের দরুন পরমাণুর স্বাভাবিক আচরণে বা চরিত্রে তেমন কোন পরিবর্তন ঘটে না। বলা বাহুল্য, গত আটাশ বছরে পদার্থবিজ্ঞানীরা অন্তত দুই ধরনের 'বিদেশী পরমাণু' নিয়ে গবেষণা চালিয়ে আসছেন। এদের মধ্যে একটি হল 'পাইওন' সমন্বিত পরমাণু

বা 'পাইওনিক অ্যাটম'। এ ধরনের পরমাণুর একটি ইলেকট্রন একটি ঋণাত্মক পাইওন কণার দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়। দ্বিতীয়টিকে বলা হয় 'মিউওনিক অ্যাটম' বা ঋণাত্মক মিউ-মেসন সমন্বিত পরমাণু। ১৯৫২ সালে পাইওনিক পরমাণু নিয়ে যাঁরা প্রথম গবেষণা চালান তাঁদের মধ্যে ছিলেন রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্টন কামাক, এ ডি ম্যাক্‌গুইর, যোসেফ বি প্ল্যাট এবং হ্যারি জে স্কুলট। এর পরের বছর 'মিউওনিক' পরমাণু নিয়ে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা চালান হয় প্রথম। যাঁরা গবেষণায় রত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ১৯৮০ সালের নোবেল বিজ্ঞানী ভাল এল ফিচ্। ফিচের সঙ্গে ছিলেন জেমস রেইনওয়াটার। মিউওনিক পরমাণুর উপর গবেষণা উত্তরকালে নিউক্লিয়াসের গঠন এবং বিশেষ করে নিউক্লিয়াসের মধ্যে কণারা কীভাবে বিন্যস্ত থাকে সে ব্যাপারে অনেক নতুন তথ্য যোগাতে সমর্থ হয়েছে।

এহ বাহ্য। বিতর্কের সূচনা দেখা গেল ১৯৬৪ সালে। এই বছর একদল বিজ্ঞানী নিউ ইয়র্কের আপটনে অবস্থিত ব্রুকহেভন গবেষণাগারে শুরু করলেন এক যুগান্তকারী পরীক্ষার কাজ। তাঁদের লক্ষ্য তখন 'সিমেট্রি' বা প্রতিসাম্য নিয়মের দুটি মুখ্য সূত্র খতিয়ে পরীক্ষা করা। একটি সূত্র হল ঃ যে কোন পারমাণবিক কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াস বিক্রিয়ায় সমস্ত রকম পারমাণবিক কণা তাদের প্রতি পারমাণবিক কণার সাহায্যে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব। যেমন ইলেকট্রনকে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব পজিট্রনের সাহায্যে প্রোটনকে অ্যান্টি প্রোটন অথবা নিউট্রনকে অ্যান্টি নিউট্রনের সাহায্যে ইত্যাদি। দ্বিতীয় সূত্র ঃ পারমাণবিক বিক্রিয়া এবং ওই বিক্রিয়ার দরুন যে প্রতিবস্তুকণা অথবা পারমাণবিক বস্তুকণার সৃষ্টি হয় প্রকৃতির নজরে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। কিছু কিছু বৈষম্যমূলক ঘটনা চোখে পড়লেও সামগ্রিক ভাবে এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নেই। এই নিয়ম দুর্লঙ্ঘ্য। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বস্তুকণা এবং প্রতি বস্তুকণার অস্তিত্ব সমান ভাবে থাকা উচিত। সাধারণ পরমাণু এবং 'বিদেশী' পরমাণুর ক্ষেত্রেও বিভেদের কোন কারণ নেই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাদ সাধলেন ফিচ্ এবং ক্রনিন। পারমাণবিক কণা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তাঁরা বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করলেন অদ্ভুত একটি ঘটনা। তাঁরা গবেষণা করছিলেন এক ধরনের ক্ষণস্থায়ী কণা নিয়ে। যাদের নাম নিউট্রাল কে-মেসনস্ বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ 'কেওন কণা'। তাঁরা দেখলেন. প্রতি ১০০০টি বিক্রিয়ার দুটি ক্ষেত্রে এই পারমাণবিক বস্তু কণারা বিকিরণ শক্তি ক্ষরণ করে জোড়ায় জোড়ায় তৈরি করছে 'পাই-মেসন' বা পাইওন। ঘটনার দিক দিয়ে এটা মস্ত একটি ব্যতিক্রম। কারণ সিমেট্রি সূত্র অনুযায়ী এ ক্ষেত্রে জোড়ায় জোড়ায় নয়, তিনটি করে 'পাইওন' তৈরি হওয়ার কথা। অতএব বলা চলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে সর্বত্রই 'সিমেট্রি সূত্র' সত্য, এ কথা ঠিক নয়। বললেন ফিচ্ এবং ক্রনিন। এই ঘটনা প্রতিসাম্য নিয়মের আরও একটি সম্ভাবনাকে ভুল প্রতিপন্ন করল। যাকে বলা হয় 'টাইম রিভার্সাল' বা বিপরীতগামী সময়। যার অর্থ করলে দাঁড়ায় যে কোন বিক্রিয়া সম্মুখ এবং বিপরীত দুই দিকেই চলতে পারে। যেনা সনেমার ফিলমের মত।

ফিচ্ এবং ক্রনিনের তত্ত্ব প্রমাণ করেছে, যতটা আশা করা গিয়েছিল ব্রহ্মাণ্ড ততটা প্রতিসম বা 'সিমেট্রিক্যাল' নয়। তাঁদের এই ধারণাটির প্রতি কটাক্ষ করেই নোবেল কমিটির জনৈক সদস্য তাই বলেছেন, 'ওঁরা যা বলতে চান, সেটা স্পষ্ট করে বোঝানর জন্যে হয়ত'একজন নতুন আইনস্টাইনেরই দরকার হবে।'

ফিচ্ এবং ক্রনিনের গবেষণালব্ধ ফলাফলের সাহায্য নিয়ে পরবর্তীকালে ব্রহ্মাণ্ড বিজ্ঞানী বা 'কসমলজিস্টরা' একটি চিরায়ত প্রশ্নের উত্তর যোগানর চেষ্টা করেছেন। তাঁদের ধারণা আজ থেকে পনের অথবা আঠারো হাজার কোটি বছর আগে অতিকায় এক নক্ষত্র বস্তুর বিস্ফোরণের ফলে তৈরি হয়েছে বর্তমান এই বিশ্বজগৎ। কোটি কোটি নক্ষত্র এবং নাক্ষত্রিক বস্তু। এই বিস্ফোরণকেই বলা হয় 'বিগ ব্যাং'। সৃষ্টির পরমুহূর্তে নতুন ব্রহ্মাণ্ডে তখন দুই রকম বস্তুরই অস্তিত্ব থাকার কথা। বস্তু এবং প্রতিবস্তু। ইংরেজিতে যাদের বলা হয় 'ম্যাটার' এবং 'অ্যাণ্টি ম্যাটার'। সিমেট্রি বা প্রতিসাম্যের সূত্র অনুযায়ী, বিস্ফোণের পর ব্রহ্মাণ্ডে ঠিক সমপরিমাণেই ম্যাটার বা অ্যাণ্টি-ম্যাটার থাকার কথা। আর যদি তাই হয় তাহলে সৃষ্টির পরমুহূর্তেই তো ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস হওয়া উচিত ছিল! কারণ, বস্তু এবং প্রতি-বস্তু কণার মিলন ঘটলে উভয়েরই বস্তু-অস্তিত্বের বিলোপ হওয়ার কথা। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'অ্যানিহিলেশন'। সেক্ষেত্রে উভয়ে মিলিত হওয়ার পর শক্তিতে রূপান্তরিত হবে। সম পরিমাণ বস্তু এবং প্রতিবস্তুই যদি নতুন সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে থেকে থাকে সেক্ষেত্রে নতুন সৃষ্ট সেই ব্রহ্মাণ্ড কীভাবে টিঁকে রইল?

ফিচ্ এবং ক্রনিনের গবেষণা এই বিভ্রান্তকর প্রশ্নটিরও উত্তর যোগাতে সমর্থ হয়েছে। তাঁদের গবেষণালব্ধ ফলাফলের উপর নির্ভর করে বলা হয়েছে, অতিকায় নক্ষত্রের বিস্ফোরণের পর বস্তু এবং প্রতিবস্তু দুই-ই সৃষ্ট হয়েছিল। তবে ওই সময় প্রতিবস্তুর চেয়ে বস্তুর উৎপাদন কিছুটা বেশি পরিমাণেই ঘটে। আধিক্যের পরিমাণটা ছিল দশ বিলিয়নে একভাগ। সৃষ্টির পর ব্রহ্মাণ্ড ক্রমে শীতল হতে থাকে। বস্তু এবং প্রতিবস্তুকণারা পরস্পর কাছাকাছি আসতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত পরস্পরের মধ্যে ঘটে মিলন। এইভাবে বেশির ভাগ প্রতিবস্তুই বস্তুর সংস্পর্শে এসে বিলুপ্ত হয়ে যায়। অবশিষ্ট যা রইল তার প্রায় সবটাই বস্তু। সেই বস্তুই ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব আজও বজায় রেখেছে। প্রতিবস্তুর পরিমাণ কম ছিল বলেই ব্রহ্মাণ্ডের জন্মলগ্ন তার মৃত্যুলগ্নে পরিণত হয় নি।

প্রতিসাম্য বা 'সিমেট্রি'র সূত্র অনুযায়ী ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় নিয়ম বস্তু এবং প্রতিবস্তু উভয়ের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। যদি তাই হয়, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিমুহূর্তে বস্তু এবং প্রতিবস্তুর সমপরিমাণে থাকাই তো উচিত ছিল। কিন্তু ফিচ এবং ক্রনিনের বক্তব্য অনুযায়ী, প্রকৃতি এক্ষেত্রে যেন কিছুটা পক্ষপাতিত্বই করেছে। বস্তুর চেয়ে সে প্রতিবস্তু তৈরি করেছিল কম। যেটুকু করেছিল, কিছু পরিমাণ বস্তুর সঙ্গে মিলিত হয়ে তার বিলুপ্তি ঘটেছে। অবশিষ্ট বস্তুকণা নিয়ে ব্রহ্মাণ্ড তার অস্তিত্ব বজায় রাখল। সৃষ্টির মূল লক্ষ্য কী, সে উত্তর দেবেন দার্শনিক।

রসায়ন

নোবেল কমিটি রসায়ন বিভাগের নোবেল পুরস্কার দিয়ে বৃত করেছেন একত্রে তিনজন বিজ্ঞানীকে। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পল বার্গ, বয়েস ৫৪। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়ালটার গিলবার্ট, বয়েস ৪৮। এবং ইংলণ্ডের কেমব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ৬২ বছর বয়স্ক ফ্রেডারিক স্যাংগার। স্যাংগার এই নিয়ে দুবার নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হলেন। এর আগে ইনস্যুলিনের আণবিক গঠন আবিষ্কারের জন্যে ১৯৫৮ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল।

রসায়নে উল্লেখযোগ্য গবেষণার দরুন যে তিন বিজ্ঞানীকে ১৯৮০ সালের নোবেল পুরস্কারে বৃত করা হয়েছে তাঁদের অন্যতম হলেন পল বার্গ। পুরস্কার অর্থের অর্ধেক পেয়েছেন তিনি। অবশিষ্ট অংশ সমান দুই ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওয়ালটার গিলবার্ট এবং ইংলণ্ডের কেমব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফ্রেডারিক স্যাংগারের মধ্যে।

'তিনি এমন একটি ব্যাপার নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত যা কার্যেই পরিণত হয় নি।' নোবেল পুরস্কারের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর পল বার্গ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন জনৈক বিশেষজ্ঞ।

নোবেল কমিটির বক্তব্য, পল বার্গের গবেষণাবিষয়ক প্রকল্প নিয়ে গোড়ায় প্রচুর ঝড় বয়ে গেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু যে আশঙ্কার উপর ভিত্তি করে এই ঝড়, সেটা কিছুটা বাড়াবাড়ি বলেই মনে হয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জিন প্রযুক্তি বিজ্ঞানে গবেষণার ব্যাপারে বিভিন্ন বিধি-নিষেধ রচনায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণও বটে। একথা বিবেচনা করেই পুরস্কারের অর্ধেক সম্মানমূল্য অধ্যাপক পল বার্গকে অর্পণ করা হয়েছে।

জীবজগতের বংশগতির ধারক এবং বাহক এক ধরনের জটিল রাসায়নিক যৌগ —যার নাম ডি অক্সি-রাইবোনিউক্লেয়িক অ্যাসিড বা সংক্ষেপে ডি এন এ—বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে ১৯৬০-এর দশকেই স্থির নিশ্চিত হয়েছিলেন। ওই একই সময়ে আবিষ্কৃত হল ডি এন এ-র গঠন বৈচিত্র্যের ছক। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, ভাইরাসই হোক, অথবা অতিকায় নীল তিমি—তাদের সবার ডি এন এ রই মূল উপাদান একই। কীভাবে সেই সব উপাদান পরস্পরবিন্যস্ত এবং এক এক বিন্যাসে তাদের সংখ্যা কত, তারই উপর নির্ভর করে কোন প্রাণী ভাইরাস হিসেবে বিরাজ করবে, কিংবা রূপ পরিগ্রহ করবে তিমি, পাখি বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং মানুষের অবয়বে।

প্রশ্ন উঠল কোন প্রাণী এবং উদ্ভিদের পরিপূর্ণ রূপ এবং শারীরবৃত্তীয় কাজ-কর্ম যদি তার 'ডি এন এ' বা জিনের উপর নির্ভর করে, তা হলে সেই 'ডি এন এ' বা জিনের রাসায়নিক গঠনের কিছুটা হেরফের ঘটিয়ে অনেক কিছুই তো করা যায়। যেমন

ধরুন, খাদ্য সমস্যা। পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে। প্রয়োজন আরও অধিক পরিমাণ খাদ্য। উৎপাদন বাড়াতে হবে গম, ধান ইত্যাদির। এ সব করতে গেলে দরকার প্রচুর নাইট্রোজেনঘটিত সার। অতিরিক্ত সার তৈরি করতে খরচ বাড়ে। অতএব যদি এমন করা যায়, ডি এন এ-র হেরফের ঘটিয়ে তৈরী করা হল এমন প্রজাতির গম অথবা ধানের বীজ, যারা উদ্ভিদে পরিণত হওয়ার পর প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন নিজেরাই সরাসরি বাতাস থেকে সংগ্রহ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে নাইট্রোজেন সারের আর প্রয়োজনই হবে না। কিংবা ধরুন, ডায়াবেটিক রোগ। শরীরে ইনসুলিন নামে এক ধরনের হরমোনের অভাব ঘটলে এই রোগ হয়। এমনও তো হতে পারে, বিশেষ কোন ব্যাকটেরিয়ার 'জিন, এ হেরফের ঘটিয়ে এমন প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া হয়ত তৈরী করা গেল যারা এবং যাদের বংশধর মূল্যবান এই হরমোনটির উৎপাদনে সাহায্য করতে পারে। হয়ত এই একই পদ্ধতিতে ক্যানসার নিরাময়ও সম্ভব!

১৯৬০ এবং ১৯৭০ দশকের গোড়ায় এই ধরনের চিন্তাভাবনার উপর নির্ভর করেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একক এবং সম্মিলিত উদ্যোগে গড়ে উঠল এক ধরনের জৈবিক পদ্ধতি। যার নাম রাখা হল 'রিকমবিন্যান্ট ডি এন এ,' 'জিন স্প্লাইসিং' 'জিন গ্র্যাফটিং', 'জিন ম্যানিপুলেসন' অথবা 'মিকস-অ্যান্ড-ম্যাচ জিনস' 'রিকমবিন্যান্ট ডি এন এ' বা পুনর্সংযোজী ডি এন এ বলতে বোঝায় দুটি পৃথক প্রজাতি থেকে সংগৃহীত জিনের পারস্পরিক মিলন। এ ধরনের পরীক্ষা চালাতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা কিছু কিছু সামগ্রীও আবিষ্কার করলেন। আবিষ্কৃত হল দুই শ্রেণীর 'এনজাইম' বা জৈবিক অনুঘটক। 'লাইগেজ' এবং 'নিউক্লিয়েজ'। নিজেদের আত্মরক্ষার জন্যে প্রাকৃতিক নিয়মেই এই এনজাইমগুলি ব্যাকটেরিয়ার দেহে উৎপাদিত হয়। লাইগেজ ব্যাকটেরিয়ার ডি এন এ'র মেরামতি করে। আর নিউক্লিয়েজের কাজ অজ্ঞাত কুলশীল কোন ডি এন এ ব্যাকটেরিয়ার সান্নিধ্যে এলে তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ধ্বংস করা। অর্থাৎ সাধারণভাবে ব্যাপারটা দাঁড়াল, 'লাইগেজ' যেন আঠা, যার কাজ জোড়াতালি দেওয়া, এবং নিউক্লিয়েজ হল কাঁচি, শত্রুকে ধ্বংস করার দায়িত্ব যার উপর ন্যস্ত।

কিন্তু কাঁচি দিয়ে কেটে দুই প্রজাতির দুটি জিনকে আঠা দিয়ে জুড়ে না হয় নতুন একটি জিন তৈরী করা গেল, কিন্তু সেই সঙ্গে আরও একটি সমস্যাও তো রয়েছে। এবার দরকার সেই জিনকে কোন ব্যাকটেরিয়ার কোষের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যেখানে গিয়ে সেই জিন প্রজননের মাধ্যমে একাধিক অনুরূপ জিন তৈরি করতে পারে। ব্যাকটেরিয়ায় এই নতুন জিন বহন করবে কে? অবশেষে সেই পরিবাহকও আবিষ্কৃত হল। যাদের বলা হয় 'প্লাসমিডস'। কোন কোন ব্যাকটেরিয়ার কোষে কিছু কিছু অতিরিক্ত ডি এন এ থাকে। অতিরিক্ত সেই ডি এন এর ছোট ছোট আংটির মত বলয়কেই বলা হয় 'প্লাসমিডস'। এই প্লাসমিডস সহজেই ক্রোমোজোম থেকে পৃথক করা যায়। এর ফলে পুনর্সংযোজী ডি এন এ নিয়ে পরীক্ষা চালানর জন্যে যা যা দরকার সবই পাওয়া গেল। পাওয়া গেল 'আঠা' জিন কাটার 'কাঁচি' এবং সংযোজিত জিনকে কারখানারূপী ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে পরিবহণ করার মাধ্যম 'প্লাসমিড'

ব্যাকটেরিয়া বলতে এখানে মুখ্যত 'এসচেরিশিয়া কোলি' বা সংক্ষেপে ই, কোলির কথাই ধরা হচ্ছে। বিশেষ ধরনের এই ব্যাকটেরিয়া আমাদের পৌষ্টিক নালী বা অন্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যেও পাওয়া যায় এই ব্যাকটেরিয়া। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, প্লাসমিডসে থাকে খুব কম সংখ্যক জিন। কোন ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে প্রবেশ করার পর তারা তাদের জিন ওই ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমজোমে প্রোথিত করতে পারে। আবার ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমোজোমের সঙ্গে নিজের জিনের বিনিময়ও করতে পারে। কোন ব্যাকটেরিয়ায় হয়ত প্লাসমিড ডি এন এ প্রবেশ করান হল। সেখানে ঘটল তার বংশ বিস্তার। বংশ বিস্তারের পর তাদের সংগ্রহ করে তাদের সঙ্গে সংযুক্ত ডি এন এ'র কে পরিচিত, কে পরিচিত নয় তাও বলে দেওয়া যায়। যদি দেখা যায়, প্লাসমিড ডি এন এ-র বংশধরদের মধ্যে কোন অজ্ঞাত পরিচয় ডি এন এ রয়েছে, বুঝতে হবে, সেই ডি এন এ ই কোলি নয়; অন্য কোন জিন থেকে এসেছে। এইভাবে অজ্ঞাত পরিচয় 'ডি এন এ' সনাক্ত করা যেতে পারে। সেই সঙ্গে জানা যেতে পারে তাদের জৈবিক ধর্ম'।

সেটা ১৯৭১। অধ্যাপক পল বার্গ তখন স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের একটি পরীক্ষা চালানর ব্যাপারে পরিকল্পনা করছেন। তাঁর লক্ষ্য তখন প্রাণীর ক্যানসার-ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করা। উল্লেখ্য বিজ্ঞানীরা অনেক আগেই কিছু কিছু ভাইরাসের সন্ধান পেয়েছিলেন। গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এই সব ভাইরাস ইঁদুর, মুরগী প্রভৃতি প্রাণীর দেহে ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে। মানুষের দেহে ক্যানসার ঘটানর মত কোন ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া না গেলেও দেখা গেল, ঐ সব ভাইরাস মনুষ্যেতর প্রাণীর দেহে ক্যানসারের সংক্রমণ ঘটায় এবং কখনও কখনও পরীক্ষা-নলের মধ্যে কালচার করা মানুষের দেহ-কোষে ক্যানসারের মত প্রতিক্রিয়া ঘটায়। এতে করে কেউ কেউ মনে করলেন, মানুষের ক্যানসার রোগেরও হয়ত কারণ কোন না কোন ভাইরাস।

এক ধরনের টিউমার ভাইরাস নিজেই পরীক্ষার পরিকল্পনা করেন বার্গ। ভাইরাসটির নাম 'সিমিয়ান ভাইরাস—৪০, বা সংক্ষেপে এস ভি—৪০ ভাইরাস। বিজ্ঞানীরা এই ভাইরাসটি প্রথম বানরের দেহে আবিষ্কার করেন। অত্যন্ত ক্ষুদ্র এই ভাইরাসে থাকে তিনটি মাত্র জিন। অদ্ভুত ব্যাপার এই; বিজ্ঞানীরা দেখলেন, এই ভাইরাস বানরের দেহে টিউমার সৃষ্টি না করলেও, ইঁদুর বা অন্যান্য প্রাণীর দেহে এদের ইনজেকশনের সাহায্যে ঢুকিয়ে দিলে শেষোক্ত প্রাণীরা ক্যানসারে আক্রান্ত হয়।

বার্গ ঠিক করলেন, একটি প্লাসমিডের সঙ্গে তিনি 'এস ভি—৪০' ভাইরাসের তিনটি জিন প্রথমে জুড়ে দেবেন, তারপর সেই প্লাসমিডটিকে ঢুকিয়ে দেবেন ই, কোলির দেহে। ধরে নিলেন, অল্পক্ষণের মধ্যেই জিন তিনটি তিনি পৃথক করে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখবেন ওদের মধ্যে কোন জিনটি ক্যানসার সৃষ্টির মূলে কাজ করে এবং কেন করে।

পরীক্ষায় বাধা পড়ল। ১৯৭১ সালের কোন এক দিনে যখন তিনি খুবই ব্যস্ত, এমন সময় তার কানের কাছে বেজে উঠল টেলিফোন। সুদূর নিউ ইয়র্কের লং

আইল্যাণ্ডস্থিত কোল্ড স্প্রিং হারবার ল্যাবরেটরি থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে টেলিফোনে শোনা গেল বিশিষ্ট জিন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক রবার্ট পোলাকের কণ্ঠস্বর। তিনি জানালেন, 'অধ্যাপক বার্গ, খবর পেলাম আপনিই কোলির মধ্যে প্লাসমিডের সাহায্যে 'এস ভি—৪০' ভাইরাসের জিন ঢুকিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করার আয়োজন করছেন। এ খবরে আমি খুবই চিন্তিত। আমার আশঙ্কা, এ ধরনের পরীক্ষা চালাতে গিয়ে এমনও হতে পারে 'এস ভি—৪০' এর টিউমার সৃষ্টিকারী জিন হয়ত ই. কোলির জিনের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে বিশেষ প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া সৃষ্টি হল। এই ব্যাকটেরিয়া একবার যদি গবেষণাগারের বাইরে ছাড়া পায়, তারা এবং তাদের বংশধর ব্যাপকভাবে মানুষের শরীরে ক্যানসার সংক্রামণে সহায়তা করতে পারে। হয়ত আমার এই আশঙ্কা সুদূরপরাহত। তবু ভয় একটি কারণে। ই. কোলি এমন এক শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়া যারা জৈবিক বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের দেহে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। ভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া শরীরে সংক্রামিত হলে শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সাবাড় করে। কিন্তু ই. কোলির ক্ষেত্রে তার সম্ভাবনা কম। অতএব টিউমার জিনবাহী ই. কোলি সম্পর্কে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত। তাই আমার অনুরোধ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে যতক্ষণ না সবাই নিশ্চিত হচ্ছেন, আপনার এই পরীক্ষা আপনি বন্ধ রাখুন।'

শুরু হল বিতর্কের ঝড়। বার্গ দেখলেন, পোলাক যা আশঙ্কা করছেন, তেমন কোন ঘটনা তখনও পর্যন্ত ঘটেনি। তবে তার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ফলে, তিনি তাঁর পরীক্ষার কাজ আপাতত বন্ধ রাখলেন।

এরপর 'রিকমবিন্যান্ট ডি এন এ' নিয়ে একাধিক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। এ ধরনের আলোচনাসভার বিশিষ্টতম উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন বার্গ এবং ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডঃ ম্যাকসিম সিংগার। তৈরী হল ন্যাশনাল ইনসটিটিউটস অভ হেলথ কমিটি (এন আই এইচ)। কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন পল বার্গ। এরপর ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কালিফোর্নিয়ার অ্যাসিলমার কনফারেন্স সেণ্টারে বসল 'রিকমবিন্যাণ্ট ডি এন এ' অণুর উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এই সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউ কে, ফ্রান্স, জার্মানি, হল্যাণ্ড, জাপান, সোভিয়েত দেশ এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রায় দেড়শ জন বিশেষজ্ঞ অংশ গ্রহণ করে। সম্মেলনে বার্গের ভূমিকা ছিল অন্যতম। 'রিকমবিন্যান্ট ডি এন এ' সংক্রান্ত গবেষণায় কী কী ধরনের নিরাপত্তা নেওয়া দরকার সম্মেলনে তা স্থির হয়।

ওয়ালটার গিলবার্ট এবং ফ্রেডারিক স্যাংগারের কৃতিত্ব, 'রিকমবিন্যাণ্ট ডি এন এ' সংক্রান্ত পরীক্ষার ব্যাপারে তাঁরা আবিষ্কার করেছেন অনেক নতুন পদ্ধতি। ওঁরা একশ্রেণীর প্রোটিন অণু আবিষ্কার করেছেন, যাদের বলা হয় 'কেমিক্যাল রিপ্রেসর'। জিনের জোড়াতালি দেওয়ার ব্যাপারে এদের ভূমিকা অন্যতম। গিলবার্ট এবং তাঁর সতীর্থ অ্যালনি ম্যাকসাম এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ আবিষ্কার করেছেন। এই যৌগগুলির সাহায্যে 'ডি এন এ' অণুর বিভিন্ন অংশকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে।

স্যাংগার আবিষ্কার করেছেন এক ধরনের 'এনজাইম'। এই এনজাইম জিনের অনুকৃতি তৈরীর ব্যাপারে সাহায্য করে। এই পদ্ধতির সাহায্যে তিনি ব্যাকটেরিয়াকে 'ইনটারফেরন' নামে এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ উৎপাদনে সক্ষম করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। 'ইনটারফেরন' ভাইরাসের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে।

জিন প্রযুক্তিবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ এবং অর্থবহ করে গড়ে তোলার ব্যাপারে বার্গ, গিলবার্ট এবং স্যাংগারের অবদান এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

শারীর এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান

শারীর এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান বিভাগের পুরস্কারটিও পেয়েছেন একত্রে তিনজন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বারুজ বেনেসেরাফ, বয়েস ৫৯; মায়ানে অবস্থিত জ্যাকসন ল্যাবোরেটরির ৭৭ বছর বয়স্ক বিজ্ঞানী জর্জ স্নেল এবং প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের সেণ্ট লুই হাসপাতালের জেন দসে। নোবেল কমিটির ভাষায় তাঁদের অবদান জেনেটিক্যালি ডিটারমিনড স্ট্রাকচারস অন দ্য সেল সারফেস দ্যাট রেগুলেট ইমিউনোলজিক্যাল রিঅ্যাক-সনস'-এর সুদূরপ্রসারী ভূমিকার কথা বিবেচনা করেই তাঁদের পুরস্কৃত করা হয়েছে।

প্রায়শই অনেকে মন্তব্য করে থাকেন মৌল-গবেষণা থাক, প্রায়োগিক গবেষণার উপর বরং বেশি মন দিন। কারণ প্রায়োগিক গবেষণালব্ধ ফল সরাসরি মানুষের উপকারে লাগে। কথাটা যে আংশিক সত্য, ১৯৮০ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে যাঁরা নোবেল পুরস্কার পেলেন, তাঁদের অবদান সেটাই প্রমাণ করেছে। তাঁদের গবেষণার বিষয় 'ইম্যুনলজি' বা রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক বিজ্ঞান। বিভিন্ন রোগের নিরাময় এবং প্রতিরোধের ব্যাপারে তাঁদের আবিষ্কার এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

পুরস্কার পেয়েছেন সম্মিলিতভাবে তিন জন। বারুজ বেনেসেরাফ, জর্জ স্নেল এবং জেন দসে।

বেনেসেরাফের কর্মস্থল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। জন্মস্থান ভেনেজুয়েলার করাকাস। শিক্ষা প্রথম দিকে প্যারি শহরে। পরে মার্কিন দেশে এসে প্রথমে নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং অবশেষে চিকিৎসাবিজ্ঞানে গবেষণা শুরু করেন ভার্জিনিয়ার মেডিকেল কলেজে। ১৯৪৩ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন।

পরবর্তীকালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে গবেষণার জন্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তিনি কাজ করেছেন। এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল স্কুল, প্যারির ব্রোসা হাসপাতাল, নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল স্কুল, ওয়াশিংটনের নিকটস্থ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেল্‌থ এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৭০ সাল থেকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাথলজি বিভাগের তিনি চেয়ারম্যান। সম্প্রতি তিনি বস্টনের সিডনি ফারবার ক্যানসার ইনস্টিটিউটের সভাপতি হয়েছেন।

স্নেল-এর জন্ম ম্যাসাচুসেটসের হ্যাভারহিল শহরে। শিক্ষা ডার্টমাউথ কলেজে ১৯৩০ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ ডি। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'জেনেটিক্‌স'। ১৯৩৫ সালে তিনি বার হার্বারের জ্যাকসন ল্যাবোরেটারিতে যোগ দেন এবং তিন বছর আগে ওই প্রতিষ্ঠান থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সেস-এর সদস্যরূপে মনোনীত হন। ১৯৭৮ সালে মনোনীত হন ফ্রেনকো অ্যাকার্ডাম অব সায়েন্সসের সদস্য। এর আগে উল্লেখযোগ্য গবেষণার জন্যে চেকোস্লাভ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস তাঁকে 'গ্রেগর মেনডেল' পদক দিয়ে সম্মানিত করেন। যে কাজের জন্যে তিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন, তার সূচনা ১৯৪২ সালে।

"খুবই মৌলিক গবেষণা।" সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেছেন স্নেল। "ব্যাপারটা যে খুব হঠাৎ করেই ঘটেছে, সে কথা বলব না। বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে দীর্ঘদিন।...এক প্রাণীর দেহে অপর প্রাণীর ত্বক অথবা কোন প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন করতে গিয়ে আমরা দেখলাম, প্রতিস্থাপনের পর সেই ত্বক অথবা প্রত্যঙ্গ কখনও গৃহীত হচ্ছে, কখনও পরিত্যক্ত হচ্ছে। আমরা জানতাম এই গ্রহণ এবং বর্জনের কাজটি চালিয়ে থাকে 'জিন'। 'জিন'ই স্থির করে একের পক্ষে অপরের ত্বক বা প্রত্যঙ্গ কখন গ্রহণীয় অথবা বর্জনীয় হবে। কীভাবে সেটা ঘটে সেই রহস্য উদ্ধারের জন্যে আমরা গবেষণায় হাত দিলাম।"

এই গবেষণা চালাতে গিয়ে স্নেল তাঁর গবেষণাগারে বিভিন্ন প্রজাতির ইঁদুর তৈরি করেন এবং তাদের নিয়ে পরীক্ষা চালান। এই পরীক্ষা ত্বক এবং প্রত্যঙ্গের প্রতিস্থাপনের ব্যাপারে 'জিনের প্রত্যক্ষ ভূমিকা সম্পর্কে প্রচুর নাটকীয় তথ্য যোগাতে সমর্থ হয়েছে। পরে দসে প্রমাণ করেন, ইঁদুরের অনুরূপ জিন মানুষের দেহেও রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে একটি নতুন কথাও শুনিয়েছেন স্নেল: 'হিসটোকমপার্টিবিলিটি কমপ্লেকস।' জীবদেহে এক শ্রেণীর রাসায়নিক যোগ অত্যন্ত সক্রিয়। এদের বলা হয় 'অ্যান্টিজেনস'। এরা মুখ্যত প্রোটিন শ্রেণীর যোগ। প্রতিটি জীবকোষেই 'অ্যান্টিজেন' থাকে। তবে তাদের গঠন এবং বৈশিষ্ট্য কোষ-বিশেষে ভিন্নতর হয়। ত্বক অথবা প্রত্যঙ্গের প্রতিস্থাপন সম্ভব, কি সম্ভব নয়, এই অ্যান্টিজেনই তা স্থির করে। যে সব অ্যান্টিজেন এ ধরনের কাজের জন্যে দায়ী তাদের বলা হয় 'হিসটোকমপ্যাটিবিলিটি অ্যান্টিজেনস'। আর যে সব জিন এই 'অ্যান্টিজেনস'-এর কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে তাদের বলা হয় 'হিসটোকমপাবিলিটি জিনস'। স্নেল দেখিয়েছেন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিস্থাপনই শুধু নয়, শরীরে ক্ষতিকর কোন ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া অথবা কোন বস্তু প্রবেশ করলে এই সব জিনই তাদের প্রতিরোধ ক'রে রোগের হাত থেকে প্রাণীদের রক্ষা করে।

বেনাসেরাফ প্রমাণ করেছেন, কোন ব্যক্তির ভাইরাস, প্রভৃতির আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার ক্ষমতা তার বংশগত সূত্রে পাওয়া নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর

নির্ভর করে। গিনিপিগের দেহে নিজের তৈরি এক ধরনের সংশ্লেষিত বস্তু ঢুকিয়ে দিয়ে এই সত্যে তিনি উপনীত হন।

বেনাসেরাফ এক ধরনের জিন আবিষ্কার করেছেন। এই জিন শরীরের বাইরে থেকে আগত রোগসৃষ্টিকারী ভাইরাস বা বস্তুকণাকে প্রতিহত করতে পারে। তিনি দেখিয়েছেন এই 'রোগপ্রতিরোধী জিন' প্রাণী তার নিজস্ব দেহের মধ্যেই বংশগত সূত্রে লাভ করে। তিনি দেখিয়েছেন, কোন আক্রমণকারী ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং অন্যের দেহের প্রতিস্থাপনযোগ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যখন কোন প্রাণীর দেহে সংস্থাপিত হয়, তখন ওই জিন দু'ধরনের কাজ করে থাকে। প্রথমতঃ তারা তৈরি করে এক ধরনের বস্তু। এই বস্তুটি আক্রমণকারী ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া এবং প্রতিস্থাপিত প্রত্যঙ্গের কোষ-তলের (সেলস সারফেস) অঙ্গরূপে পরিণত হয়। এ যেন দাগ কেটে ওই কোষগুলি চিহ্নিত করে দেওয়া। পরিষ্কার করে বোঝান যায় দেহের নিজস্ব কোষ থেকে তারা পৃথক। এটা করা হয়, যাতে করে রক্তের শ্বেত কণা এদের চিনে নিতে পারে। এরপর ওই জিন বিভিন্ন ধরনের শ্বেত কণার (লিমফোসাইটস্) মধ্যে বার্তা পাঠিয়ে কীভাবে ওই সব আক্রমণকারী-দের সাবাড় করতে হবে তা জানিয়ে দেয়। "এই কাজ মানুষকে নিরোগ করে তুলতে সাহায্য করবে।" বেনাসেরাফের মন্তব্য।

দসে তাঁর গবেষণায় স্নেলের 'কোষ-কলায় প্রতিস্থাপন' পদ্ধতিটিই কাজে লাগিয়েছেন। তিনি পরীক্ষাগারে ইঁদুরের কোষ মানুষের কোষ-কলায় প্রতিস্থাপন করতে সমর্থ হন। এবং সেটা করতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন কোষের চিহ্নিতকরণের কাজটিও করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন রক্তের 'এ', 'বি', 'ও' প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ আছে, প্রাণীর কোষকলারও রয়েছে তেমনি শ্রেণীবিভাগ। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'টিস্যু টাইপিং'। একজনের রক্ত অপরের শরীরে দেওয়ার সময় দেখে নিতে হয় উভয় রক্তের মধ্যে মিল আছে কী, না। কারোর শরীরে 'এ' শ্রেণীর রক্ত থাকলে তাকে 'এ' শ্রেণীর রক্তই দিতে হয়, 'বি' শ্রেণীর রক্ত সে গ্রহণ করতে পারে না। ঠিক তেমনি কোন প্রাণীর প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন করার আগে দেখা দরকার সেই প্রত্যঙ্গের কোষকলা কোন্ শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। যদি দাতা এবং গ্রহীতার কোষ-কলা একই শ্রেণীভুক্ত হয় একমাত্র সেক্ষেত্রেই প্রতিস্থাপনের পর বর্জনের সম্ভাবনা থাকে না। এই আবিষ্কার একের কিডনি প্রভৃতি অপরের দেহে প্রতিস্থাপনের কাজে সাহায্য করবে।

নোবেল পুরস্কারের সংবাদ ঘোষিত হওয়ার পর দসে মন্তব্য করেছেন, "আমরা তিন জনই পরস্পরের নিকটতম বন্ধু। স্নেল এবং বেনাসেরাফের গবেষণাগারে গিয়ে বহুবার আমি কাজ করেছি। আবার ওঁরাও বহুবার প্যারীতে আমার গবেষণাগারে এসে কাজ করেছেন। আমরা একই পথের পথিক।"



নোবেল পুরস্কার ১৯৮১

পদার্থ বিজ্ঞান

এক্স্-রশ্মি বর্ণালীবীক্ষণের উপর অসামান্য গবেষণা এবং উদ্ভাবনার স্বীকৃতি হিসেবে ১৯২৪ সালে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল সুইডেনের বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক কার্ল মালে জর্জ সিগবাহন-কে। ১৯৮১ সালে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন জর্জের সুযোগ্য পুত্র অধ্যাপক কাই সিগবাহন। এবং একই সঙ্গে আরও দুই বিজ্ঞানী। অধ্যাপক ব্লোয়েমবার্গেন এবং আর্থার শ্যালো। কাই সিগবাহনের কর্মস্থল সুইডেনের 'উপসলা বিশ্ববিদ্যালয়। ব্লোয়েমবার্গেন এবং শ্যালোর যথাক্রমে হার্ভার্ড এবং স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

"অ্যাটমিক স্পেকট্রোস্কোপি বা পারমাণবিক বর্ণালীবীক্ষণবিদ্যার ক্ষেত্রে অনবদ্য গবেষণা, উদ্ভাবনা এবং তার সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার কথা স্মরণ করেই এই ত্রয়ী বিজ্ঞানীকে ১৯৮১ সালের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হল। এঁদের গবেষণা বর্ণালীবীক্ষণ বিদ্যার দুটি দিগন্ত উন্মিলিত করেছে। একটি 'লেজার স্পেকট্রোস্কোপি'। অপরটি 'হাই রেজোলিউশন ইলেকট্রন স্পেকট্রোস্কোপি'। 'লেজার স্পেকট্রোস্কোপি বিষয়ক গবেষণার দরুন পুরস্কার পেলেন ব্লোয়েমবার্গেন এবং শ্যালো। এবং 'ইলেকট্রন স্পেকট্রোস্কোপি'র ক্ষেত্রে একাধিক তত্ত্ব এবং মৌলিক উদ্ভাবনার স্বীকৃতি স্বরূপ নোবেল পুরস্কার পেলেন কাই সিগবাহন। এঁদের গবেষণা আলোক তরঙ্গ এবং বিকীরণ মেপে পারমাণবিক গঠন সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য যোগাতে সমর্থ হয়েছে।" পুরস্কার ঘোষণার সময় এই মন্তব্যটি করেছেন সুইডিশ অ্যাকাডেমি অভ্ সায়ানসেস্।

পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস। এই নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কক্ষ-পথে পরিক্রমণ করে ইলেকট্রন কণা। বিজ্ঞানীরা এক সময় মনে করতেন, এই পরি-ক্রমণের ব্যাপারটা কতকটা সৌরমণ্ডলের মত। সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রে সূর্য। সেই সূর্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গ্রহ যেমন পরিক্রমণ করে, ইলেকট্রনও ঠিক তেমনি পরিক্রমণ করে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চারপাশে। পরে জানা গেল, পরিক্রমণ করে ঠিকই

কিন্তু ইলেকট্রনের সেই পরিক্রমণ সব সময় নির্দিষ্ট পথে আবদ্ধ হয়ে থাকে না। উত্তাপ অথবা বিভিন্ন বিকিরণের স্পর্শে ইলেকট্রন কণা উদ্দীপ্ত হয়। তখন তারা নিজস্ব স্থিতিশীল সঞ্চারপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে ভিন্নতর সঞ্চারপথে সরে যায়। বিকিরণ শক্তি শোষণ করার দরুণই এমনটি হয়ে থাকে। পরে শোষিত শক্তি ত্যাগ করে আবার তারা ফিরে যায় নিজস্ব সঞ্চার পথে। বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ইলেকট্রনের নিজস্ব সঞ্চার পথ ছেড়ে এই ভাবে সরে যাওয়া এবং ফিরে আসার উপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে পারমাণবিক গঠন এবং তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছেন বিজ্ঞানীরা। উল্লেখ্য, ব্লোয়েমবার্গেন, শ্যালো এবং সিগবাহনের উদ্ভাবিত পদ্ধতি এই গবেষণায় যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সায়ানস্‌ ফাউনডেশনের জনৈক বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার ঘোষণার পর মন্তব্য করেন, পরমাণুর ভেতরকার সত্যিকার চেহারা দেখতে গেলে দরকার আলো। বিভিন্ন কম্পাঙ্কের আলোকবিকিরণ পরমাণুর বিভিন্ন সঞ্চার-পথের ইলেকট্রন বিশেষ বিশেষ মাত্রায় উদ্দীপ্ত হয়। ব্লোয়েমবার্গেন এবং শ্যালোর কৃতিত্ব, এ ব্যাপারে তাঁরা 'লেজার' রশ্মি ব্যবহার করেছেন। লেজাররশ্মি অনেক বেশি সমভাবাপন্ন এবং ইচ্ছেমত নিয়ন্ত্রণ করা যায় বলে তার সাহায্যে পরমাণুর অজস্র দশা (infinite number of atomic states) পৃথক অবস্থায় অনেক পরিচ্ছন্ন অবস্থায় পর্যবেক্ষণ করা যায়। লেজারের সাহায্যে এখন এমন অনেকে পরীক্ষানিরীক্ষা চালান সম্ভব হয়েছে অনেকে এর আগে যা কল্পনাও করতে পারেননি। এদিন দিয়ে দেখতে গেলে ব্লোয়েমবার্গেন এবং শ্যালোর অবদান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

পরমাণুর অন্তর-রহস্য উদ্‌ঘাটনে ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপি'র ভূমিকাও কম নয়। এক্ষেত্রে একাধিক অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন সিগবাহন। বিভিন্ন কারণে কখনও কখনও পরমাণুর ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে ইলেকট্রন কণা। কিভাবে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে, বেরিয়ে আসার পর তাদের শক্তির পরিমাণ কোন্‌ ক্ষেত্রে কতটা দাঁড়ায়—সে সব জেনে পরমাণুর নিজস্ব পরিমণ্ডল সম্পর্কে এখন অনেক কথাই জানা সম্ভব হচ্ছে। তার এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছে সিগবাহনের বিভিন্ন পদ্ধতি। এ ব্যাপারে তিনি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই কাজ করে এসেছেন দীর্ঘকাল। এখন বয়েস ৬৩। কিন্তু গবেষণা থেমে নেই। উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন ১৯৫৪ সালে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ই তাঁর গবেষণার প্রাণকেন্দ্র। গোটা সুইডেনেও তিনি অগ্রজ পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিশিষ্টতম হিসেবে পরিগণিত।

রসায়ন

এক সময় রসায়ন শাস্ত্রকে বলা হত পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান। কত রকম মৌলিক পদার্থ পরস্পর বিক্রিয়া করে। তৈরি করে নানারকম যৌগিক পদার্থ। কোন কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানর জন্যে প্রয়োজন হয় উত্তাপ। কখনও বা আলো। কখনও বা সাধারণ তাপমাত্রায় পরস্পর দুটি পদার্থ, তা সে যৌগিক অথবা মৌলিক, যাই হোক

না কেন, বিক্রিয়া করে। কীভাবে তা সংঘটিত হয়, বিভিন্ন পদার্থ কি কি অনুপাতে পরস্পর বৈক্রিয়া করে তৈরি করে নানা রকম যৌগিক পদার্থ; কোন্ বিক্রিয়া ঘটাতে গেলে চাপের প্রয়োজন, কখনও বা দরকার অনুঘটক; এ সব ব্যাপারে অনুসন্ধান করাই এক সময় ছিল রসায়নবিদদের লক্ষ্য। পরীক্ষাগারে বেশির ভাগ সময়ই অনুমানের উপর নির্ভর করে দুই বা ততোধিক বস্তুর মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটনার চেষ্টা করতেন তাঁরা। বিক্রিয়ার পর কি কি সামগ্রী তৈরী হয়েছে তা লক্ষ্য করতেন, পরিমাপ করতেন সেইসব সামগ্রীর। সেই সঙ্গে নির্ণয় করতেন পদার্থের ভৌতিক এবং রাসায়নিক ধর্মাবলী।

আবিষ্কৃত হল কোয়ানটাম তত্ত্ব। এই তত্ত্ব রাসায়নিকদের যোগাল নতুন ভাষা। এবার আর অনুমান নয়। অণু পরমাণুর রাসায়নিক চরিত্র বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যার জন্যে রসায়ন বিজ্ঞানীরা এবার কাজে লাগালেন স্থিরতড়িৎবিদ্যার মৌল সূত্রাবলী থেকে পদার্থবিদ্যা, কোয়ানটাম বলবিদ্যা এবং পরিসংখ্যান বলবিদ্যা বা স্ট্যাটিসটিক্যাল মেকানিক্সের নানা রকম সূত্র। এই সব সূত্রের উপর নির্ভর করে বিজ্ঞানীরা দাঁড় করাতে লাগলেন একের পর একটি যৌগের তাত্ত্বিক গঠন। গবেষণাগারে কোন রকম পরীক্ষানিরীক্ষা না চালিয়ে এইভাবে অনেক রাসায়নিক যৌগের অস্তিত্ব সম্পর্কে আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হলো।

রসায়নবিদ্যার ক্ষেত্রে যে মূল্যবান গবেষণার দরুন এ বছর স্টকহোমের সুইডিশ রয়েল অ্যাকাডেমি অভ্ সায়ানসেস যে দুই জন বিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করলেন, সেই গবেষণার এটাই প্রতিপাদ্য বিষয়। দুইজন বিজ্ঞানী—করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রোনাল্ড হফ্‌ম্যান এবং জাপানের কিওটো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কেনিচি ফুকি রয়েল অ্যাকাডেমি অভ্ সায়ানস থেকে বলা হয়েছে, ওঁরা পরস্পর স্বাধীনভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংশ্লিষ্ট নানারকম তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন। এই সব তত্ত্ব পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগ সংশ্লেষণ এবং তাদের ধর্মাবলী জানার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

গোড়ায় হফ্‌ম্যানের গবেষণার বিষয়বস্তু রাসায়নিক বিক্রিয়াবিষয়ক অনুসন্ধান। ওই সময় স্থায়ী এবং অস্থায়ী অণুর ইলেকট্রনিক গঠনসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতে শুরু করেন। সেই সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া চলার সময় অণুর যে 'পরিবর্ত-দশা' বা 'ট্রান্‌জিশনাল স্টেট-এর উদ্ভব হয় সে সব নিয়েও গবেষণা শুরু করেন তিনি। এই গবেষণায় তিনি একাধিক গাণিতিক সূত্রের সাহায্য নেন। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য অবদান 'হুকেল' পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস এবং তার সম্প্রসারণ। এই কাজ অণুর ইলেকট্রনীয় গঠনবৈচিত্র্য জানার ব্যাপারে সাহায্য করেছে এবং বিভিন্ন যৌগঅণুর সম্ভাব্য অস্তিত্ব নির্ণয়ের ব্যাপারটা সহজতর করে তুলেছে। তাঁর গবেষণা জৈবরাসায়নিক বিক্রিয়া চলার সময় যে সব অন্তবর্তী মৌল তৈরি হয় সে সম্পর্কে পূর্বাভাস যোগাতে সমর্থ হয়। শেষোক্ত এই কাজে তাঁর সহযোগী হিসেবে অংশ গ্রহণ করেন বিশিষ্ট রসায়নবিজ্ঞানী অধ্যাপক রবার্ট বি. উডওয়ার্ড। এ ছাড়া হফ্‌ম্যানের গবেষণা বিভিন্ন জৈব এবং অজৈব অণুর জ্যামিতিক গঠন এবং ক্ষমতা নির্ণয়েও সাহায্য করেছে প্রচুর

মস্তিষ্ক যেন এক রহস্যময় জগৎ। আমরা চোখ দিয়ে দেখি। উন্মুক্ত চোখের সামনে কত রকম দৃশ্যই না ভেসে ওঠে। তারপর স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে সংবাহিত হয় মস্তিষ্কে। স্মৃতির মণিকোঠায় আশ্রয় নেয়। প্রশ্ন এই, কোথায় থাকে স্মৃতির সেই মণিকোঠা? মস্তিষ্কের সঠিক কোন্ অঞ্চলে গিয়ে তারা সঞ্চিত হয়? আমরা কান দিয়ে শুনি, নাকের সাহায্যে ঘ্রাণ নিই। শ্রবণ এবং ঘ্রাণের যে অনুভূতি, তাদের বিশ্লেষণ এবং তাদের সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি যোগানর দায়িত্বই বা কিভাবে পালন করে আমাদের মস্তিষ্ক? মানুষ এবং মনুষ্যেতর প্রাণী, যেমন বেড়াল, বানর, প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য কোথায়? এই পার্থক্য কতটা বংশগত এবং কতটা অর্জিত? স্টকহোমের ক্যারোলিন্‌সকা ইনস্‌টিটিউট ১৯৮১ সালের নোবেল পুরস্কার দিয়ে যে ত্রয়ীবিজ্ঞানীদের সম্মানিত করলেন তাঁদের গবেষণা এমন অনেক প্রশ্নেরই সমাধান যোগাতে সাহায্য করেছে।

ও'রা তিনজন। রজার ডব্লু স্পেরি। বয়েস ৬৮। ডেভিড হিউবেল, ৫৫ এবং টরস্‌টেন ভিজেল ৫৭। পুরস্কারের আর্থিক পরিমাণ ১,৮০,০০০ মার্কিন ডলার। এই অর্থের অর্ধেক পেলেন স্পেরি। বাকি অর্ধেক হিউবেল এবং ভিজেল।

স্পেরির জন্ম ১৯১৩ সালে, কনকটিকাটের হারট্‌ফোরড-এ। শিক্ষা হারভারড বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত তাঁর কর্মস্থল ছিল শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫৪ সালে মনোজীববিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন ক্যালিফোরনিয়া ইনস্‌টিটিউট অভ্ টেকনোলজি-তে। বর্তমানে এটাই তাঁর কর্মকেন্দ্র। উল্লেখ্য যে কৃতিত্বের জন্যে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল, সেই একই কাজের দরুন ১৯৭৯ সালে তাঁকে 'লাসকের বেসিক মেডিকেল রিসারচ' পুরস্কার দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। 'উলফ্' পুরস্কারও পান তিনি। ১৯৭৬ সালে ব্রিটিশ রয়েল সোসাইটির বিদেশী সদস্যরূপে নির্বাচন।

ভিজেলের জন্ম সুইডেনে, ১৯২৪ সালে। ক্যারোলিন্‌সকা ইনসটিটিউটে লেখাপড়ার পর ১৯৫৫ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসে জন হপকিন্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজে রত হন। এখানেই হিউবেলের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। হিউবেলের জন্ম ১৯২৬ সালে, কানাডায়। একসময় ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন তিনি।

প্রসঙ্গ স্তন্যপায়ী প্রাণীর মস্তিষ্ক। প্রকৃতির কি অদ্ভুত পরিকল্পনা! স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেহে যেমন থাকে দুটি কিডনি, একজোড়া চোখ, একজোড়া কান, জোড়ায় জোড়ায় হাত পা; তেমনি তার মস্তিষ্কও দুইটি। ডান-মস্তিষ্ক এবং বাম-মস্তিষ্ক। গঠন এবং কাজকর্মের দিক দিয়ে দেখলে মনে হয় তারা যেন যমজ। উভয়েরই নিজস্ব অনুভূতি ক্ষমতা আছে। সেইসঙ্গে আছে নানারকম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণের যোগ্যতা। দেখা, শোনা, ঘ্রাণ গ্রহণ, পেশী সঞ্চালন এমন অনেক কিছুতে তারা স্বতন্ত্রভাবে সাড়া দিয়ে থাকে। এসব ব্যাপারে স্তন্যপায়ী প্রাণীর বাম অঙ্গের উপর

কর্তৃত্ব করে ডান-মস্তিষ্ক এবং ডানদিকের অঙ্গের উপর কর্তৃত্ব করে বাম মস্তিষ্ক। অবশ্য কখনও এমনও হতে পারে, ডান-মস্তিষ্কের কোন অংশ হয়ত অকেজো হয়ে গেল। তখন ওই অংশের দায়িত্বভার নেয় বাম-মস্তিষ্কের অনুরূপ অংশ। স্বাভাবিক অবস্থায় উভয় মস্তিষ্কের কাজকর্ম মিলিতভাবেই সম্পন্ন হয়। উভয় মস্তিষ্ককে পরস্পর জুড়ে রাখে রজ্জুর মত একটি বস্তু। যার নাম 'গ্রেট সেরিব্রাল কমিসার' বা 'করপাস ক্যালোসাম।' এছাড়া উভয়ের সংগে সংযোগ রেখে চলে অসংখ্য স্নায়ুতন্তু।

বছর তিরিশ আগে বেড়ালের মস্তিষ্কের এইসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা চালানর সময় স্পেরি এবং তাঁর সতীর্থ রোনাল্ড ই মায়ারস একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার করে বসলেন। তাঁরা দেখলেন, দুটি মস্তিষ্ক পরস্পর থেকে পৃথক করার পর, তারা প্রত্যেক স্বাধীনভাবে তাদের ভূমিকাগুলি পালন করে। যেন মস্তিষ্কের প্রতিটি অর্ধাংশ এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মস্তিষ্ক। এছাড়া প্রতিটি চোখের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে স্নায়ুতন্তু বা 'অপটিক নার্ভ'। দুই চোখের আলোক অনুভূতিবাহী যেখানে আড়াআড়িভাবে রয়েছে, সেই জায়গাটিকে বলা হয়, 'অপটিক কিয়াজম'। এই 'অপটিক কিয়াজমকেও বিভক্ত করা হল, এমনভাবে যাতে করে বাঁ চোখের অনুভূতি স্নায়ু একমাত্র বাঁদিকের মস্তিষ্কেই সংবাহিত হয়, এবং চোখের অনুভূতি সংবাহিত হয়, ডানদিকের মস্তিষ্কে। এক্ষেত্রেও পরীক্ষাটি করা হল বেড়ালের উপর। তাঁরা দেখলেন, 'অপটিক কিয়াজম' বিভক্ত করার পর বেড়ালের একটি চোখ যখন ঢেকে দেওয়া হয়, অপর চোখটি তখন স্বাভাবিকভাবেই কাজ করে। কোন কিছু দেখার ব্যাপারে শিক্ষা দিলে ধীরে ধীরে তা রপ্ত করে নেয়। এবার ওই চোখটি ঢেকে দিয়ে যখন অপর চোখটি ঢেকে দিয়ে যখন অপর চোখটি খুলে দেওয়া হল, তখন আগের দেখা ঘটনাবলী সে চিনতেই পারল না। সেইসব ঘটনাবলী তার মস্তিষ্কের দৃষ্টি-অনুভূতির মধ্যে জাগিয়ে তোলার জন্যে আবার নতুন করে তালিম দিতে হল বেড়ালটিকে। তার মানে 'করপাস ক্যালোসাম' যদি কেটে পৃথক করা হয়, তা হলে অবস্থাটা কি এমন দাঁড়াবে যে, ডানহাত কি করছে সেটা বাঁহাত আর জানতে পারবে না? ধরা যাক মস্তিষ্কের দুই হেমিস্ফিয়ার পৃথক করা হল। সেক্ষেত্রে কতটা তারা স্বনির্ভর হতে পারবে? তখন তাদের চিন্তাভাবনাও কি চলবে পৃথকভাবে? তাদের আবেগের অনুভূতিও কি হবে স্বতন্ত্র? যেমন দেখা যায় দুটি পৃথক মানুষের সত্তায়?

জানা গেল, মস্তিষ্কের দুটি হেমিস্ফিয়ার পরস্পর বিচ্ছিন্ন হলে বিভিন্ন অনুভূতি সাময়িক ভাবে ব্যাহত হয়। তবে পরে তাদের কাজকর্ম স্বাভাবিক করে তোলাও সম্ভব। স্পেরি দেখিয়েছেন, মস্তিষ্কের বিভিন্ন ভূমিকায় সংহতি রাখার ব্যাপারে 'করপাস ক্যালোসাম'-এর অবদান অসামান্য। বেড়াল কুকুর প্রভৃতি প্রাণীর এই অঙ্গটি তুলনায় অনেক ছোট এবং শীর্ণকায়। বানর এবং অনুরূপ প্রাণীর ক্ষেত্রে অনেকটা বড়। মানুষের করপাস ক্যালোসাম' অনেক বেশি বড় এবং স্থূলকায়। স্পেরির বক্তব্য, 'করপাস ক্যালোসাম'-এর আয়তন এবং অবস্থানের উপর মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজকর্ম করার ক্ষমতা নির্ভর করে।

১৯৩০এর দশকে মৃগীরোগের প্রাবল্য কমানের জন্যে শল্যচিকিৎসকরা বেশির ভাগ সময় পুরো 'করপাস ক্যালোসাম'ই কেটে ফেলতেন। তাঁরা মনে করতেন, এই ভাবে মস্তিষ্কের একটি হেমিস্ফিয়ার থেকে অপর হেমিস্ফিয়ারে এই রোগটির বিস্তার প্রতিরোধ করা সম্ভব। এ ধরনের শল্যচিকিৎসা করতে গিয়ে মস্তিষ্কের অন্যান্য কাজকর্মও যে ব্যাহত হতে পারে, সে ব্যাপারে কোন সঠিক তথ্যই তখন জানা সম্ভব ছিল না।

স্পেরি প্রমাণ করেছেন বেড়ালের মস্তিষ্কের সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার দুইটি পরস্পর থেকে পৃথক করলেও সাধারণ মস্তিষ্কযুক্ত বেড়ালের মতই তারা আচরণ করে। বানরের ক্ষেত্রে অবশ্য কিছুটা গোলমাল দেখা যায়। এবং মানুষের ক্ষেত্রে এটা আরও প্রকট হয়ে দেখা দেয়। তাঁর পদ্ধতি মস্তিষ্কের সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার দুটিকে পরস্পর থেকে বিযুক্ত করতে সাহায্য করেছে। এবং এই ভাবে কষ্টকর মৃগী রোগের বিভিন্ন উপসর্গ লাঘব করার ব্যাপারে ইন্ধন যুগিয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন, 'করপাস ক্যালোসাম'-এর অনুপস্থিতিতে মস্তিষ্কের পক্ষে কোন অভিজ্ঞতা রপ্ত করার কাজটি শ্লথ হয়ে আসে। তিনি প্রমাণ করেছেন, মস্তিষ্কের এক এক অংশের দায়িত্ব এক এক রকম। দেখা, শোনা, শব্দ সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা প্রভৃতি কাজকর্ম এই সব অংশের কর্মক্ষমতার উপরই নির্ভর করে। আর তাদের তৎপরতা নির্ভর করে অনেকটা বংশগতিরই উপর।

১৯৩০এর দশকে স্পেরি আবিষ্কার করেন, কর্মক্ষমতার দিক দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্নায়ুর দায়িত্ব নির্দিষ্ট ; এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে বিনিময় চলে না। এ ছাড়া মস্তিষ্কের ভূমিকাও স্থির অবস্থায় থাকে না। তিনি প্রমাণ করেন, স্তন্যপায়ী প্রাণীর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বা 'সেনট্রাল নার্ভাস সিসটেম' এক নির্দিষ্ট পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী বৃদ্ধি পায়, আর এই পূর্বপরিকল্পনা বংশগতির উপর নির্ভর করে। ১৯৪০-এর দশকে প্রকাশিত হয় তাঁর 'কেমো অ্যাফিনিটি' তত্ত্ব। এই তত্ত্ব 'সাইটো-কেমিসট্রি' বা কোষ-রসায়ন, জেনেটিকস, প্রভৃতি বিদ্যার সাহায্যে কী ভাবে মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ঘটে এবং তার কর্মক্ষমতা বিকশিত হয় সে ব্যাপারে ব্যাখ্যা যোগাতে সমর্থ হয়েছে।

নোবেল কমিটির বক্তব্য : স্পেরির গবেষণা প্রমাণ করেছে, মস্তিষ্কের একটি নিজস্ব জগৎ রয়েছে। ভাষা এবং অভিজ্ঞতাপ্রসূত চিন্তা ভাবনার দায়িত্ব মস্তিষ্কের বাম-হেমিস্ফিয়ার অংশটির উপরই বর্তায়। আর ডান-হেমিস্ফিয়ারের কাজ স্বতঃলব্ধ জ্ঞান (intuition) এবং সৃজনশীল ক্ষমতা যোগান। সুনির্দিষ্ট চিন্তা ভাবনা, স্থান কাল পাত্র সম্পর্কে সচেতন এবং জটিল উপলব্ধি এ-সব ডান-হেমিস্ফিয়ারের উপরই নির্ভর করে।

দৃশ্যমান জগৎ চোখ থেকে স্নায়ুর মাধ্যমে কিভাবে মস্তিষ্কের কোন অংশে সঞ্চারিত হয়, 'দেখার অনুভূতি' সৃষ্টি করে, এই নিয়ে হিউবেল ও ভিজেলের গবেষণা।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এঁদের গবেষণা ভবিষ্যতে অনেক মানসিক এবং স্নায়বিক রোগ নিরাময়ে সাহায্য করবে। সাইকোসেস, শিজোফ্রেনিয়া, ডিপ্রেসন, মানসিক বৈক্লব্য শিক্ষার ক্ষেত্রে অপারদর্শিতা, সন্ন্যাস এবন অনেক রোগের চিকিৎসাই সহজতর হবে।



নোবেল পুরস্কার ১৯৮২

পদার্থ বিজ্ঞান

আশাতীত খবরই বলতে হয়। স্টকহোম থেকে সুইডিশ অ্যাকাডেমি অভ্ সায়ানসেসের কাছ থেকে খবরটি পেয়ে বিস্মিতই হয়েছিলেন ডঃ কেনেথ সি. উইলসন। খবরে বলা হয়, ১৯৮২ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন মাত্র একজন। নিউইয়র্কের করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ কেনেথ সি. উইলসন। নোবেল কমিটি তাঁর নির্বাচন প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন "Critical phenomena in connection with phase transition" এর উপর তাঁর তত্ত্বের জন্যেই তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হল। নোবেল কমিটির সচিব অধ্যাপক বেট নাগেল, যিনি নিজেও একজন তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী, তাঁর বক্তব্য, "উইলসনকে আমরা কোপারনিকাসের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কিত সমকালীন জ্ঞানকে যেমন নির্ভরযোগ্য যুক্তি তর্কের মাধ্যমে অর্থবহ করে তুলেছিলেন কোপারনিকাস, উইলসনও ঠিক তাই করেছেন। পদার্থের বিভিন্ন দশা সম্পর্কিত বহুজ্ঞাত তথ্য এবং তত্ত্বাবলী তাঁর গবেষণায় অনেক বেশি অর্থবহ হয়ে উঠেছে।" উল্লেখ্য, এই একই বিষয়ের উপর এর আগে কয়েকজন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। যাঁদের মধ্যে অন্যতম সোভিয়েত বিজ্ঞানী লেভ ল্যানডাউ। তিনি নোবেল পুরস্কার পান ১৯৬২ সালে। আর একজন নরওয়েতে জাত মার্কিন নাগরিক লার্স ওনসাগের। তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় ১৯৬৮ সালে।

উইলসন বলেছেন, "পুরস্কারটি আমি একা পেলাম, এর জন্যই আমি বিস্মিত। আমার সঙ্গে আরো দুইজনকে এই পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা উচিত ছিল। ও'রা হলেন আমার দুই সতীর্থ—করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইকেল ফিশার এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের লিও কাদানফ্। এই একই বিষয়ের উপর গবেষণা করে আমরা একসঙ্গে ইজরায়েলের 'উল্ফ' পুরস্কার পেয়েছিলাম।"

১৮ সেপটেমবর, ১৯৮০ উইলসন ফিশার এবং কাদানফ-কে ইজরায়েলের লোকসভা 'নেসেৎ'-এ আমন্ত্রণ জানিয়ে বিখ্যাত 'উলফ্ পুরস্কার' দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল।

পুরস্কারটি দিয়ে থাকেন উলফ্ ফাউনডেসন। পুরস্কারের আর্থিক মূল্য ১০০০০০ ডলার। এ ক্ষেত্রেও বলা হয়, ওই ত্রয়ী বিজ্ঞানীদের অবদান।

সবাই জানেন, পদার্থমাত্রই তিনটি অবস্থায় বিরাজ করতে পারে—কঠিন তরল এবং গ্যাসীয়। নিম্ন তাপমাত্রায় জল কঠিন অবস্থায় বিরাজ করে। তাপমাত্রা বাড়ালে জল তরল অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সেই তরল জলই রূপান্তরিত হয় গ্যাসে। পদার্থের অবস্থার এ ধরনের পরিবর্তনের মূলে মুখ্যত কাজ করে চাপ এবং তাপ। আবার এমন অবস্থাও সৃষ্টি করা যায় যেক্ষেত্রে জল একই সঙ্গে তরল এবং বাষ্পীয় অবস্থায় বিরাজ করতে পারে। বিজ্ঞানীরা এ ধরনের অবস্থা বা 'দশা'র নাম দিয়েছেন 'চরম দশা' বা Critical state। এ সব ব্যাপার নিয়ে তাত্ত্বিক এবং পরীক্ষামূলক গবেষণা করেছেন একাধিক বিজ্ঞানী—ভ্যানডার ওয়ালস, অ্যানড্রুজ, ম্যাকসওয়েল প্রভৃতি।

পরবর্তী সময়ে পদার্থ সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য জানা গেল। জানা গেল, পদার্থ অণুর সমষ্টি। সৃষ্ট হল পারমাণবিক তত্ত্ব। জানা গেল পরমাণু অখণ্ডনীয় কণা নয়। যে কোন পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে দুই রকম কণা—প্রোটন এবং নিউট্রন (এক মাত্র হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসে প্রোটন থাকে, নিউট্রন থাকে না)। প্রোটন ধনাত্মক তড়িৎধর্মী কণা। নিউট্রন কণা তড়িৎনিরপেক্ষ। জানা গেল, নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে পরিক্রমণ করে ঋণাত্মক তড়িৎধর্মী কণা ইলেকট্রন। জানা গেল, যে সব ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি থেকে পরিক্রমণ করে তাদের উপর নিউক্লিয়াসের টান অনেক বেশি। তুলনায় নিউক্লিয়াসের দূরবর্তী অঞ্চলে পরিক্রমণ রত ইলেকট্রনের উপর টান কম। যে সব ইলেকট্রন পরমাণুর বহির্তলে অবস্থান করে—তাদের বলা হয় 'তলীয় ইলেকট্রন' বা Surface electron। উত্তাপ অথবা অন্যান্য বিকিরণের প্রভাবে এই সব ইলেকট্রন সহজেই পরমাণুর পরিমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। পরিবর্তিত হয়ে পরমাণুর গুণগত অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। পারমাণবিক কণার তড়িৎ এবং চৌম্বক ধর্মের উপরও নির্ভর করে পদার্থের গুণগত অবস্থা।

কোন বস্তু যখন কেলাস গঠন করে তখন কি ভাবে সজ্জিত হয় তার পরমাণু? কি ভাবে সজ্জিত থাকে কেলাসের অভ্যন্তরে ইলেকট্রন কণার সমাহার?

আবিষ্কৃত হল দুই শ্রেণীর পারমাণবিক কণা—হ্যাড্রনস্ এবং লেপটনস্। হ্যাড্রনস্-এর মধ্যে পড়ে প্রোটন এবং নিউট্রন। এই সব কণা প্রবল পারমাণবিক 'বল' বা Strong force-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। হ্যাড্রনস্ আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। 'বেরিয়নস' এবং 'মেসনস'। প্রোটন এবং নিউট্রন বেরিয়নের মধ্যে পড়ে। মেসন গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে 'পাইওন' এবং কেওন কথা। লেপটনস শ্রেণীর মধ্যে পড়ে ইলেকট্রনের হাল্কা কণা, যারা 'প্রবল বল'-এ প্রভাবিত হয় না, হয় 'দুর্বল বল'-এ (week force)। তৈরি হল নতুন তত্ত্ব। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ পারমাণবিক কণা দিয়ে তৈরি যাদের বলা হল 'কোয়ার্ক'। তাবৎ বেরিয়ন তাবৎ কণা তৈরি হয় তিনটি কোয়ার্কের সমবায়ে। তাবৎ মেসন কণা তৈরি হয় একটি 'কোয়ার্ক' এবং একটি 'অ্যান্টি কোয়ার্কের' সমবায়ে।

উইলসনের কৃতিত্ব, কোয়ানটাম মেকানিকস স্ট্যাটিসটিক্যাল মেকানিকস; আধুনিকতম চৌম্বক তত্ত্ব এবং কণা তত্ত্বের সমন্বয়ে তিনি একাধিক তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে পদার্থের অবস্থা, অবস্থাগত পরিবর্তন এবং এক অবস্থা থেকে অপর অবস্থায় রূপান্তরের ব্যাপারে বলিষ্ঠ ব্যাখ্যা যোগাতে সমর্থ হয়েছেন। কোন্ অবস্থায় পরমাণুর অভ্যন্তরে কোন্ পারমাণবিক কণা কি ভাবে আচরণ করে তাঁর তত্ত্ব সে সম্পর্কেও করেছে আলোকপাত।

উইলসনের বয়েস এখন ৪৬। গত কয়েক বছর করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে জড়িত রয়েছেন। এ ছাড়া ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অ্যাটমিক' এবং 'সলিড স্টেট' ফিজিকস গবেষণাগারের সদস্য। ১৯৫৬ সালে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন (AB)। এর পাঁচ বছর পর ক্যালিফোর্নিয়া ইনসটিটিউট অভ টেকনোলজি থেকে ডক্টরেট করেন। ১৯৬২-৬৩ সালে জেনিভায় ইয়োরোপীয়ান অরগ্যানাইজেশন ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ-এ ফের্ড ফাউণ্ডেশন ফেলো এবং পরে এসে যোগ দেন কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে 'Critical phenomena' ছাড়াও কণা পদার্থবিজ্ঞানেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় অংশ গ্রহণ করেন।

রসায়ন

বিষয়, নিউক্লেয়িক অ্যাসিড এবং বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন। জীব-কোষে থাকে নিউক্লিয়াস। বিভাজন করছে না এমন কোন জীব-কোষ যখন বিশেষ ধরনের রঞ্জক বস্তু দিয়ে সিক্ত করা হয় কোষের নিউক্লিয়াস তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রঞ্জকের সঙ্গে নিউক্লিয়াসের বস্তু সামগ্রীর বিক্রিয়ার দরুনই এমনটি ঘটে। তখন নিউক্লিয়াসের মধ্যে দেখা যায় খুদে খুদে কণা অথবা জালের মত সামগ্রী। বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিয়েছেন ক্রোমেটিন। কোষ বিভাজনের সময় এই ক্রোমেটিন অনেক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ক্রোমেটিনের মূল উপাদান ডাই-অকসিরাইবোনিউক্লেয়িক অ্যাসিড বা ডি এন এ এবং কতকগুলি মৌল প্রোটিন যোগ যাদের বলা হয় হিসটোনস। অবশ্য এর মধ্যে অন্যান্য প্রোটিন এবং রাইবোনিউক্লেয়িক অ্যাসিড বা আর এন এ-ও থাকে। তবে স্বল্প পরিমাণে।

একস-রশ্মির সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে ক্রোমেটিনের গঠনের মধ্যে রয়েছে অদ্ভুত এক পর্যায়ক্রমিকতা। তারা পরস্পর একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে অবস্থান করে সে দূরত্ব ১০০ অ্যাংস্ট্রমের মত। ডি এন এ-র মধ্যে সজ্জিত থাকে হিসটোন। কি ভাবে থাকে? হিসটোনের কোন্ কোন্ অংশ ডি এন এ বা নিউক্লিওসোমের গঠন রক্ষার ব্যাপারে সব চেয়ে বেশি সক্রিয়? নিউক্লিয়াসে কি ভাবে অমন সংবদ্ধ অবস্থায় থাকে নিউক্লিওসোম? 'নিউট্রন স্ক্যাটারিং' এবং ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ পদ্ধতি এমন অনেক জটিল প্রশ্নের উত্তর যুগিয়েছেন ডঃ আরোন ক্লুগ। তাঁর সেই অসাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতিই তাঁকে ১৯৮২ সালের নোবেল পুরস্কারে বৃত করেছে। সন্দেহ নেই, পুরস্কারটি রসায়ন বিভাগের।

সুইডিশ রয়েল অ্যাকাডেমি অভ্ সায়েন্সেস-এর মন্তব্য: ক্লুগ বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন, ডি এন এ এবং আর এন এ র রাসায়নিক গঠন জানার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিজস্ব পদ্ধতিতে

কাজে লাগিয়েছেন ইলেকট্রন-অনুবীক্ষণবিদ্যা। কী ভাবে জৈবিক অণুর বিভিন্ন অংশ জৈবিক কাজকর্মে বিক্রিয়া ঘটায় তাঁর পদ্ধতি সেটা বুঝে উঠতে সাহায্য করে।

ডঃ ক্লুগ কোষের নিউক্লিয়াস এবং প্রোটিনের জটিল সম্পর্কের উপরও নতুন আলোকপাত করেছেন। অণুবীক্ষণে জীবকোষ দেখার সময় সেই কোষে মাখিয়ে নিতে হয় নানা রকম রঞ্জক বস্তু। এক একটি রঞ্জকের সংস্পর্শে কোষের এক এক ধরনের বস্তুতে ধরে এক এক রকমের বর্ণ। সেই বর্ণ বিশ্লেষণ করে কোষের বস্তু সামগ্রীর গঠন এবং পরিচয় সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়। ক্লুগ এ ধরনের পরীক্ষায় অনেক সতর্কভাবে কম রঞ্জক বস্তু ব্যবহার করে উন্নততর ফল লাভের পথ দেখিয়েছেন। অণুবীক্ষণে ধরা পড়েছে দ্বিমাত্রিক চিত্র। হয়ত বা অস্পষ্টও। গাণিতিক পদ্ধতিতে সেই চিত্র বিশ্লেষণ করে ডঃ ক্লুগ কোষ সম্পর্কে যুগিয়েছেন অনেক চমকপ্রদ তথ্য। নোবেল কমিটি মনে করেন ক্লুগের এই পদ্ধতি ক্যানসারের ব্যাপারে আরো সুষ্ঠু ধারণা যোগাতে সাহায্য করবে। তিনি ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের সাহায্যে নানা রকম জৈবিক অণু—যেমন প্রোটিন, নিউক্লেয়িক অ্যাসিড প্রভৃতির ত্রিমাত্রিক ছবি তোলার পদ্ধতি আবিষ্কার করে সুগম করেছেন জটিল রাসায়নিক অণুর গঠন জানার কলা কৌশল। এর আগে এই পদ্ধতিতে শুধু দ্বিমাত্রিক ছবিই তোলা যেত।

১৯৭৪ সালে কেমব্রিজের ব্রিটিশ মেডিকাল রিসার্চ কাউনসিল ল্যাবোরেটারির মলেকিউলার বাইওলজি বিভাগে জন রবার্টস, ব্রেইন এফ সি. ক্লার্ক, আরোন ক্লুগ এবং তাঁর সতীর্থরা ট্রানসফার আর এন এ-র কেলাস-চিত্র তোলেন একস-রশ্মির সাহায্যে। সূক্ষ্মতার দিক দিয়ে এই চিত্র ছিল ৩ অ্যাংস্ট্রমের মত। এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়, কেলাসের মধ্যে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, ট্রানসফার আর এন এ (TRNA)-র গঠন সব সময় একই রকম থাকে। এই একই পদ্ধতিতে তিনি উন্মীলিত করেছেন ক্রোমেটিনের ডি এন এ-প্রোটিন জনিত জটিল যোগের গঠন বৈচিত্র্য।

ডঃ ক্লুগের বয়েস ৫৬। জন্ম লিথুয়ানিয়ায়। শিক্ষা দক্ষিণ আফ্রিকায়। ১৯৪৯ সালে ব্রিটেনে এসে তিনি বিখ্যাত ক্যাভেনডিস ল্যাবোরেটারি এবং বার্কবিক কলেজে যোগ দেন। ১৯৬২ সালে তিনি কেমব্রিজের পিটারহাউজ কলেজের ফেলো নির্বাচিত হন। তার সাত বছর পর ব্রিটিশ রয়েল সোসাইটির ফেলো। এখনও তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েই কর্মরত।

চিকিৎসাবিজ্ঞান

প্রসটাগ্ল্যানডিনস। এবং সংশ্লিষ্ট জৈবিকভাবে সক্রিয় কয়েকটি রাসায়নিক যোগ। ১৯৮২ সালের চিকিৎসা বিজ্ঞানে যে ত্রয়ী বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হলেন এ সবই তাঁদের গবেষণার বিষয়বস্তু। ত্রয়ী বিজ্ঞানীর একজন ডঃ জন আর ভানে। বয়েস ৫৫। ১৯৭৩ সাল থেকে তিনি ইংলণ্ডের বেকেনহ্যামে ওয়েলকাম ফাউনডেশনের গবেষণা পরিচালকের পদে কাজ করছেন। সম্প্রতি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছেন পরিদর্শক অধ্যাপক হিসেবে। দ্বিতীয় জন ডঃ সুনে কে বার্গস্ট্রমের বয়েস ৬৬।

তিনি নোবেল ফাউনডেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান। এই পদে থাকা সত্ত্বেও এর আগে বহুবার তাঁর নামে নোবেল পুরস্কারের জন্যে মনোনীত হয়েছিল। দীর্ঘকাল তিনি ক্যারোলিনসক ইনসটিটিউটের রেকটারের পদে বৃত রয়েছেন। তৃতীয় জন ডঃ বেংট আই. সামুয়েলসন ডঃ বার্গস্ট্রমের প্রাক্তন ছাত্র। পরে বার্গস্ট্রমের সঙ্গেই তিনি একই গবেষণাগারে গবেষণা করে আসছেন। ১৯৭৮ সালে তিনি ক্যারোলিনসকার চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিভাগের ডীনের পদে আসীন হন। বর্তমানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে পরিদর্শক অধ্যাপক হিসেবে জড়িত রয়েছেন।

নোবেল কমিটির বক্তব্য, ভানে বার্গস্ট্রম এবং সামুয়েলসনকে মিলিত ভাবে তাঁরা ১৯৮২ সালের চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ের নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করছেন "for discoveries concerning prostaglandins and related biologically active substances" বস্তুত, প্রস্টাগ্ল্যানডিনের কথা প্রথম শোনা গিয়েছিল ১৯৩০ দশকের গোড়ায়। সেই প্রথম নিউইয়র্কের দু জন স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ, ডঃ র‍্যাফেল কুরজরোক এবং ডঃ চার্লস লাইব, আবিষ্কার করেন পুরুষের বীর্য যখন জরায়ুর সংস্পর্শে আসে তখন জরায়ুর পেশীতে শুরু হয় পর্যায়ক্রমে সংকোচন এবং সম্প্রসারণ। পরে ইংলন্ডের বিশিষ্ট চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডঃ মরিস গোল্ডব্লাট এবং সুইডেনের ডঃ উলফ্ ফন অয়েলার দাবি করেন তাঁরাও নাকি মানুষ এবং ভেড়ার বীর্যথলির গ্রন্থি বা 'সেমিনাল ভেসিকিউলার গ্ল্যান্ড'-এ এক ধরনের অত্যন্ত সক্রিয় রাসায়নিক যোগের সন্ধান পেয়েছেন। এই যৌগ পেশীর নমনীয়তা স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। অয়েলার পরে সিদ্ধান্ত করেন বস্তুটি এক ধরনের অম্ল-ফ্যাটি অ্যাসিড। তিনি এর নাম রাখলেন প্রস্টাগ্ল্যানডিন। অবশ্য এই একই ধরনের রাসায়নিক যৌগ প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের নির্যাস থেকে প্রথম সংগ্রহ করা হয়েছিল বলেই নাম রাখা হয় প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন। পরে অবশ্য শরীরের অন্যান্য অংশেও এই যৌগ পাওয়া গিয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথকভাবে প্রস্টাগ্ল্যানডিন সংগ্রহ করার দায়িত্ব বর্তায় সুনে কে বার্গস্ট্রমের উপর। দায়িত্বটি অবশ্য ফন অয়েলরাই চাপালেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যথেষ্ট পরিমাণ ভেড়ার শুক্র সংক্রান্ত থলি বা 'সেমিনাল ভেসিকল' সংগ্রহ করতে না পারায় এ ব্যাপারে বার্গস্ট্রম বেশি দূর এগোতে পারলেন না। তাঁর এই অসুবিধের কথা তিনি জানালেন ওহাইও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভিড উইজবল্ট নামে জনৈক গবেষককে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক-ডকটরেল ছাত্র হিসেবে কাজ করার সময় উইজবল্টের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। তাঁর চেষ্টায় বার্গস্ট্রম আর্থিক সাহায্য পান। এই সাহায্য পেয়ে ১৯৫৭ সালে তিনি এবং তাঁর সতীর্থরা ভেড়ার প্রস্টেট গ্রন্থি থেকে দুই রকম প্রস্টাগ্ল্যানডিন কেলাসিত অবস্থায় সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। ১৯৬২ সালে বার্গস্ট্রম ওই দুইটি যৌগের রাসায়নিক গঠনও আবিষ্কার করেন। জানা গেল ওই যৌগ কুড়িটি কার্বন পরমাণু সমন্বিত ফ্যাটি অ্যাসিড। এর কয়েক বছর পর আবিষ্কৃত হল আরো ১৪ রকম প্রস্টাগ্ল্যানডিন। এই সব যৌগ প্রাণিদেহের মধ্যেই তৈরি হয়ে থাকে। ওদের অন্যতম দুটি প্রস্টাগ্লানডিন যথাক্রমে E/2 এবং F/2 (আলফা)। সন্তান প্রসব

অনায়াস করা অথবা সহজে গর্ভপাত করানর ব্যাপারে এই দুটি প্রস্টাগ্লানডিন খুবই সক্রিয়।

১৯৬৪ সালে সুইডেন এবং হল্যাণ্ডের দুই দল বিজ্ঞানী জৈব সংশ্লেষণ বা বাইও-সিনথেসিস পদ্ধতিতে প্রস্টাগ্লানডিন তৈরিতে হাত দেন। এর জন্যে প্রয়োজন হয় arachidonio acid নামে এক ধরনের ফ্যাটি অ্যাসিড। পুরোপুরি সংশ্লেষণ পদ্ধতিতেও প্রস্টাগ্লানডিন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। কয়েক বছর আগে ক্যারিবিয়ান সাগরে এক ধরনের প্রবালের শরীরেও প্রস্টাগ্ল্যানডিনের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

১৯৬৫ সালে উগাণ্ডার ম্যাকেরেরে ইউনিভার্সিটি কলেজ অভ মেডিসিনের বিজ্ঞানী ডঃ সুলতান করিম আবিষ্কার করেন, মায়ের পেটের যে থলির মধ্যে ভ্রূণ বাস করে তার মধ্যে থাকে এক ধরনের তরল সামগ্রী। যার নাম amniotic fluid। এই তরলের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ প্রস্টাগ্লানডিন।

১৯৬৯-এর পর শুধু ইনজেকশনই নয়, 'পিল' হিসেবেও শুরু হয় প্রস্টাগ্লানডিনের চল। E2 খাইয়ে প্রসব ব্যথা ত্বরান্বিত করা হয়। উদরাময় রোগেও ব্যবহার করা হয় এই বস্তু। ডঃ করিম আফ্রিকার উপজাতিগুলির মধ্যে প্রচলিত একটি পদ্ধতির কথাও উল্লেখ করেছেন। প্রসবের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও যদি কোন স্ত্রীলোক প্রসব না করেন, ওই পদ্ধতিতে তাকে তাঁর স্বামীর বীর্য জল মিশিয়ে খেতে বলা হয়। দেখা গেছে এতে কম সময়ে প্রসব হয়। পরে জানা গেছে বীর্যের মধ্যে প্রস্টাগ্লানডিন থাকে বলেই এমনটি হয়ে থাকে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, প্রস্টাগ্লানডিনের কাজ শরীরে 'সাইক্লিক এ এম পি' নামে এক শ্রেণীর রাসায়নিক যৌগ তৈরি করতে সাহায্য করে। 'সাইক্লিক এ এম পি' শরীরে বিভিন্ন হরমোন নিঃসরণ এবং তাদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

বস্তুত প্রস্টাগ্লানডিন এক শ্রেণীর অত্যন্ত সক্রিয় হরমোন অথবা হরমোনের মত যৌগ। পাকস্থলী, বীর্য এবং মাসিকজনিত তরলের মধ্যেও এই সব যৌগ পাওয়া যায়। এই সব যৌগের সাহায্যে জানা যায় শরীরে অ্যাসপিরিন কী ভাবে কাজ করে, কেন দেখা দেয় অ্যালার্জি। শরীরে রক্তসংবহনজনিত চিকিৎসাতেও এই যৌগ ব্যবহার করা হয়। পেপটিক আলসার, গল ব্লাডার এবং কিডনির পাথরঘটিত রোগ নিরাময়েও সুফল পাওয়া যায়।

ডঃ বার্গস্ট্রম প্রস্টাগ্লানডিন বিষয়ক গবেষণায় পথিকৃৎ। বিভিন্ন ধরনের এই হরমোনের বিশুদ্ধিকরণ এবং তাদের রাসায়নিক গঠন আবিষ্কার করার ব্যাপারে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন এইসব হরমোন অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড।

অনেকে মনে করেন, পেনিসিলিন আবিষ্কারের পর 'প্রস্টাগ্লানডিনস' আবিষ্কার চিকিৎসা বিজ্ঞানে একটি বড় রকম ঘটনা। বার্গস্ট্রম, ভানে এবং সামুয়েলসন সেই ঘটনারই বিশিষ্টতম দিশারী।



নোবেল পুরস্কার ১৯৮৩

১৯৮৩ সালে পদার্থবিজ্ঞানে এই পুরস্কার পেয়েছেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুব্রাহ্মনিয়াম চন্দ্রশেখর এবং ক্যালিফোর্নিয়া ইনসটিটিউট অভ টেকনোলজির অধ্যাপক উইলিয়াম এ ফাউলার। রসায়নে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেনরি টাউবে ; এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে কোল্ডস্প্রিং হারবার ল্যাবোরেটারির ডঃ বারবারা ম্যাক্‌ক্লিনটক। মহাবিশ্বের চিরায়ত রহস্য—নক্ষত্রের জন্ম, বিবর্তন এবং মৃত্যু। সেই রহস্য উদ্ঘাটনে সাহায্য করেছে চন্দ্রশেখর এবং ফাউলারের বলিষ্ঠ তত্ত্বাবলী। নোবেল পুরস্কার তাঁদের সেই অবদানেরই স্বীকৃতি। রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় বিভিন্ন জটিল অণুর মধ্যে ইলেকট্রনের স্থানান্তর ঘটে, টাউবের আবিষ্কার সেটা বুঝতে সাহায্য করেছে। মুখ্যত সেই আবিষ্কারের কথা বিবেচনা করেই নোবেল কমিটি তাঁকে পুরস্কৃত করলেন। আর ম্যাক্‌ক্লিনটক পুরস্কার পেয়েছেন তাঁর একদা উপেক্ষিত এবং প্রজননবিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠতম বংশগতি তত্ত্ব 'জাম্পিং জিন'-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে।

পদার্থ বিজ্ঞানে

প্রসঙ্গ নক্ষত্রের বিবর্তন। প্রসঙ্গ মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে নক্ষত্রের আজীবন সংগ্রাম। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যেমন আমাদের প্রতিমুহূর্তে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে, নক্ষত্রেরও প্রতিটি পরমাণু ঠিক সেইভাবেই আকর্ষিত হয় নক্ষত্রের কেন্দ্রের অভিমুখে। যদি সেই আকর্ষণ প্রতিরোধ করার মত কোন ব্যবস্থা না থাকত, তা হলে নক্ষত্রের প্রতিটি পরমাণু মাধ্যাকর্ষণের প্রচণ্ড টানে নক্ষত্রের কেন্দ্রে পুঞ্জীভূত হয়ে পরিসমাপ্তি ঘটাত তার নাক্ষত্রিক জীবনের। এমন ঘটনা না ঘটার কারণ কি ?

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এই প্রশ্নের নানারকম তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যোগানোর চেষ্টা

করেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। তাঁরা বললেন, সূর্য একটি নক্ষত্র। অতএব এই নক্ষত্রটি দিয়েই ব্যাখ্যা করা যাক। অনেকেই জানেন, সূর্য একটি গ্যাসীয় গোলক। যার ব্যাস ১.৩৯×১০^{৬} কিলোমিটার (৮৬৩০০০ মাইল)। সূর্যকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। তার দৃশ্যমান বাইরের অংশটিকে বলা হয় 'ফোটোস্ফিয়ার' বা আলোকময় বহিরাবরণ। ফোটোস্ফিয়ারের নিচে কেন্দ্রের কাছাকাছি পর্যন্ত রয়েছে গ্যাসীয়মণ্ডল। যার সবটাই প্রায় হাইড্রোজেন এবং কিঞ্চিৎ হিলিয়াম। সূর্যের বেশিরভাগ ভর বলতে এই গ্যাসীয়মণ্ডলের ভরকেই বোঝায়। এই গ্যাসীয়মণ্ডলের গভীরে সূর্যের কেন্দ্রে যে অংশটি থাকে তাকে বলা হয় 'core' বা কেন্দ্রীয়মণ্ডল। কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা না থাকলে, সূর্যের প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণের টানে সূর্যের গ্যাসীয় স্তর তার কেন্দ্রে গিয়ে হত পুঞ্জীভূত। সূর্যের অস্তিত্ব হত বিলীন।

কিন্তু তা হয় না। মাধ্যাকর্ষণের টানে গ্যাসীয় স্তর যখন সূর্যের কেন্দ্রের দিকে এগোতে থাকে তখন তার কেন্দ্রীয় পরিমণ্ডলে সৃষ্ট হয় প্রচণ্ড চাপ। যার পরিমাণ পৃথিবীর বায়ুচাপের প্রায় ২×১০^{৯} গুণ। চাপ বাড়লে গ্যাসের তাপমাত্রা বাড়ে। তাই ওই প্রচণ্ড চাপে সূর্যের কেন্দ্রীয়মণ্ডলের তাপমাত্রা গিয়ে দাঁড়ায় ১৫ মিলিয়ন ডিগ্রি কেলভিনের মত। প্রচণ্ড সেই চাপে গ্যাসীয়মণ্ডল সঙ্কোচনে বাধা পায়, সূর্যের কেন্দ্রে আর পুঞ্জীভূত হতে পারে না। ফলে সূর্যের আয়তন মোটামুটি স্বাভাবিক থাকে। ওই তাপমাত্রাই রক্ষা করে ওই চাপ।

মুশকিল এই, মাধ্যাকর্ষণজনিত সঙ্কোচনের দরুন যে উত্তাপ সৃষ্ট হয় তার কিছুটা অংশ গ্যাসীয় স্তর ভেদ করে বিকীর্ণ হয় সূর্যের বহির্জগতে। তাই যে পরিমাণ শক্তি হলে সূর্যের গ্যাসীয়মণ্ডলকে ঠেলে রাখা যায়, তাতে পড়ে টান। এভাবে চললে সৃষ্টির পর মাত্র ১৫ মিলিয়ন বছরের মধ্যেই শক্তির সরবরাহ বন্ধ হত। সৌভাগ্য, এই ঘাটতি পূরণ করে আর এক ধরনের শক্তি উৎস—তাপ পারমাণবিক সংযোজন। সূর্যের কেন্দ্রাঞ্চলের তাপমাত্রা ৪×১০^{১৬} ডিগ্রী কেলভিনেরও বেশি। এই তাপমাত্রায় চলে পারমাণবিক বিক্রিয়া। হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসগুলি সংযোজিত হয়ে সৃষ্টি করে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস এবং প্রচণ্ড উত্তাপ শক্তি। বিকিরণের মাধ্যমে সূর্য প্রতিমুহূর্তে যে পরিমাণ শক্তি হারায়, এই উত্তাপ শক্তিই তা মিটিয়ে দেয়। আর এর ফলে সূর্যের নাক্ষত্রিক অস্তিত্বটি বজায় থাকে। বলা বাহুল্য, এই ঘটনা অন্যান্য নক্ষত্রের ক্ষেত্রেও ঘটে।

প্রশ্ন হল, নিয়মিত তাপ পারমাণবিক সংযোজনের দরুন হাইড্রোজেন জ্বালানি যখন দারুণভাবে কমে আসবে, অথবা ফুরিয়ে যাবে, তখন কি হবে?

জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী বললেন, ওই সময় নক্ষত্রের কেন্দ্রাঞ্চলে ঘটবে হিলিয়ামের আধিক্য। উত্তাপ কমার দরুন তার কেন্দ্রাঞ্চলে তখন চলবে সঙ্কোচন। মাধ্যাকর্ষণের টান অগ্রাহ্য করে তার গ্যাসীয়মণ্ডল সম্প্রসারিত হতে থাকে। সেই সঙ্গে শীতল থেকে শীতলতর। নক্ষত্রটির আয়তন দশ থেকে একশ' গুণ বা তারও বেশি বৃদ্ধি পাবে। কমবে তার তাপমাত্রা, তার বর্ণ হবে রক্তাভ। প্রচণ্ড উত্তপ্ত অবস্থায় যেমন উজ্জ্বল

দেখায়, তেমন নয়। এ ধরনের নক্ষত্রকেই বলা হয় 'Red giant' বা লাল দৈত্য। এই লাল দৈত্য অবস্থার পরও নক্ষত্রের কেন্দ্রীয়মণ্ডলে চলবে সঙ্কোচন। তার চারপাশে গ্যাসীয় স্তরের অনেকটাই মহাকাশে হবে বিলীন। তখন সে বিরাজ করবে ক্ষুদ্রাকার একটি শ্বেতশুভ্র নক্ষত্র হিসেবে। বিজ্ঞানীরা এ ধরনের নক্ষত্রেরই নাম রেখেছেন 'White Dwarf' বা শ্বেত বামন। তাঁরা মনে করতেন মহাবিশ্বের তাবৎ নক্ষত্রেরই এটাই অন্তিম পরিণতি।

প্রচলিত বিশ্বাসেই আঘাত হেনেছিলেন চন্দ্রশেখর। ১৯৩০। মাত্র ১৯ বছর বয়েস তখন। কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হলেন তিনি। ভারত থেকে জাহাজে ইংলণ্ড যাওয়ার পথে শ্বেত বামন নিয়ে ভাবতে শুরু করেন তিনি। কেমব্রিজে পেঁছানর পর ১৯৩০ দশকের গোড়াতেই আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের উপর ভিত্তি করে তিনি দেখালেন, সব নক্ষত্রই 'শ্বেত বামন' হিসেবে অন্তিম দশা পায় না। যে সব নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের ১.৪ গুণ বা তারও বেশি তাদের মধ্যে অভিকর্ষজনিত সঙ্কোচন ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে। সেই সঙ্গে কমতে থাকে তাদের আয়তন। বৃদ্ধি পেতে থাকে ঘনত্ব। তিনি আরো বললেন, যে সব নক্ষত্রের ভর সূর্যের চেয়ে অনেক বেশি তাদের জীবনে 'শ্বেত বামন' দশাও পরিলক্ষিত হয় না। তাদের জীবনে চলে ক্রমান্বয়ে বিকিরণ। সেই সঙ্গে সঙ্কোচন। শেষ পর্যন্ত এমন একটি অবস্থায় পেঁছায় যখন তাদের ব্যাস হয়ে দাঁড়ায় কয়েক কিলোমিটারের মত। তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হয় কল্পনাতীত। ওই অবস্থায় তাদের পরিমণ্ডল থেকে আলোক রশ্মিও বেরিয়ে আসতে পারে না।..."সেটা কী — ? মানে, সেটাই বড় রকমের জিজ্ঞাসা।" ১.৪ বা তার বেশি সৌর-ভর সম্পন্ন নক্ষত্র শ্বেত বামনে পরিসমাপ্তি পাবে না—এই ন্যূনতম সৌর-ভর ১.৪-কেই বলা হয় Chandrashekhar's limit' বা চন্দ্রশেখর সীমা।

তাঁর এই তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিরোধেরও সম্মুখীন হন তিনি। এমন কি স্বয়ং স্যার আর্থার এডিংটনের মত বিজ্ঞানীও বললেন, 'চন্দ্রশেখর সীমা' অবিশ্বাস্য। কিন্তু এই মন্তব্যের তিরিশ বছর পর 'নিউট্রন নক্ষত্রের' আবিষ্কার এবং 'ব্ল্যাক হোল' বিষয়ক গবেষণাবলী তাঁর তত্ত্বের বাস্তবতা প্রমাণ করেছে। অকল্পনীয় মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পন্ন নিরেট (compact) এবং ক্ষুদ্রাবয়ব নক্ষত্রকেই এখন বলা হয় 'ব্ল্যাক হোল'। বছর পাঁচ আগে ক্যালিফোর্নিয়ার মাউণ্ট প্যালোমারে অবস্থিত হেল মানমন্দির এবং অ্যারাইজোনার কিটপিক মানমন্দির থেকে যুগপৎ পর্যবেক্ষণ চালিয়ে কন্যা রাশির মেৎসিয়ের-৮৭ নামক গ্যালাকসিতে অতিকায় একটি নক্ষত্রবস্তুর সন্ধান পেয়েছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। এটি সূর্যের চেয়েও কম করে পাঁচশ' কোটি গুণ ভারী। তাঁরা অনুমান করছেন, এটি একটি 'ব্ল্যাক হোল'।

১৯৩৭ সালে ইংলণ্ড ছেড়ে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে যোগ দেন চন্দ্রশেখর। এখানে আসার পর এক একটি গ্যালাকসিতে কতগুলি নক্ষত্র থাকা সম্ভব তা নিয়ে ভাবনা শুরু করেন তিনি। তিনি দেখান, ১০০০টি নক্ষত্রের মধ্যে থাকে কম করেও এমন এক ধরনের 'জোড়' (binary) নক্ষত্র, যাদের মধ্যে নিয়ত বস্তুসামগ্রীর লেনদেন

চলে। ইংরেজিতে এদের বলা হয় 'contact binaries'। এরা নক্ষত্রের বিবর্তন সম্পর্কে অনেক তথ্য যোগাতে সমর্থ হয়েছে। তাঁর তত্ত্ব থেকে জানা যায়, যে সব নক্ষত্র সূর্যের চেয়ে ১০০ গুণ উজ্জ্বল, তাদের ভর সূর্যের ৩ গুণ বেশি। উষ্ণতা ৭০০০ ডিগ্রি কেলভিন বেশি। ব্যাসার্ধ প্রায় দ্বিগুণ। আর যে সব নক্ষত্র সূর্যের চেয়ে ১০০০ গুণ উজ্জ্বল, তাদের ভর সূর্যের ভরের ৫ গুণ, ব্যাসার্ধ সূর্যের ২ ৫ গুণ এবং উষ্ণতা ১৩০০০ ডিগ্রি কেলভিন বেশি।

অধ্যাপক চন্দ্রশেখর দেখিয়েছেন, কোন নক্ষত্র যখন কোন গ্যালাকসির ভেতর দিয়ে পরিক্রমণ করে, সেই গ্যালাকসির অন্যান্য নক্ষত্রের মাধ্যাকর্ষণে তখন ওই নক্ষত্রটির গতি হ্রাস পায়। গত শতাব্দীতে ব্রিটেনের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী লর্ড র‍্যালে প্রমাণ করেন, বাতাস স্বল্প-তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের নীল আলোর বিচ্ছুরণ ঘটায় বলেই আকাশকে আমরা দেখি নীল। ১৯৪০-এর দশকে এই ঘটনার গাণিতিক ব্যাখ্যা জুগিয়েছেন চন্দ্রশেখর। তাঁর গবেষণার অন্যান্য বিষয়ঃ চৌম্বক ক্ষেত্রে তপ্ত গ্যাসের আচরণ, সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ এবং 'ব্ল্যাক হোল'। গত আট বছর তিনি এ সম্পর্কে নতুন ধরনের ব্যাখ্যা জোগানোর চেষ্টা করছেন।

চন্দ্রশেখর ভারতীয় নোবেলবিজ্ঞানী স্যার সি. ভি. রামণের ভ্রাতুষ্পুত্র। জন্ম ১৯১০ সালে, লাহোরে। ১৯৫৩ সালে তিনি মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন।

জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞানে উইলিয়াম অ্যালফ্রেড ফাউলারও এক বিশিষ্টতম ব্যক্তিত্ব। তাঁর নিজের কথায়, "চন্দ্রশেখর তাঁর আদর্শ পুরুষ।"

১৯৭৩ সালে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ভেটলসেন' পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন। পুরস্কার বিতরণের সময় মন্তব্য করা হয়ঃ কোন নক্ষত্রের অভ্যন্তরে পারমাণবিক বিক্রিয়ায় কি পরিমাণ শক্তির উৎপাদন হওয়া সম্ভব, কি ভাবে চলে নক্ষত্রের অভ্যন্তরে মৌলিক পদার্থের সংশ্লেষণ, নক্ষত্রবিশেষে কি পরিমাণেই বা হওয়া সম্ভব—ফাউলারের গবেষণা আমাদের তা জানতে সাহায্য করেছে। ফাউলারের তত্ত্বের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের উত্তাপ এবং আলোকশক্তি সৃষ্টির মূল রহস্যটি ধরতে সক্ষম হয়েছেন। বুঝতে পেরেছেন, নক্ষত্রে কি ভাবে সৃষ্ট হয় হাল্কা মৌলিক পদার্থ হাই-ড্রোজেন থেকে অন্যান্য হাল্কা, ভারী যাবতীয় মৌল অণু। জানা গেছে, সূর্য, পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ যে সব মৌলিক রাসায়নিক অণু দিয়ে তৈরি তারা সৃষ্ট হয়েছিল নক্ষত্রে। সে সব নক্ষত্র বহুদিন আগেই অবলুপ্ত হয়েছে। ফাউলারের তত্ত্ব থেকে জানা গেছে, সূর্যের অভ্যন্তরে এখনো চলছে অজ্ঞাত পরিচয় রাসায়নিক মৌলের সংশ্লেষণ। সে সব মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব এখনো আমাদের জানা নেই। তারা ইউরেনিয়ামের পরবর্তী মৌলিক পদার্থ। 'সুপার হেভী' মৌলও হতে পারে। সুদূর ভবিষ্যতে অন্যান্য মৌলিক পদার্থের সৃষ্ট গ্রহ উপগ্রহের মত সেই সব মৌলিক পদার্থসমৃদ্ধ গ্রহ উপগ্রহও হয়ত সৃষ্ট হতে পারে।

বাবা জন ম্যাক্‌লিওড ফাউলার। মা জেনি। উইলিয়ামের জন্ম ৯ অগাস্ট, ১৯১১ পিট্‌সবার্গে। যখন দুই বছর বয়েস, তাঁর বাবা বদলি হয়ে সপরিবারে এলেন

ওহাইও স্টেটের লিমা শহরে। ১৯২৯ সালে লিমা সেণ্ট্রাল হাই স্কুল থেকে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুলের সেরা ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন তিনি। ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে ইনজিনিয়ারিং ফিজিকসে স্নাতক। এ সময় নিজের খরচ চালানর জন্যে কখনো তাঁকে ক্যাণ্টিনে কাপ ডিশ ধোয়ার কাজ করতে হয়েছে, কখনো খাবারদাবার পরিবেশন করতে হয়েছে। ১৯৩৩ সালে পেলেন ব্যাচেলার অভ্ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি। এই পরীক্ষায় তিনি যে গবেষণাপত্রটি পেশ করেন তার বিষয়বস্তু ছিল 'Low voltage Electron beams' বা স্বল্প তড়িৎ-বিভব মাত্রার ইলেকট্রন রশ্মি।

এরপর ক্যালিফোর্নিয়া ইনসটিটিউট অভ্ টেকনোলজিতে ভর্তি হলেন পদার্থ-বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর ছাত্র হিসেবে। এই সময় সেখানকার হাই ভোল্টেজ এবং কেলোগ রেডিয়েশন ল্যাবোরেটারির প্রধান চার্লস সি লরিটসেনের অধীনে গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্টেণ্ট হিসেবে কাজ করেন। এখান থেকেই ১৯৩৬ সালে পি এইচ ডি উপাধি লাভ। এবার তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল "Radioactive elements of Low Atomic Number"। ১৯৩৯ সালে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক, ১৯৪২-এ সহযোগী অধ্যাপক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার দরুন ক্যালিফোর্নিয়া ইনসটিটিউট টেকনোলজিতে (ক্যাল টেক) পারমাণবিক গবেষণার কাজ বন্ধ রেখে বিজ্ঞানীদের সামরিক গবেষণায় নিয়োগ করা হয়। ১৯৪০-এ ফাউলার ওয়াশিংটনে এসে বোমার ফিউজ তৈরির গবেষণায় যোগ দেন। যুদ্ধের শেষের দুই বছর তিনি তাঁর সতীর্থদের সঙ্গে কেলোগ গবেষণাগারে পরমাণু বোমার সাজসরঞ্জাম তৈরির কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

১৯৫৩ সালে ব্রিটিশ জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল এলেন ক্যালটেক-এ। সঙ্গে নিয়ে এলেন তাঁর 'মতবাদ'। বললেন, তাবৎ মৌলিক পদার্থ নক্ষত্রের মধ্যেই সৃষ্ট হয়। পরবর্তী দশ বছর বিভিন্ন সময়ে এই নিয়েই তিনি গবেষণা করেছেন হয়েল এবং আরো দুইজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জিওফ্রে এবং তাঁর স্ত্রী মার্গারেট বার্বিজের সঙ্গে।

ফাউলার তাঁর তত্ত্বে বললেন, তাপ পারমাণবিক পদ্ধতিতে নক্ষত্রের মধ্যে হাইড্রোজেন সংযোজিত হয়ে সৃষ্টি করে হিলিয়াম। এটা হয় ১০,০০০,০০০ ডিগ্রি কেলভিন তাপমাত্রায়। হাইড্রোজেন জ্বালানি প্রায়-নিঃশেষ হলে নক্ষত্রের কেন্দ্রীয়মণ্ডলে চলে দ্বিতীয় পর্যায়ে সঙ্কোচন। সেখানে যে হিলিয়াম থাকে তার উপর পড়ে আরো বেশি চাপ। তাপমাত্রা ওঠে ১০০,০০০,০০০ ডিগ্রি। হিলিয়াম তখন জ্বালানি হিসেবে কাজ করে। পারমাণবিক বিক্রিয়ার ফলে তৈরি হয় কার্বন, অকসিজেন প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ। তাপমাত্রা আরো বাড়লে অকসিজেন কারবনের মধ্যে চলে পারমাণবিক বিক্রিয়া। তখন সৃষ্ট হয় নিয়ন, ম্যাগনেসিয়াম এবং সিলিকনের মত মৌলিক পদার্থের পরমাণু। শেষ পর্যন্ত লোহার মত ভারী পদার্থও সৃষ্ট হয়। তৈরি হয় সিসে, বিসমাথ। এইভাবে মৌলিক পরমাণুর সংশ্লেষণ চলতে চলতে নক্ষত্র কখনো কখনো তার স্থিতিস্থাপকতা হারিয়ে ফেলে। তখন চলে নাক্ষত্রিক বিস্ফোরণ বা 'nova'

অথবা 'Supernova explosion'। এই বিস্ফোরণে নক্ষত্রের ওই সব মৌল অণু গ্যালাক্সির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

দেখা গেছে, অতিকায় নক্ষত্রের বিস্ফোরণের পর তার 'অবশেষ' থেকে বের হয় তীব্র-মাত্রার শক্তি। আর তা বেশ কিছুদিন ধরেই চলে। অনেকে মনে করেন, ওই 'অবশেষে'র মধ্যে থাকে এমন কিছু কিছু তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ যাদের অর্ধ-জীবন (Half life) ৫০ থেকে ৭০ দিন। এই তেজস্ক্রিয় বস্তুগুলিই শক্তির উৎস। ১৯৫০ এর দশকে বাদে, জিওফ্রে এবং মার্গারেট বারবিজ, ফ্রেড হয়েল এবং ফাউলার বলেন, এই শক্তির উৎস ক্যালিফোর্নিয়াম-২৫৪ নামে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। ভারী তেজস্ক্রিয় পদার্থের সঙ্গে নিউট্রনের আঘাতেই সৃষ্ট হয় ক্যালিফোর্নিয়াম-২৫৪।

জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানীরা ১০০০০০ আলোক বৎসর দূরে আবিষ্কার করেছেন বিস্ফোরণ চলছে এমন গ্যালাক্সির। সেখান থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে প্রচণ্ড শক্তি। যা তাপপারমাণবিক সংযোজন অথবা অন্য কোন তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তাত্ত্বিক হিসেব মত ওইভাবে অত শক্তি উৎপাদনও সম্ভব নয়। একথা cygnus A, Hercules A এবং Hydra A—এই তিনটি অতিকায় রেডিও বিকিরণ উৎসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাদের শক্তিরই বা উৎস কী ?

প্রচণ্ড পরিমাণ এই শক্তির উৎস সম্পর্কে হয়েল এবং ফাউলারের মতবাদ হল ঃ বিচ্ছুরিত বস্তু যখন সঙ্কুচিত হয়, তখন নির্গত হয় মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। বস্তুপিণ্ড যদি আবর্তন না করে, এবং বস্তুর সংকোচন যদি অব্যাহত থাকে, গ্যাসীয় বস্তুর আয়তন সঙ্কুচিত হতে হতে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যখন তা আমাদের কাছে অদৃশ্য হয়ে যায়। ১৯১৬ সালে আইনস্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বে বস্তুর তার নিজস্ব মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়ার আভাস দিয়েছিলেন। আইনস্টাইন এবং হয়েল-ফাউলারের উপর নির্ভর করেই জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী কার্ল শয়ারৎচাইল্ড একটি 'ব্যাসার্ধ'-এর কল্পনা করেন। যাকে বলা হয় শয়ারৎচাইল্ডের ব্যাসার্ধ (Sch-warzschild radius)। যার চেহারাটা $2\ GM/C^2$; G—মহাকর্ষ ধ্রুব ; M—বস্তুর ভর ; C—আলোর গতি। এক কথায় কোন বস্তু এই ব্যাসার্ধ পেলে পুরোপুরি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ফাউলার এবং হয়েলের মতে তীব্র রেডিও বিকিরণ এবং কোয়াসারের শক্তির ব্যাখ্যায় মাধ্যাকর্ষণজনিত সহসা-সঙ্কোচন বা Gravitational Collapse তত্ত্বের প্রয়োগ। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের সাহায্য নিয়ে গত কয়েক বছরে কোয়াসার এবং পালসার সম্পর্কে মূল্যবান ব্যাখ্যা জুগিয়েছেন তিনি। উদ্ভাবন করেছেন ভর এবং তড়িৎ আধানবিহীন রহস্যময় পারমাণবিক কণা নিউট্রিনো সন্ধানের পদ্ধতি। যা সূর্য এবং মহাবিশ্ব সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জানতে সাহায্য করবে।

নোবেল কমিটির বক্তব্য, শ্বেত বামন অথবা নিউট্রন নক্ষত্রের মত বস্তু যে মহাবিশ্বে বিরাজ করতে পারে, চন্দ্রশেখর এবং ফাউলারের গবেষণায় তা ধরা পড়েছিল। তাদের আবিষ্কারের প্রায় তিরিশ বছর আগেই এ সম্পর্কে তাঁরা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন।

হেনরি টাউবের বয়েস এখন ৬৭। জন্ম কানাডার সাসকাচুয়ানার নিউডর্ফ শহরে, দরিদ্র এক দিনমজুর পরিবারে। ১৯৩৭ সালে উচ্চশিক্ষার্থে তিনি নিজের শহর থেকে চলে আসেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তাঁর প্রথম গবেষক জীবনের শুরু বার্কেলে-তে। তখন জৈব-রসায়ন নিয়ে গবেষণার ব্যাপারটা খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল; কিন্তু টাউবে সে দিকে না গিয়ে শুরু করলেন অজৈব-রসায়ন নিয়ে গবেষণা। এই বিষয়েই তিনি পি. এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন। তার অভূতপূর্ব গবেষণা অল্পদিনের মধ্যেই মার্কিন রাসায়নিকদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করল। ১৯৪২ সালে তিনি মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেন। ১৯৬২ সালে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিলেন।

নোবেল পুরস্কার প্রদান প্রসঙ্গে নোবেল কমিটি মন্তব্য করেছেন; অজৈব-রাসায়নিক গবেষণায় টাউবে অনন্যসাধারণ সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে রসায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন ভাবনার খোরাক জুগিয়েছেন তিনি। জটিল ধাতব যৌগের (Metal complexes) রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় কিভাবে ইলেকট্রনের স্থানান্তর ঘটে সে সম্পর্কে তাঁর একাধিক তত্ত্ব অনবদ্য। লোহায় মরচে পড়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধাতব জারণবিক্রিয়ার ব্যাখ্যা জুগিয়েছে তার এই গবেষণা। তাঁর ইলেকট্রন স্থানান্তকরণতত্ত্ব বহু জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়া বুঝে উঠতে সাহায্য করেছে। এইসব রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে সালোকসংশ্লেষণ; তড়িৎ-কোষ থেকে জ্বালানিকোষের (Fuel cells) রাসায়নিক বিক্রিয়া। প্রাণ-রসায়নেও তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। শ্বসনকার্যে দরকার হয় অক্সিজেন। বিভিন্ন 'এনজাইম' সংশ্লেষণের সময়ও চলে জারণ অথবা বিজারণ। আর জারণ-বিজারণ মানেই তো ইলেকট্রনের লেনদেন। এইসব বিক্রিয়াতেও কিভাবে ইলেকট্রনের লেনদেন চলে সে সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা জুগিয়েছে টাউবের তত্ত্ব।

এ প্রসঙ্গে টাউবের মন্তব্য ঃ "ইলেকট্রনের আচরণ কতকটা আঠার মত। এই আঠারা অণুর মধ্যে পরমাণুদের সংবদ্ধ অবস্থায় রেখে দেয়। যখন কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া চলে তখন ইলেকট্রন আঠা এক অণু থেকে অন্য অণুতে স্থানান্তরিত হয়। এর ফলে বিক্রিয়ায় যেসব অণু অংশগ্রহণ করে তাদের গঠনবৈচিত্র্য কখনো কখনো ভিন্নতর হয়, কাঠামো পাল্টায়। তৈরি হয় ভিন্নতর কাঠামোসমন্বিত অণু।" টাউবে বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়েছেন, রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় কোন কোন পরমাণু এবং অণু 'সেতু'র মত কাজ করে। তাঁর গবেষণা প্রথম এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য 'মডেল' তৈরি করতে সাহায্য করেছে।

জার্নাল অভ দ্য আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটিতে (খণ্ড ঃ ৭৫ ; পৃষ্ঠা ঃ ৪১১৮, ১৯৫৩) প্রকাশিত টাউবে এবং সতীর্থদের একটি গবেষণাপত্র থেকে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

ওই গবেষণাপত্রে টাউবে একটি বিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন ;

$$[C_0(NH_3)_5Cl]+[Cr(H_2O)_6]$$
$$[(NH_3)_5C_0—Cl—Cr(H_2O)_5]+H_2O$$

এ ক্ষেত্রে কোবল্ট (C_0) এবং ক্রোমিয়াম (Cr) যৌগ পারস্পরিক বিক্রিয়া করে তৈরি করল একটি জটিল অস্থায়ী যৌগ (তীর চিহ্নের ডান পাশে দেখান হল) এবং জল। এই অস্থায়ী যৌগটিকেই বলা হচ্ছে 'সেতু' ('intermediate' অথবা bridge)। এই 'সেতু' পরে ভেঙ্গে গিয়ে সৃষ্টি করে $[(NH_3)_5C_0]+[(CrH_2O)Cl]$। লক্ষ করুন, গোড়ায় ক্রোমিয়াম যৌগে কোন ক্লোরিন পরমাণু ছিল না। কিন্তু বিক্রিয়ার পর ক্রোমিয়াম যৌগে কোবল্ট যৌগের ক্লোরিন পরমাণুটি এসে যুক্ত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ক্রোমিয়াম যৌগটি জারিত হল। এই পরীক্ষাটি করতে গিয়ে টাউবে ক্লোরিনের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করেন, যাতে বোঝা যায় 'সেতু'র ক্লোরিনই জারণে (অর্থাৎ ইলেকট্রন স্থানান্তরণে) অংশ নিয়েছে। এটি একটি অভিনব পদ্ধতি।

টাউবের গবেষণা, প্রাণী এবং উদ্ভিদের মধ্যে যেসব অণু রাসায়নিক বিক্রিয়া চালিয়ে শক্তি উৎপাদন করে, তা বিশদভাবে বুঝতে সাহায্য করেছে। সাহায্য করে তৈরি করতে একাধিক ধাতব অনুঘটক (Catalyst) যা রাসায়নিক শিল্পের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া অনুধাবন করার ব্যাপারে কম করেও আঠারোটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন তিনি।

নোবেল পুরস্কারের খবরটি শোনার পর টাউবে মন্তব্য করেন, "আমার চেয়েও তো আরো অনেক উপযুক্ত মানুষ ছিল।" তাঁর সতীর্থদের বক্তব্য, "হতে পারে। তবে অজৈব রসায়নের ক্ষেত্রে টাউবে অবশ্যই শিরোনাম। তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে আমরা অসাধারণ মৌলিকত্ব দেখতে পেয়েছি। বিশেষ করে ধাতুসংশ্লিষ্ট রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তো বটেই।"

চিকিৎসা বিজ্ঞানে

এ যেন কবর থেকে মানুষটিকে তুলে এনে কপালে জয়টিকা পরান। যাঁরা একালের বিজ্ঞানী তাঁরা অনেকে তো তাঁকে ভুলেই গিয়েছিলেন। না, স্টকহোম থেকে তিনি কোন টেলিফোন পাননি। ভোরে ঘুম ভাঙ্গার পর তিনি খবরটি পেলেন রেডিয়োয়। প্রজনন বিদ্যায় যুগান্তকারী গবেষণার স্বীকৃতি হিসেবে ডঃ বারবারা ম্যাক্‌ক্লিনটককে ১৯৮৩ সালের চিকিৎসাবিজ্ঞান বিভাগের নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। সংবাদটি শুনে তিনি একটিই মন্তব্য করেন ; "হায় কপাল !" এখন তাঁর বয়স ৮১। এ বয়সে আবেগের তাড়না তো কম থাকবেই !

একই গবেষণার সম্মান হিসেবে ১৯৮১ সালে তিনি আরো তিনটি পুরস্কার পান। ১৫০০০ ডলার মূল্যের 'লাসকের বেসিক মেডিকেল রিসার্চ অ্যাওয়ার্ড" ; শিকাগোর ম্যাকআরথার ফাউনডেশনের 'প্রাইজ ফেলো'। তাঁকে আজীবন বাৎসরিক ইনকাম-

ট্যাক্সবিহীন ৬০০০০ ডলার সম্মানী দেওয়ার ব্যবস্থা হয় এই 'ফেলো' হওয়ার দরুন ; এ ছাড়া পান ইজরায়েল-এর উলফ ফাউনডেশন প্রদত্ত ৫০০০০ ডলারের পুরস্কার। ওই সময় মন্তব্য করা হয়েছিল, । এ সব পুরস্কার তাঁর নোবেল পুরস্কার লাভের গৌরচন্দ্রিকা। সার্থক মন্তব্য ! মাত্র দুবছর পর সত্যিই তিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন।

ম্যাকক্লিনটকের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির খবর শুনে নোবেলবিজ্ঞানী জেমস ওয়াটসন মন্তব্য করেন, এ পুরস্কার সম্পূর্ণ বিতর্কের বাইরে। তাঁর গবেষণার তাৎপর্য ছাড়া এখনকার জীনবিজ্ঞান (জেনেটিকস) কেউ কল্পনাই করতে পারে না। ম্যাক্‌-ক্লিনটক এখন যে গবেষণাগারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, সেই কোল্ড স্প্রিং হারবারের ডিরেক্টার অধ্যাপক ওয়াটসন। ১৯৫৩ সালে তিনি এবং ফ্রান্সিস ক্রিক 'ডি এন এ'র রাসায়নিক স্বরূপ আবিষ্কারের দরুন নোবেল পুরস্কার পান। উল্লেখ্য, এর আগে দু'জন মাত্র মহিলা বিজ্ঞানী এককভাবে নোবেল পুরস্কার লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। তাঁদের একজন মেরী কুরী। ১৯১১ সালে রেডিয়াম এবং প্লুটোনিয়াম আবিষ্কার করার দরুন তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল। ১৯৬৪ সালে পেনিসিলিন এবং অন্যান্য যৌগের রাসায়নিক গঠন আবিষ্কার করে নোবেল পুরস্কার পান ডরোথি ক্রাউফুট হজকিন। ম্যাক্‌ক্লিনটক-কে নিয়ে এই তালিকায় আর একটি নাম সংযোজিত হল।

জন্ম ১৯০২ সালে, হার্টফোর্ড-এ। ১৯১৯ সালে তিনি কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রিকালচার স্কুলে ভর্তি হন। ইচ্ছে ছিল উদ্ভিদ প্রজনন নিয়ে পড়বেন। কিন্তু মেয়ে বলে ওই বিষয়টি তাঁকে পড়তে দেওয়া হল না। তাই প্রধান বিষয় হিসেবে তিনি বেছে নিলেন উদ্ভিদবিদ্যা। অবশ্য শেষ পর্যন্ত পি এইচ ডি করলেন উদ্ভিদ প্রজনন বিজ্ঞানেই। ১৯২৭ সালে। মা'র পছন্দ ছিল না মেয়ে উচ্চশিক্ষা পান। এর ফলে ব্যক্তিজীবনে কিছুটা তিক্ততা ঘটে। শেষ পর্যন্ত আজীবন তিনি অবিবাহিতই থেকে গেলেন।

পরিবর্তে 'ভুট্টা'র প্রতি জন্মাল তাঁর অগাধ ভালবাসা। শুরু হল ভুট্টা নিয়ে গবেষণা। কিন্তু ১৯৩০-এর দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা চালানর মত মেয়েদের তেমন সুযোগ না থাকায় একটা চাকরি ছাড়েন তো আর একটা চাকরি ধরেন। অবশেষে ১৯৪২ সালে ওয়াশিংটন ডি সি'র কার্নেগী ইনসটিটিউশনে স্থায়ী ফ্যাকাল্টি মেম্বার হিসেবে যোগদানের সুযোগ পেলেন ম্যাক্‌ক্লিনটক। কোল্ড স্প্রিং হারবারে এই প্রতিষ্ঠানের কৃষি গবেষণাগার। সেখানে চলে এলেন তিনি। সেখানেই শুরু হল তাঁর দীর্ঘ গবেষক জীবন। তপস্যা।

শুরু করলেন ভুট্টা নিয়ে কাজ। গবেষণাগারের পেছনে একফালি জমি। সেখানে চলল বছরের পর বছর ভুট্টার (Indian corn—মার্কিন) চাষ। তিনি লক্ষ্য করলেন ভুট্টার দানার গায়ে থাকে বিচিত্র বর্ণ। এক একবার ফসল হয়, আর তাদের দানা পরীক্ষা করেন তিনি অণুবীক্ষণে। আর তা করতে গিয়ে অদ্ভুত একটি ঘটনা চোখে

পড়ল তাঁর। তিনি লক্ষ্য করলেন, একই জাতের ভুট্টা কিন্তু তাদের বীজ থেকে যখন নতুন ফসল তোলা হয়, তখন নতুন দানার গায়ের বর্ণে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। এই আবিষ্কার তাঁকে কৌতূহলী করে তোলে। কারণ প্রজননবিজ্ঞানীদের তখন প্রচলিত বিশ্বাস, জীনই প্রাণী এবং উদ্ভিদের যাবতীয় চরিত্রের নিরূপক। মুক্তোর মালায় যেমন মুক্তোগুলি পর পর সাজান থাকে, ঠিক তেমনি ক্রোমোজোমেও প্রকৃতির নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী পর পর সাজান থাকে এক একটি জীন। নির্দিষ্ট প্রজাতির উদ্ভিদে এই সজ্জা বংশপরম্পরায় বজায় থাকে। এ কথা প্রাণীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আর এর জন্যেই একই প্রজাতির বংশধরদের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় কোন পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু ম্যাক্‌ক্লিনটক আবিষ্কার করলেন, প্রকৃতি অতটা নিয়মবদ্ধ নয়।

বছরের পর বছর বিভিন্ন জাতের ভুট্টা ফলিয়ে শুরু হল পর্যবেক্ষণের কাজ। দেখলেন, একই প্রজাতির ভুট্টার বংশধরের মধ্যে চরিত্রের যেন কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। বংশধরদের দানায় বর্ণের পরিবর্তন ঘটছে। কখনো বা যে জায়গায় যে বর্ণ থাকার কথা তাও থাকছে না। নিয়মিত ভুট্টার দানা অনুবীক্ষণে পর্যবেক্ষণ করার পর তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, জীন ক্রোমোজোমে স্থান পরিবর্তন করে। বংশপরম্পরায়। আর তা চলে অবাধ গতিতে। এদের তিনি নাম দিলেন 'transposable elements' বা সংক্ষেপে TE। তিনি বললেন এই TE ক্রোমোজোমের বিশেষ অংশে যখন সরে যায়, তখন ভুট্টার পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে ঘটে পরিবর্তন। তাদের দানার রঙ পালটায়। অথবা বিশেষ বর্ণ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরে যায়। এই TE রঙ সৃষ্টিকারী জীনকে কখনো সক্রিয় করে, কখনো বা নিষ্ক্রিয়। এর ফলে কোন কোন বংশের ভুট্টা দানার বর্ণ লাল থেকে হলুদ হয়।

তাঁর এই আবিষ্কার 'cell differentiation' বা শেষ-পৃথিকীকরণের রহস্য উদ্ঘাটনে সাহায্য করেছে। আমরা জানি, গর্ভসঞ্চারের সময় প্রতিটি কোষের মধ্যে থাকে যাবতীয় প্রজননগত বস্তু (genetic material)। অথচ উদ্ভিদ অথবা প্রাণী ভ্রূণ অবস্থা থেকে যখন বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন তার কোষগুলির মধ্যে দেখা যায় বিশেষ বিশেষ ধর্ম। কোন কোষ তৈরি করে ত্বক, কোন কোষ পেশী, অস্থি অথবা স্নায়ু। TE তত্ত্বের সাহায্যে বোঝান সম্ভব হল, বিভিন্ন কোষের সমরূপ গঠন সত্ত্বেও তাদের আকৃতি, আয়তন এবং কাজকর্মে কেন তারতম্য ঘটে।

তাঁর এই তত্ত্ব অনেকে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। "তাঁরা মনে করত, আমার মাথা খারাপ, আমি পাগল। শেষ পর্যন্ত আমি আমার গবেষণা পত্রাবলীও ছাপান বন্ধ করে দিলাম। কেউ তো পড়ে না, ছাপিয়ে কি লাভ।" সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন ম্যাক্‌ক্লিনটক।

কিন্তু ১৯৬০-এর দশকে দেখা দিল আশার আলো। ইতিমধ্যে জীন-বিজ্ঞানীরা ডি এন এ, আর এন এ নিয়ে অনেক কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছেন। জানা গেল, জীন স্থান পরিবর্তন করে। এনজাইমের সাহায্যে বিশেষ কোন জীনকে সরিয়ে ক্রোমোজোমের এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় প্রোথিত করে কোষের কাজকর্মে ঘটান গেল

পরিবর্তন। TE তত্ত্ব ব্যাখ্যা করল রক্তের শ্বেতকণিকা কিভাবে দ্রুত অ্যান্টিবডি তৈরি করে তার রহস্য। নিউইয়র্কের রকেফেলার ইউনিভার্সিটির জীনবিজ্ঞানী ডঃ জেমস ভারলেন বলেছেন, "ম্যাকক্লিনটকের TE তত্ত্ব এক ধরনের কোষ কিভাবে অন্যরকমের কোষে পরিণত হয় তা জানতে সাহায্য করেছে। স্বাভাবিক কোষে বিপর্যয় ঘটে কিভাবে ক্যানসার হয় তারও নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা জুগিয়েছে তাঁর তত্ত্ব।"

ম্যাক্‌ক্লিনটক যাঁকে বলেছেন transposable element, সেটা আসলে যে 'ডি এন এ' কণা, বলাই বাহুল্য। একেই এখন বলা হচ্ছে 'Jumping genes'। মলেকিউলার বাইওলজির কোন অভিজ্ঞতা না থাকা সত্বেও এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ একক চেষ্টায় আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে ম্যাক্‌ক্লিনটক এসব ব্যাপার কিভাবে অনুমান করেছিলেন ভাবলে অবাকই হতে হয়। "পৃথিবীতে মাত্র পাঁচজন প্রজননবিজ্ঞানী তখন তাঁর এই গবেষণার প্রশংসা করেন।" বলেছেন জনৈক নোবেলবিজ্ঞানী। আর নোবেল কমিটির মতে, "সমসাময়িক কালে প্রজননবিজ্ঞানে যে দুটি শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কার ঘটেছে, তাদের একটি ম্যাকক্লিনটকের TE, অপরটি DNAএর double-helix structure"।



নোবেল পুরস্কার ঃ ১৯৮৪

১৯৮৪ সালে পদার্থবিজ্ঞানে পুরস্কার পান ইটালির কার্লো রুবিয়া এবং হল্যান্ডের সাইমন ভ্যান ডার মিয়ার। রসায়নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রবার্ট ব্রুস মেরিফিল্ড। চিকিৎসাবিজ্ঞানে ডেনমার্কের নিলস কে. জার্ন, পশ্চিম জার্মানীর জর্জেস জে. এফ. কুহলার এবং আর্জেণ্টিনার সিজার মিলস্টাইন।

রয়েল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অভ্ সায়েন্সের বক্তব্য ; "রুবিয়া এবং ভ্যান ডার মিয়ার অভূতপূর্ব একটি প্রকল্পের উদ্ভাবনা করেন। তাঁদের উদ্ভাবিত পদ্ধতি বহু আকাঙ্ক্ষিত এবং প্রতীক্ষিত 'দুর্বল বলের' (Week force) বাহক W এবং Z কণার অস্তিত্ব পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে। এটি বর্তমান শতাব্দীর একটি শ্রেষ্ঠতম সাফল্য। এই কৃতিত্বের জন্যে তাঁদের নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হল। মেরিফিল্ডকে সম্মাতিত করা হল। তাঁর অসামান্য পদ্ধতি 'for Chemical Synthesis on a Solid Matrix' আবিষ্কারের দরুন। এই পদ্ধতি নিউক্লেয়িক অ্যাসিড কেমিস্ট্রিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে।" ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট পুরস্কার ঘোষণা করার সময় বলেছেন, "জার্ন কুহলার এবং মিলস্টাইন 'monoclonal antibodies' উৎপাদনের ব্যাপারে যে সব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, প্রতিস্থাপন শল্যচিকিৎসা (transplant Surgery), টিউমার এবং অ্যালার্জি রোগ চিকিৎসায় তাদের ভূমিকা অনবদ্য। নোবেল পুরস্কার তাঁদের সেই অবদানেরই স্বীকৃতি।"

পদার্থ বিজ্ঞান

বিভিন্ন মৌল কণার পারস্পারিক প্রতিক্রিয়ার সময় যে সব 'বল' (force) কাজ করে তাদের ব্যাখ্যা জোগাতে গিয়ে গত কুড়ি বছরে একাধিক 'একীভূত তত্ত্ব' বা unified

theory দাঁড় করিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এই সব তত্ত্ব উদ্ভাবনার আগে অনেকে মনে করতেন, প্রাকৃতিক জগতে যে চার রকমের 'বল' পর্যবেক্ষণ করা যায়, যাদের বলা হয় 'প্রাকৃতিক বল' বা natural forces. তাদের প্রত্যেকটিই পারস্পরিক স্বতন্ত্র এবং সম্পর্কহীন। এই বলগুলি হল ঃ ১। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স বা তড়িৎ-চৌম্বক বল। বিদ্যুৎ আধানবাহী কণাগুলির মধ্যে পারস্পরিক যে প্রতিক্রিয়া ঘটে তার মূলে কাজ করে এই 'বল'। ২। 'উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স' বা দুর্বল নিউক্লিও বল। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থেকে ক্ষরিত হয় 'বিটা' রশ্মি। এই ক্ষরণের জন্যে দায়ী 'দুর্বল বল'। ৩। 'স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স' বা অতিশয় সবল নিউক্লিও বল। অত্যন্ত সবল এই শক্তির দরুনই পরমাণুর নিউক্লিয়াসে বন্দী অবস্থায় বিরাজ করে প্রোটন এবং নিউট্রন কণা। ৪। অভিকর্ষ বল বা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। এই বলের দরুন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। সূর্যের চারপাশে পরিক্রমণ করে গ্রহপুঞ্জ। গ্রহের চারপাশে উপগ্রহ। পৃথিবীর বুকে চলে জোয়ার-ভাটা।

আইনস্টাইন থেকে শুরু করে বহু বিজ্ঞানী তত্ত্বের সাহায্যে এই বল চারটির মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। তাঁদের জিজ্ঞাসা ছিল ঃ আপাতদৃষ্টিতে এই বলগুলির সত্তা পৃথক পৃথক মনে হলেও এদের মধ্যে পারস্পরিক কোন সম্পর্ক কি আবিষ্কার করা যায় না ? আবিষ্কার করা কি যায় না এমন কোন 'একম্ অদ্বিতীয়ম্ সত্তা' যা থেকে সৃষ্ট হয়েছে এই চার রকমের 'বল' ? আবিষ্কার করা কি যায় না যে তারা সমসূত্রে গ্রথিত ? অথবা এমন কিছু ঘটনা যা প্রতিটি বলের ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয় ? যদি তেমন কোন ঘটনা সত্যিই আবিষ্কার করা যায় তা হলে বলা চলে বিভিন্ন বল পরস্পর সম্পর্কিত। তবেই বলা যায় একই সৃষ্টির বহুমুখী প্রকাশ ওই চারটি 'বল'। 'একীকৃত ক্ষেত্র' তত্ত্বের এটাই মূল কথা। একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্বের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সাফল্য ঘটিয়েছেন আবদাস সালাম, স্টিভেন ভাইনবার্গ এবং শেলডন লী গ্লাশো। তত্ত্বের সাহায্যে তাঁরা প্রমাণ করেন 'তড়িৎ-চৌম্বক বল' এবং 'দুর্বল বল' পরস্পর সম্পর্কিত। তারা একই শক্তির দ্বিবিধ প্রকাশ। এই সমন্বয় ঘটানোর কৃতিত্বের দরুন ওই ত্রয়ী বিজ্ঞানীকে ১৯৭৯ সালে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। কিন্তু তত্ত্ব হল এক কথা। আর সেই তত্ত্বের পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ অন্য কথা। তাঁদের তত্ত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেও অনেকেই অপেক্ষা করছিলেন এমন কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করার যা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করতে পারে তাঁরা তত্ত্বে যা বলেছেন তা বাস্তবেও সত্য।

পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার সময় দুটি পারমাণবিক কণার মধ্যে চলে শক্তির আদান-প্রদান। এই আদান-প্রদানের কাজটি চালায় আর এক শ্রেণীর তৃতীয় কণা। তারাই প্রতিক্রিয়াশীল কণাগুলির উদ্দেশে বহন করে শক্তি। যাদের বলা হয় 'মধ্যস্থকারী' কণা বা 'intermediary particle'। তড়িৎ এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার সময় উভয়ের মধ্যে যে ধরনের কণার বিনিময় ঘটে তার নাম 'ফোটন'। ফোটন সহজেই দেখা যায় সাধারণ আলো হিসেবে।

১৯৩৫ সালে জাপানী নোবেল বিজ্ঞানী হাইডেকি ইউকাওয়া প্রস্তাব করেন, পারমাণবিক কণা থেকে নির্গত হয় দুই ধরনের 'বল'। 'সবল বল' এবং 'দুর্বল বল'। এই দুই 'বল'ও বহন করে তৃতীয় এক শ্রেণীর কণা। বলের পাল্লা বা বিস্তৃতি যত বেশি হবে, সেই অনুপাতে ওই সব কণার ভরও হবে তত কম। তড়িৎ চৌম্বক বল অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই বল বহন করে ফোটন। তাই ফোটন এতই হাল্কা হয় যে তার ভর নেই বললেই চলে। তুলনায় 'সবল' এবং 'দুর্বল' বলের বিস্তার বেশি দূর পর্যন্ত ঘটে না। তাদের বহনকারী কণার ভর অনেক বেশি হয়। ইউকাওয়া তাঁর তত্ত্বে বললেন মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসে থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন (একমাত্র হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসে নিউট্রন নেই)। তাদের মধ্যে বিনিময় ঘটে এক শ্রেণীর কণা। যাদের তিনি নাম দেন 'মেসন'। প্রোটন এবং নিউট্রনের মধ্যে এই 'মেসন' কণার বিনিময় হওয়ার দরুনই সৃষ্ট হয় অতিশয় সবল বল বা "ভেরী স্ট্রং ফোর্স" যা প্রোটন এবং নিউট্রন কণাদের নিউক্লিয়াসের মধ্যে বন্দী অবস্থায় থাকতে বাধ্য করে। তাঁর প্রস্তাবিত এই কণার অস্তিত্ব ১৯৪৭ সালে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। এই কণার নাম রাখা হয় 'পাই-মেসন'।

এবার প্রশ্ন দাঁড়াল 'দুর্বল বলে'র বাহককে নিয়ে। 'দুর্বল বল'-এর বিস্তৃতি অনেক কম। অতএব এই বল বহনকারী কণার ভর অনেক কম হওয়া উচিত। অন্তত 'পাই-মেসনে'র চেয়ে তো বটেই। কিন্তু সেই ভরের সঠিক পরিমাণ কত, সে ব্যাপারে ১৯৬০-র দশক তো বটেই, এমন কি ১৯৭০ দশকের গোড়াতেও বিজ্ঞানীরা কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পেঁছাতে সক্ষম হননি। পরে এ সম্পর্কে আলোকপাত করেন সালাম, ভাইনবার্গ এবং গ্ল্যাশো। তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে তাঁরা প্রমাণ করলেন নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে প্রোটন এবং নিউট্রন কণাগুলির মধ্যে 'দুর্বল বল' বিনিময় ঘটায় তিন ধরনের আহিত কণা বা charged particles। যাদের একটির আধান +1, নাম W+1। দ্বিতীয়টির আধান −1, নাম W −1। ('+' এবং '−' যথাক্রমে পজিটিভ এবং নিগেটিভ আধান) এবং তৃতীয়টির আধান 'শূন্য' (o), নাম Z-o। তাঁরা এটাও প্রমাণ করলেন W কণার ভর ৭৯·৫ জিগা ইলেকট্রন ভোল্ট এবং Z-এর ভর ৯০ জিগা ইলেকট্রন ভোল্ট। ১ জিগা সমান ১ বিলিয়ন। একটি প্রোটনের ভর ১ জিগা ইলেকট্রন ভোল্ট। এ থেকে বোঝা যায় প্রোটনের তুলনায় W এবং Z কত বেশি ভারী। তাঁরা এটাও প্রমাণ করেন, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি মুহূর্তে ফোটন W এবং Z কণারা শক্তির দিক দিয়ে একই পর্যায়ভুক্ত ছিল। ব্রহ্মাণ্ড যখন শীতল হতে শুরু করল, তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং পৃথক সত্তার অধিকারী হয়। অর্থাৎ এক কথায় তারা পরস্পর সম্পর্কিত, একই সৃষ্টির বিভিন্ন প্রকাশ। এইভাবে 'তড়িৎ-চৌম্বক বল' এবং 'দুর্বল বল'-এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়। অঙ্গীভূত করা হয় 'একীভূত ক্ষেত্রে'।

কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়াল, W এবং Z কণার অস্তিত্ব যে সত্যিই বাস্তব ঘটনা এটা তো পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করাও দরকার? বলা বাহুল্য রুবিয়া এবং

ভ্যান ডার মিয়ারের উদ্ভাবনা গবেষণাগারে ওই W এবং Z কণা উৎপাদনে সমর্থ হয়েছে।

অনেকেই বুঝেছিলেন, W এবং Z কণা সৃষ্টির জন্য চাই প্রচণ্ড শক্তিশালী ত্বারক-যন্ত্র বা particle accelerator। যার কাজ হবে দুটি পারমাণবিক কণার মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটিয়ে ওই সব কণা সৃষ্টি করা। গত কয়েক বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণাগারে এ নিয়ে কাজ চলছিল। ১৯৭৬ সালে কার্লো রুবিয়া, পিটার এম. ম্যাকইনটায়ার এবং ডেভিড বি. ক্লাইভ নতুন একটি পদ্ধতির প্রস্তাব করেন: "ঠিক করলাম, সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের রশ্মি-সংঘর্ষকারী যন্ত্র তৈরি করব আমরা। রশ্মি বলতে এখানে অবশ্য বোঝান হচ্ছে পারমাণবিক কণার প্রবাহ। এই যন্ত্রের মধ্যে ত্বারিত করা হবে দু রকমের রশ্মি—প্রোটন এবং অ্যান্টিপ্রোটন রশ্মি। তাদের শক্তি হবে প্রচণ্ড। তারা বিপরীত দিক থেকে একই আধারে ধাবিত হয়ে এসে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটাবে। প্রোটন এবং অ্যান্টিপ্রোটনের এই সংঘর্ষে সৃষ্ট হবে W এবং Z কণা। আমাদের পরিকল্পনা জেনিভার ইউরোপিয়ান অরগ্যানাইজেশন ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ (CERN) গ্রহণ করল। সেখানে আমরা প্রোটন-অ্যাণ্টি-প্রোটন যন্ত্র তৈরির অনুমতি পেলাম। আর তা আমরা তৈরি করলাম CERN-এ সেখানকার পৃথিবীর বৃহত্তম দুটি প্রোটন ত্বারক যন্ত্র সুপার প্রোটন সিনক্রোট্রন-এর সাহায্যে।" মন্তব্য করেছেন রুবিয়া।

সব চেয়ে বড় রকমের সমস্যা ছিল অ্যান্টিপ্রোটন পাওয়ার ব্যাপারে। প্রাকৃতিক উৎস থেকে সহজেই প্রোটন পাওয়া যায়। কিন্তু অ্যান্টিপ্রোটন পেতে গেলে প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন প্রোটন কণাদের (প্রোটন রশ্মি) আঘাত করাতে হয় কোন ধাতব লক্ষ্যকে (target)। আঘাতের ফলে সৃষ্ট হয় অ্যান্টিপ্রোটন। চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে সেই অ্যান্টিপ্রোটন রশ্মিকে সংঘর্ষ-আধারে পরিচালিত করতে হয় নির্দিষ্ট পথ বরাবর। এই সময় এরা হয় অত্যন্ত উত্তপ্ত। উত্তপ্ত অবস্থায় থাকলে তারা সঞ্চার পথ থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে আধারের গায়ে গিয়ে আঘাত করে। রশ্মির মাত্রা কমে যায়। ভ্যান ডার মিয়ার বিশেষ একটি পদ্ধতিতে এই অ্যান্টিপ্রোটন রশ্মিকে শীতল (Cool) করতে সমর্থ হন। ফলে অ্যান্টিপ্রোটন রশ্মিকে তার মাত্রা অক্ষুন্ন রেখে নির্দিষ্ট সঞ্চার পথে বহাল রাখা সম্ভব হয়। কাজটি খুব জটিল। যাই হোক, ১৯৮৩ সালে সাফল্য অর্জন করা গেল। রুবিয়া এবং ভ্যান ডার মিয়ারের তৎপরতায় গবেষণাগারে সৃষ্ট হল W এবং Z কণা। উল্লেখ্য, W এবং Z কণার স্থিতিকাল অবশ্য খুবই নগণ্য। সৃষ্টির পর তাদের অস্তিত্ব বজায় থাকে মাত্র ১০ সেকেণ্ডের মত। তারপর বিভিন্ন কণা সৃষ্টি করে বিলীন হয়ে যায়। শেষোক্ত এই কণাগুলির মধ্যে রয়েছে কোয়ার্জ এবং অ্যান্টি-কোয়ার্জ, লেপটন এবং অ্যান্টি-লেপটন প্রভৃতি। পাই-মেসন আবিষ্কারের পর W এবং Z কণার আবিষ্কার কণা-পদার্থে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি শ্রেষ্ঠতম সাফল্য।

কার্লো রুবিয়ার বয়েস এখন ৫০। এক সঙ্গে দুই চাকরি। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা এবং CERN-এ গবেষণা। ফলে প্রায়শই তাঁকে উড়তে হয় ইউরোপ থেকে আমেরিকায় এবং আমেরিকা থেকে ইউরোপে। তাই তাঁর ডাকনাম হয়ে দাঁড়িয়েছে 'আলইটালিয়া বিজ্ঞানী' (আলইটালিয়া ইটালির বিমান সংস্থার নাম)। জন্ম ইটালির গারিসিয়ায়। বাবা ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার। ১৯৪৪ সালে বয়েস যখন তাঁর দশ, তখন ইটালির উপর দিয়ে বয়ে চলেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝড়। চলার পথে সেনারা নানা রকম বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এখানে সেখানে ফেলে দিয়ে যেত। সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে বালক রুবিয়া কত রকম পরীক্ষাই না করতেন। পরবর্তীকালে এই অভ্যেসই তাঁর মধ্যে জটিল ইলেকট্রনিকস যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করার যোগ্যতা সৃষ্টি করে। বলেছেন রুবিয়া।

মোটর গাড়িতে যাচ্ছিলেন ত্রিয়েস্তে-তে বিমান ধরবেন বলে। গাড়ির মধ্যে রেডিওতে চলছিল বাজনা। হঠাৎ বাজনা থেমে গেল। শোনা গেল ঘোষকের কণ্ঠ : বড় খবর। এবছর পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ইটালির রুবিয়া এবং হল্যান্ডের ভ্যান ডার মিয়ার। খবরটি শুনেই উল্লসিত হলেন রুবিয়া। চালককে হই হই করে বলতে লাগলেন, তোমার সোয়ারি বিখ্যাত লোক। আমিই রুবিয়া। বেচারা ড্রাইভার তো হতবাক। ভাবল, পাগল নাকি! গন্তব্যস্থলে পেঁছানর পর যখন দেখল অনেকেই তাঁকে উল্লাসে জড়িয়ে ধরছে, তখন তার ভুল ভাঙল। বলল, সিনর, আমি ভাগ্যবান। এ যাত্রায় ভাড়াটা আপনার কাছ থেকে নেব না।

সাইমন ভ্যান ডার মিয়ার ৫৮য় পড়লেন। চরিত্রে তিনি কিছুটা অন্তর্মুখী। জন্ম ২৪ নভেম্বর, ১৯২৫, হেগ্-এ। মাধ্যমিক এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা ডেল্ফট্-এ। স্নাতক হওয়ার পর আইনডোভেনে ফিলিপস্ কোম্পানিতে যোগ দেন এবং ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপি নিয়ে কাজ করেন। ডেল্ফট্ থেকে ফিজিকাল এঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক হওয়ার পর ১৯৫৬ সালে তিনি CERN-এ চলে আসেন। এখানে ধারক প্রযুক্তি, চৌম্বক প্রযুক্তি এবং নিউট্রিনো রশ্মি উৎপাদক যন্ত্র তৈরির ব্যাপারে তিনি অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

রসায়ন

নিউ ইয়র্ক সিটির রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্লেকসনার হলের সেই লিফ্‌টি এখন বিশ্বখ্যাত। এই লিফ্‌টে চড়লেই তার গায়ে হাতে লেখা কয়েকটি শব্দ এখনো চোখে পড়বে : Solid-Phase Peptide Synthesis was Born Here। শব্দগুলি লেখা হয়েছিল আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়েরই জীবরসায়নবিদ্ রবার্ট ব্রুস মেরিফিল্ড তাঁর এক সতীর্থের সঙ্গে চারতলায় উঠছিলেন। হঠাৎ তাঁর মাথায় এল প্রোটিন সংশ্লেষণের অভিনব পদ্ধতি। প্রোটিন যা জীবন সৃষ্টির মূলে কাজ করে। জৈবিক কোষের মূল উপাদান ডি এন এ এবং আর এন এ অণু। যাদের

সৃষ্টি হয় প্রোটিনের উপর নির্ভর করে। এ যেন অজ্ঞাতসারে পরম একটি সত্যকে উপলব্ধি করা। উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে লিফ্‌টের দেওয়ালে ওই শব্দগুলো লিখে ফেলেন মেরিফিল্ড। আর সেই ঘটনার পঁচিশ বছর পর ৬৩ বছর বয়স্ক মেরিফিল্ড গত অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে ওই একই লিফটে যখন উপরে উঠছিলেন, গবেষণাগারের এক কর্মী তাঁকে উচ্ছ্বাসে জড়িয়ে ধরলেন। কর্মীটি ওই শব্দগুলির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি, অধ্যাপক মেরিফিল্ড। নোবেল ফাউনডেশন আপনাকে এ বছর নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন। আর আপনি তা পেলেন আপনার ওই 'আইডিয়ার' দরুন।

মেরিফিল্ড হতবাক্‌। অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের এই অধ্যাপকের মুখে শুধু একটি কথাই শোনা গেল, ধন্যবাদ, মিঃ— ।

ভাইরাসের দরুন হয় নানারকম রোগ। ভাইরাসকে একটি ছোট্ট প্যাকেটের সঙ্গে তুলনা করা যায়। যার মধ্যে থাকে ডি এন এ অথবা আর এন এ। আর সেই ডি এন এ অথবা আর এন এ-কে আচ্ছাদনের মত ঢেকে রাখে বিভিন্ন প্রোটিনের আবরণ। যার চারপাশে প্রোটিন সমৃদ্ধ পর্দার মত আবরণও থাকতে পারে। দীর্ঘকাল ধরে একটা ব্যাপার নিয়ে অনেকেই চিন্তা ভাবনা করছিলেন। রোগ সৃষ্টি করার মূলে কাজ করে অ্যাণ্টিজেন। এই অ্যাণ্টিজেন জৈব এবং অজৈব পদার্থও হতে পারে, আবার ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসও হতে পারে। অ্যাণ্টিজেন শরীরে প্রবেশ করিলেই তার রাসায়নিক চরিত্র অনুযায়ী শরীরে তৈরি হয় আর এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ। যাদের বলা হয় অ্যাণ্টিবডি। অ্যাণ্টিবডির কাজ অ্যান্টিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অ্যান্টিজেনের ক্ষতির হাত থেকে শরীরকে রক্ষা করা। অর্থাৎ এক কথায় রোগ প্রতিরোধের মূলে কাজ করে অ্যান্টিজেন। এই ধারণাটাই কাজ করেছিল ভ্যাকসিন তৈরির ব্যাপারে। ভ্যাকসিনের লক্ষ্য, বিশেষ বিশেষ রোগ জীবাণু বা ভাইরাস বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিতে বিপদ মুক্ত করে শরীরে প্রবেশ করান। শরীরে প্রবেশ করে তারা তৈরি করবে অ্যান্টিজেন। সেই অ্যান্টিজেন ভবিষ্যতে রোগ জীবাণুর সংক্রামণ ঘটলে শরীরকে রক্ষা করবে।

বিগত কয়েক বছর ধরে অনেকেই ভাবছিলেন, পুরো অ্যান্টিজেন (ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া) কেন ? এমনও তো হতে পারে, অ্যান্টিজেনের ক্ষুদ্রতম একটি অংশই ভ্যাকসিন হিসাবে কাজ করার ক্ষমতা রাখে, পুরো অ্যান্টিজেনের দরকার হয় না ? ক্ষুদ্র ওই অংশটিই তৈরি করে আকাঙ্ক্ষিত অ্যান্টিবডি, যা রোগের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে ?

বছর ৪৫ আগে ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখলেন রকফেলার ইনসটিটিউট ফর মেডিকেল রিসার্চের এক বিজ্ঞানী ওয়ালদার এফ গোয়েবেল। তিনি দেখালেন, নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার গায়ে থাকে এক ধরনের শৃংখলিত শর্করা অণু (Sugar Chain)। এই অণুই নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

ই'দুরের শরীরে এই অণু প্রবেশ করার পর ওই রোগে তারা আক্রান্ত হয়। কিন্তু
একবার আক্রান্ত হওয়ার পর আবার যদি ওই ব্যাকটেরিয়া তাদের শরীরে সংক্রামিত হয়,
আর তারা রোগাক্রান্ত হয় না। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়, এই শর্করা যোগ নিশ্চয়
ই'দুরের শরীরে নিউমোনিয়ার ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ করার অ্যান্টিবডি তৈরি করে।

বিজ্ঞানীরা দেখলেন, ব্যাপারটা তো মন্দ নয়। অনেক সময় জীবাণু অথবা
ভাইরাস দিয়ে তৈরি ভ্যাকসিন শরীরে রোগ প্রতিরোধ করতে গিয়ে কিছু কিছু
বিপত্তিও (side effect) ঘটায়। কিন্তু যদি নিশ্চিত হওয়া যায়, তাদের দেহের
একমাত্র বিশেষ কোন অংশই রোগ প্রতিরোধ অংশ গ্রহণ করে তা হলে সেই অংশগুলি
পৃথক করে ভ্যাকসিন তৈরি করলে তো আর বিপদের কোন ভয় থাকে না। রয়েছে
বিভিন্ন ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড। তারা রাসায়নিক ভাবে মিলিত হয়ে তৈরি করে
পেপটাইড অণু। আর পেপটাইড অণুগুলিই মিলিত হয়ে তৈরি করে প্রোটিন অণু।
দেখা গেল, বিশেষ বিশেষ পেপটাইড অ্যান্টিজেন হিসাবে কাজ করে। ঘটায় বিশেষ
বিশেষ রোগ। যদি তাই হয়, এক একটি রোগ সৃষ্টিকারী পেপটাইড যদি পৃথক-
ভাবে সংগ্রহ করা যায়, তাদের দিয়েই তৈরি করা চলে বিভিন্ন রোগের ভ্যাকসিন? এ
কাজ খুবই জটিল এবং শ্রম সাপেক্ষ। অনেকেই চেষ্টা করতে লাগলেন পেপটাইড
সংগ্রহ করতে। কিন্তু তাঁদের পদ্ধতিগুলি বাস্তবসম্মত হল না। অবশেষে ১৯৬০-
এর দশকে মেরিফিল্ড আবিষ্কার করলেন অভিনব একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতির
সাহায্যে তিনি সহজে বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের অণু জুড়ে আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী
নানা রকম পেপটাইড সংশ্লেষণ করতে সমর্থ হন।

তার পদ্ধতিটি খুবই সহজ। এর জন্যে একটি আধারে নিলেন অতি ক্ষুদ্র
পলিস্টাইরেন (Polystyren) কণা। বস্তুটি কঠিন এবং রাসায়নিক দিক থেকে
নিষ্ক্রিয়। এবার সেই আধারের মধ্যে ফেলতে লাগলেন ফোঁটা ফোঁটা অ্যামাইনো
অ্যাসিড। কোন নির্দিষ্ট পেপটাইড তৈরি করতে যাদের দরকার তাদের। তারা
পরপর জুড়ে সৃষ্টি করল আকাঙ্ক্ষিত পেপটাইড। শোধনকারী দ্রবণ দিয়ে ক্রমবর্ধমান
রাসায়নিক শৃঙ্খল ধুয়ে নেওয়া হল। যখন পুরোপুরি প্রোটিন অণু তৈরি হয়ে
গেল তখন অ্যাসিডের সাহায্যে পলিসটিরেন ধারক থেকে সংগ্রহ করার পালা। তাঁর
পুরানো এই পদ্ধতির ইতিমধ্যে যথেষ্ট সংস্কার সাধন করা হয়েছে। এখন কমপিউ-
টারের সাহায্যে তৈরি করা হচ্ছে নানা রকম পেপটাইড এবং প্রোটিনের মডেল। সেই
মডেল অনুযায়ী তৈরি করা হচ্ছে বাইবোনিউক্লিয়েজের (এনজাইম) মত জটিল
প্রোটিনও। এই প্রোটিন জীন প্রযুক্তির কাজ সহজতর করেছে। অনেকে আশা
করছেন, অদূর ভবিষ্যতে মেরিফিল্ডের পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে উৎপাদন করা হবে
নানান রোগের ওষুধ। যাদের মধ্যে ডায়াবেটিজ এবং হৃদরোগের ওষুধ থাকবে।

জন্ম জুলাই ১৫, ১৯২১ টেকসাসের ফোর্ট ওয়ার্থে। লস অ্যাঞ্জেলেসস্থিত
ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি। মৃদুভাষী অধ্যাপক মেরিফিল্ড

বয় স্কাউট করতেন। গবেষণার অবসরে নিজস্ব বাগানে ঝরা পাতা সংগ্রহ করে সাজিয়ে রাখেন। নোবেল পুরস্কারের সংবাদ শুনে তিনি মন্তব্য করেন, "আমার অবশিষ্ট জীবন আমি গাছের পাতা সাজিয়েই কাটিয়ে দিতে পারি।"

চিকিৎসাবিজ্ঞান

'নেচার' পত্রিকার আগস্ট ৭, ১৯৭৫-এর সংখ্যায় প্রকাশিত হল তিন পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘ গবেষণাপত্র। এই গবেষণা পত্রে অত্যন্ত বিশুদ্ধ এবং বিপুল পরিমাণে নানা রকম 'অ্যান্টিবডি তৈরির দাবি করলেন ইংলণ্ডের কেমব্রিজস্থ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল ল্যাবেরোটরির দুই বিজ্ঞানী, সিজার মিলস্টাইন এবং জর্জেস কুহ্লার। তাঁরা বললেন, বিভিন্ন অ্যান্টিবডি তৈরির জন্যে যে পদ্ধতিটি তাঁরা আবিষ্কার করেছেন রোগচিকিৎসা এবং বিভিন্ন শিল্পে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

তাঁদের গবেষণা পদ্ধতিটি ছিল এই রকম ঃ মাইয়েলোমা (myeloma) নামে এক ধরনের ক্যানসারের একটি কোষ নিলেন তাঁরা। সেই সঙ্গে নিলেন একটি অ্যান্টিবডি উৎপাদনক্ষম রক্তের শ্বেত কণিকা। এবার ওই ক্যানসার কোষ এবং শ্বেত কণিকার মধ্যে ঘটালেন মিলন। উভয় কোষ পরস্পর মিশে গিয়ে তৈরি করল নতুন এক ধরনের কোষ। যাকে বলা হল 'কোষসংকর' বা hybrid cell। মিলস্টাইন এবং কুহ্লার নতুন এই কোষের নাম রাখলেন hybridoma (hybrid-myelomaর সংক্ষিপ্ত-করণ)। রীতিমত অবাক কান্ড। তাঁরা দেখলেন, নতুন এই কোষ অ্যান্টিবডিও তৈরি করে। আবার দ্রুত বিভাজিত হয়ে সৃষ্টি করে ক্যানসার কোষ। এ-ক্ষেত্রে অ্যান্টি-বডি বলতে ওই মাইয়েলোমারই অ্যান্টিবডি বোঝাচ্ছে। এই কোষসংকর ক্রমান্বয়ে বিভাজিত হয়ে ওই কোষসংকরের মতই কোষ সৃষ্টি করতে লাগল। যেন একটি ছাপা পাতার হুবহু নকল। এই নকল কোষদেরই বলা হয় 'ক্লোন' (Clone)। এই সব কোষ ওই শ্বেতকণা যে ধরনের 'অ্যান্টিবডি' উৎপাদন করে ; বিভাজনের সময় একই সঙ্গে সেই অ্যান্টিবডিও উৎপাদন করে। এবং সেই অ্যান্টিবডি অনেক বিশুদ্ধ। যাকে বলা হয় 'Monoclonal'। অর্থাৎ কোষসংকর হয়ে দাঁড়াল বিশেষ একটি রোগের অ্যান্টিবডি তৈরির যেন একটি কারখানা। মিলস্টাইন এবং কুহ্লার দেখলেন, এই-ভাবে বিভিন্ন কোষের সঙ্গে শ্বেতকণার মিলন ঘটিয়ে নানারকম কোষসংকর তৈরি করা যায় এবং তা থেকে উৎপাদন করা যায় বিভিন্ন রোগ-প্রতিরোধক অ্যান্টিবডি। এবং তা যথেষ্ট বিশুদ্ধও বটে। এই পদ্ধতিতে অ্যান্টিবডি উৎপাদন করে তার সাহায্যে ক্যানসার থেকে শুরু করে ম্যালেরিয়া রোগ নিরাময়ের পথ সুগম হয়েছে। শরীরে কোন প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন করার পর অনেক সময় শরীর কর্তৃক তা পরিত্যক্ত হয়। যথাযথ অ্যান্টিবডির অভাবেই এমনটি হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সেই অ্যান্টিবডি উৎপাদন করে প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন সফল করা যায়। এ নিয়ে কিছু কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষাও হয়েছে। তাতে আশানুরূপ ফলও পাওয়া গেছে। সম্ভব হয়েছে কোন কোন ক্যানসার

নিরাময়। মিলস্টাইন এবং কুহ্লারকে এই কৃতিত্বের দরুনই নোবেল কমিটি নির্বাচন করেছেন ১৯৮৪ পুরস্কারের জন্যে।

নিলস জার্নে'র ঘোষণা অবশ্য অনেক বেশি মৌলিক। ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর "Network theory"। এই তত্ত্ব রোগপ্রতিরোধ প্রণালীর উপর নতুন আলোকপাত করে। জোগায় আরো সহজতর ব্যাখ্যা। তাঁর তাত্ত্বিক পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে কৃত্রিম উপায়ে প্রাণীদেহের বাইরে 'ইনটারফেরন' নামে এক শ্রেণীর প্রোটিন যৌগ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এই যৌগ জীবকোষ থেকে নিঃসৃত হয়। এই যৌগগুলিরও বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রয়েছে। যদিও প্রাণী বিশেষে তাদের গঠন এবং চরিত্র হয় স্বতন্ত্র। মুরগীর কোষ থেকে যে ইনটারফেরন নিঃসৃত হয় তা মুরগীর রোগ প্রতিরোধে সক্ষম, অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে নয়। সুবিধে এই, এই যৌগ নির্গত হয় কোষ থেকে। কৃত্রিম উপায়ে কোষ থেকে উৎপাদনও করা যায়। নানা রকম ভাইরাসের আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায় এদের সাহায্যে। তা ছাড়া কোষ কর্তৃক স্বাভাবিক অথবা প্রকৃতিগত ভাবে নিঃসৃত হয় বলে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়াও ঘটায় না। ফলে বিভিন্ন জটিল রোগ চিকিৎসায় ইনটারফেরন ব্যবহারের কথা অনেকদিন ধরেই ভেবে আসছেন চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা। কিন্তু মুশকিল হল বিশুদ্ধ ভাবে এবং বেশি পরিমাণে তাদের পাওয়া। এ ব্যাপারে বিগত দুই দশক ধরে "Salting out," Ion-Exchange Chromatography, Gel Electrophoresis এবং আরো নানা পদ্ধতি কাজে লাগানর চেষ্টা করে আসছেন বিভিন্ন গবেষক। কিন্তু সে-সব পদ্ধতি খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি।

জার্ন এই বাধাটি দূর করেছেন তাঁর পদ্ধতির সাহায্যে। পদ্ধতিটির নাম affinity chromatography। এর মূল সূত্র হলঃ এক একটি ইনটারফেরন যৌগের বিশেষ কোন বস্তুর প্রতি আসক্তি থাকে। কঠিন (Solid) বস্তু। যা কাজ করে যেন ছাঁচের মত। কোন নির্দিষ্ট স্ক্রু যেমন নির্দিষ্ট মাপের গর্তে'র মধ্যেই আটকান যায়, অন্য মাপের গর্তে নয়, ঠিক তেমনি এ ক্ষেত্রে বিশেষ একটি ইনটারফেরন যৌগ বিশেষ একটি কঠিন বস্তুর সঙ্গেই সংযুক্ত হয়। যাকে বলা হয় Solid matrix। এই solid matrix একটি Chromatography নলের মধ্যে পুরে রাখা হয়। তারপর সেই নলের মধ্যে খাদমিশ্রিত ইণ্টারফেরন ঢেলে দিলে, খাদ থেকে পৃথক হয়ে এই ইনটারফেরন কঠিন কণার (matrix) গায়ে আটকে যায়। আর বেশির ভাগ খাদ নল থেকে যায় বেরিয়ে। এরপর বিশেষ ধরনের দ্রবণের সাহায্যে ইনটারফেরন ধুয়ে নিলেই পাওয়া যায় বিশুদ্ধ ইনটারফেরন। এই কৃতিত্বই জার্নকে এনে দিয়েছে ১৯৮৪র নোবেল পুরস্কার।

জার্নে'র বয়েস ৭২। বাবা মা ডেনমার্কে'র অধিবাসী। জন্ম লণ্ডনে। রোগ প্রতিরোধবিজ্ঞানে তাঁর গবেষণা পথিকৃৎ-এর মর্যাদা পেয়েছে।

নোবেল পুরস্কার ১৯৮৫

পদার্থবিজ্ঞানে এ বছর নোবেল পুরস্কার পেলেন অধ্যাপক ক্লাউস ফন ক্লিটজিং। রসায়নে অধ্যাপক হারবার্ট হাউপটমান এবং জেরম-কার্লে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে অধ্যাপক জোসেফ গোল্ডস্টাইন এবং মাইকেল ব্রাউন। নোবেল কমিটির বক্তব্য ঃ অধ্যাপক ক্লিটজিং-এর অসামান্য আবিষ্কার "কোয়ান্টাইজড হল ইফেক্ট"। এই আবিষ্কার ভবিষ্যতে সেমিকনডাকটার শিল্পকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করবে—একথা বিবেচনা করেই তাঁকে ১৯৮৫ সালের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হল। হারবার্ট হাউপটন এবং জেরম কার্লে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেলেন "অণুর ত্রিমাত্রিক গঠন নির্ণয়ের তাঁরা যে অভিনব গাণিতিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন" তার দরুন। মাইকেল ব্রাউন এবং জোসেফ গোল্ডস্টাইন দীর্ঘ বারো বছর দেহ-কোষে কোলেস্টারল পরিবহনের ব্যাপারে যে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন তারই স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁরা ১৯৮৫ সালের নোবেল পুরস্কারে বৃত হলেন। ১০ ডিসেম্বর নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তক অ্যালফ্রেড বার্নার্ড নোবেলের মৃত্যু দিবস। প্রথা অনুযায়ী ওই দিন স্টকহোমে প্রাপকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে এ বছরের নোবেল পুরস্কার।

পদার্থবিদ্যায়

"সত্যিই এটা এক অসাধারণ ঘটনা। শুধু অপ্রত্যাশিতই নয়, ব্যাপারটা আমি যেন বিশ্বাসই করতে পারছি না।" স্টুটগার্টের ম্যাকস প্ল্যাঙ্ক সলিড স্টেট রিসার্চ ইনসটিটিউটে যখন খবর গিয়ে পৌঁছাল এ বছর পদার্থবিজ্ঞানে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, ৪২ বছর বয়স্ক অধ্যাপক ক্লাউস ফন ক্লিটাজিং-এর ছিল এটাই প্রথম মন্তব্য। ক্লিটজিং আবেগে উচ্ছ্বসিত। এ উচ্ছ্বাস শুধু নিজের সম্মানের জন্যে নয়, স্বদেশের সম্মানে। কারণ দীর্ঘ বাইশ বছর পর এই প্রথম একজন জার্মান পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন। তাঁর কাছে ব্যাপারটা বিস্ময়ের মত।

বিস্ময়। যে আবিষ্কারের জন্যে এই সম্মান সেটাও তো এক বড় রকমের বিস্ময়। ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০। ফ্রান্সের গ্রেনোবল্-এ একটি গবেষণাগারে রাত ঠিক দুটোর সময় ঘটেছিল সেই নাটকীয় আবিষ্কার। এতকাল ক্লিটজিং পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করছিলেন। কিন্তু ঐ দিন হঠাৎ তাঁর মাথায় এল 'হল ইফেক্ট'-এর কথা। কতকটা দিব্যদৃষ্টির মত। 'হল ইফেক্ট' আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৮৭৯ সালে। ক্লিটজিং দেখলেন, প্রায় একশ' বছর পূর্বে আবিষ্কৃত এই ঘটনাটি কোয়ান্টাম

মেকানিকস বা অখণ্ড বলবিদ্যার সাহায্যেও তো ব্যাখ্যা করা চলে। শুধু ব্যাখ্যাই
নয়, অখণ্ড বলবিদ্যার সাহায্যে 'হল-বিদ্যুৎ প্রবাহ' মাপা সম্ভব। এ ধরনের বিদ্যুৎ
প্রবাহ মাপার ব্যাপারে দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করে আসছিলেন বিজ্ঞানীরা। ক্লিটজিং
যখন বললেন, অখণ্ড বলবিদ্যার সাহায্যে 'হল-বিদ্যুৎ প্রবাহে'র ব্যাখ্যা এবং পরিমাপ
সম্ভব, সে কথা গোড়ায় অনেকেই বিশ্বাস করতে পারেননি। কিন্তু সেই অসম্ভবকেই
সম্ভব করলেন তিনি।

মূল সূত্র বিদ্যুৎ প্রবাহ। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় আবিষ্কৃত হল ইলেকট্রন।
বিদ্যুৎ পরিবাহিতার দিক থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ বস্তু মুখ্যত দুটি শ্রেণীতে ভাগ
করা হয়—'কনডাকটার' বা বিদ্যুৎ পরিবাহী এবং 'ইনসুলেটর' বা বিদ্যুৎ
অপরিবাহী। বিদ্যুৎ প্রবাহ বলতে বলা হয় ইলেকট্রনের প্রবাহ। বিজ্ঞানীরা ধরে
নিলেন, ধাতুর মধ্যে যে সব পরমাণু থাকে তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক পরমাণু অথবা
প্রত্যেকটি পরমাণু থেকে একটি করে ইলেকট্রন বেরিয়ে এসে ধাতুর মধ্যে মুক্ত অবস্থায়
বিচরণ করে। এই মুক্ত ইলেকট্রনগুলিই সৃষ্টি করে বিদ্যুৎ প্রবাহ। ইনসুলেটারে এ
ধরনের মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না বলে বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিবহণে অক্ষম। অখণ্ড বলবিদ্যা
আবিষ্কারের পূর্বে এই ঘটনার ব্যাখ্যা যোগান সম্ভব হয়নি। পরে ধাতুর মধ্যে মুক্ত
ইলেকট্রনের সংখ্যা নির্ণয়ের চেষ্টা করতে গিয়ে ১৮৭৯ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী এডুইন
হারবার্ট হল একটি অদ্ভুত ঘটনা আবিষ্কার করলেন। তিনি দেখলেন, একটি নালার
ভেতর দিয়ে যেমন স্বচ্ছন্দ গতিতে ঘটে জলের প্রবাহ, একটি ধাতব তারের ভেতর দিয়ে
ঠিক তেমনই স্বচ্ছন্দ গতিতে স্বাভাবিক অবস্থায় চলে ইলেকট্রনের প্রবাহ। অর্থাৎ যাকে
আমরা বলি বিদ্যুৎ প্রবাহ। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার এই, বিদ্যুৎ প্রবাহের সঙ্গে উল্লম্বভাবে
(perpendicularly) চৌম্বক ক্ষেত্র আরোপ করলে পরিবাহীর মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ
এক পাশে সরে যায়। যেমন সরে যায় নালায় এক খণ্ড পাথর ফেললে জলের প্রবাহ।
চৌম্বক ক্ষেত্রের সান্নিধ্যে পরিবাহীর মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহের এক পাশে সরে যাওয়ার
এই ঘটনারই নাম দেওয়া হয় "হল ইফেক্ট" বা বাংলায় "হলের প্রভাব"। আর
পরিবাহীর মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহের এই পার্শ্বচ্যুতির দরুন পরিবাহীর দুই প্রান্তে যে
তড়িৎ-বিভেদ বা 'ভোল্টেজ' সৃষ্ট হয় তাকে বলা হয় 'হল ভোল্টেজ' বা হলের
তড়িৎ-বিভেদ। এই তড়িৎ-বিভেদ মাপাও যায়। উল্লেখ্য, তড়িৎ-বিভেদের মাত্রা
কতটা হবে সেটা নির্ভর করে, পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রতিটি ইলেকট্রন কতটা গতি
নিয়ে অগ্রসর হয় তার ওপর। আর তড়িৎপ্রবাহ নির্ভর করে ইলেকট্রনের সংখ্যা এবং
ইলেকট্রনের গতির উপর। অতএব 'হল-ভোল্টেজ' এবং প্রবাহ মেপে বলে দেওয়া যায়
পরিবাহীর মধ্যে কতসংখ্যক 'মুক্ত ইলেকট্রন' (free electrons) রয়েছে। দেখা
গেছে তামার মত কোন সুপরিবাহীতে প্রতিটি পরমাণু একটি করে ইলেকট্রন হারায়,
যা মুক্ত ইলেকট্রন হিসেবে বিরাজ করে। এক ঘন সেণ্টিমিটারে মুক্ত ইলেকট্রনের
সংখ্যা $১০^{২২}$-এর মত।

অধ্যাপক ক্লিট্জিং সেমিকনডাকটার বা প্রায়-পরিবাহী বস্তু নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। যে সব বস্তু সেমিকনডাকটার হিসেবে কাজ করে তারা মুখ্যত অধাতু। নিখাদ অবস্থায় নিম্ন তাপমাত্রায় তারা বিদ্যুৎ পরিবহন করে না। তাদের মধ্যে ইলেকট্রন আরোপ করলে তবেই তারা পায় বিদ্যুৎ পরিবহনের ক্ষমতা। এ ব্যাপারে সহজ পন্থা হল, সেমিকনডাকটার কেলাসের ভেতর যৎসামান্য ভিন্নধর্মী রাসায়নিক বস্তু মিশিয়ে দেওয়া। এমন ধরনের বস্তু যার প্রতিটি পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রন বিচ্যুত হয়ে সেমিকনডাকটারের মধ্যে মুক্ত অবস্থায় বিচরণ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সেমিকনডাকটার আচরণ করে বিদ্যুৎ পরিবাহীর মত। অধ্যাপক ক্লিট্জিং ধারণা করেছিলেন, সেমিকনডাকটারের ক্ষেত্রে 'হল-ভোল্টেজ' কতটা দাঁড়াবে সেটা নির্ভর করে কোন্ বস্তু সেমিকনডাকটার হিসেবে ব্যবহার করা হবে তার উপর। কিন্তু পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন এটা ঠিক নয়। তিনি আবিষ্কার করলেন, সেমিকনডাকটার যে বস্তুরই হোক না কেন, হল-ভোল্টেজ প্রতিক্ষেত্রেই থাকে একই রকম, বস্তুর প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না। শুধু তাই নয়, তিনি এটাও লক্ষ্য করলেন, চৌম্বক বল ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করলে সেই অনুপাতে ক্রমান্বয়ে হল-ভোল্টেজের বৃদ্ধি ঘটে না। বৃদ্ধি ঘটে হঠাৎ হঠাৎ কিছুটা সময় অন্তর।

কোয়াণ্টামতত্ত্ব অনুযায়ী বলা হয় পরমাণুর অভ্যন্তরে একটি শক্তি-দশা থেকে অপর শক্তি-দশায় উন্নীত হয় সমপর্যায়ে নয়, হঠাৎ হঠাৎ, গাণিতিক ধারাবাহিকতা বজায় রেখে। সেমিকনডাকটারের ক্ষেত্রে এই সত্যই আবিষ্কার করেন অধ্যাপক ক্লিট্জিং। তিনি দেখিয়েছেন, চৌম্বক বলের 'পরিবর্তনে'র দরুন সেমিকনডাকটারে হল-ভোল্টেজের বৃদ্ধি ঘটে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর। এ ক্ষেত্রে সময়ের সূক্ষ্মতা 0.000000১-এর মত। গত এক দশক ধরে বিজ্ঞানীরা বলে আসছিলেন, কোয়াণ্টাম তত্ত্বের সঙ্গে হল-ভোল্টেজের কোন সম্পর্ক নেই। "সেটা অবশ্য না আশা করারই কথা। যাই হোক অখণ্ড বলবিদ্যার হিসেব যে অত সূক্ষ্মতার সঙ্গে পরিমাপ সম্ভব, ক্লিট্জিং সেটা প্রমাণ করেছেন।" মন্তব্য করেছেন নোবেল কমিটি।

নোবেল কমিটির পদার্থবিদ্যা শাখার চেয়ারম্যান অধ্যাপক স্টিগ লুণ্ডকিউভিস্টের বক্তব্য: "আগামী প্রজন্মের ইলেকট্রনিকস সাজসরঞ্জাম তৈরির ক্ষেত্রে ক্লিট্জিং-এর আবিষ্কার গুরুত্ব পাবে।" ওই কমিটির আর-এক সদস্য অধ্যাপক কার্ল নর্ডলিং বলেছেন, 'বৈদ্যুতিক রোধ আরো সূক্ষ্মতার সঙ্গে পরিমাপ করতে সাহায্য করবে তাঁর আবিষ্কার। এছাড়াও, পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের গতিবিধি সম্পর্কিত তত্ত্বগুলি নির্ভরযোগ্যভাবে প্রমাণ করা যাবে।

ক্লাউস ফন ক্লিট্জিং-এর পড়াশুনা বার্নসভিক এবং ভুরজবুর্গ-এ। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করার পর তিনি মুানিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক গবেষণাগারে গবেষণা করেন। সেখান থেকে চলে আসেন স্টুটগার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার বিশিষ্ট মৌলিক-গবেষক হিসেবে পশ্চিম জার্মানিতে ইতিপূর্বেই তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

মুানিখে একটি বিজ্ঞান সভায় বক্তৃতা দিয়ে বিমানে দেশে ফিরছিলেন অধ্যাপক জেরম কার্লে। এমন সময় মাথার উপর লাউড স্পিকার সরব হয়ে উঠল। "যাত্রীদের উদ্দেশে বিশেষ ঘোষণা। আমরা নিজেদের সম্মানিত বোধ করছি। শুনে খুশি হবেন, এই বিমানে আমাদের সহযাত্রী হিসেবে চলেছেন আমেরিকার নবতম নোবেল বিজ্ঞানী।" ভেসে এল পাইলটের কণ্ঠস্বর। আর তার পরমুহূর্তে নিজের আসনে বসে কার্ল মন্তব্য করলেন, "এমন একটা কিছু যে ঘটেছে, এই প্রথম আমি জানতে পেলাম।" অধ্যাপক হারবার্ট হাউপ্টম্যান অবশ্য ওয়াশিংটনে নেভাল রিসার্চ ল্যাবোরেটারিতেই খবরটা পান। সেখানে বসেই তিনি খবর পান, ১৯৮৫ সালে যুগ্মভাবে যে দুজনকে রসায়নে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে তাদের একজন তিনি স্বয়ং, অপরজন তাঁর দীর্ঘকালের সতীর্থ জেরম কার্লে। প্রথম মুহূর্তে ব্যাপারটা দুজনের কাছেই অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়েছিল।

হ্যাঁ, গোড়ায় বেশির ভাগ বিজ্ঞানীই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন বৈকি। তাঁদের ধারণা ছিল, হাউপ্টম্যান এবং কার্লে যা করতে চলে ছন তা অসম্ভব। পরে তাঁদের স্বর অবশ্য কিছুটা নরম হয়। তবু বিজ্ঞানী মহলের মিশ্র প্রতিক্রিয়া উপেক্ষা করে নীরব সাধকের মত গত তিন দশক ধরে গবেষণায় ক্ষান্তি দেননি তাঁরা। ওয়াশিংটনের নেভাল রিসার্চ ল্যাবোরেটারিতে কত যে গাণিতিক উপাত্তের সমাধান করেছেন তার হিসেব দেওয়া শক্ত। শেষ পর্যন্ত সাফল্য। সত্যিই উদ্ভাবিত হল অসামান্য গাণিতিক মডেল। যার সাহায্যে যে কোন রাসায়নিক অণুর ত্রিমাত্রিক গঠন নির্ণয় এখন সম্ভব হয়েছে। যে কোন রাসায়নিকের কাছে এই মডেল এখন অপরিহার্য হিসেবে স্বীকৃত। বলা বাহুল্য, বিশ্লেষণী রসায়নে তাঁদের মডেলের বহুমুখী ভূমিকার কথা ভেবেই নোবেল কমিটি এই দুই বিজ্ঞানীকে ১৯৮৫ সালের নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করলেন। এবং মজার ব্যাপার এই, হাউপ্টম্যান এবং কার্লে মুখ্যত পদার্থবিজ্ঞানী হয়েও পুরস্কার পেলেন রসায়ন বিভাগের। কারণ নোবেল বিজ্ঞানীদের মতে "তাঁরা যা আবিষ্কার করেছেন, তার ভূমিকা রসায়নশাস্ত্রেই সুদূরপ্রসারী।"

নোবেল কমিটির মন্তব্য ঃ "হাউপ্টম্যান এবং কার্লের পদ্ধতিটি সরল এবং সরাসরি প্রয়োগ করার মত।" এই পদ্ধতির সাহায্যে ৪৫০০০-এরও বেশি ক্ষুদ্রাকার রাসায়নিক অণু বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে এগুলির মধ্যে রয়েছে প্রচুর অতিপ্রয়োজনীয় হর্মোন এবং ভিটামিন। অতি সম্প্রতি তাঁদের পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে নতুন অ্যাণ্টিবাইওটিক এবং ভ্যাকসিন প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। "রসায়নের কোন্ শাখায় তাঁদের পদ্ধতি যে খাটে না, সেটাই এখন বলা শক্ত।" বলেছেন নোবেল কমিটির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক ইংগভার লিনডকিউভিস্ট কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া আণবিক স্তরে কিভাবে সম্পন্ন হয়, বিভিন্ন অবস্থায় আণবিক পরিবর্তনই বা কেমন দাঁড়াতে পারে সে ব্যাপারেও বিশদ ধারণা যোগাবে তাঁদের গবেষণা। টেলিভিশন

পর্দার প্রলেপের আণবিক গঠনে রকমফের ঘটিয়ে বিচিত্র বর্ণের ছবি তৈরিতেও তাঁদের আবিষ্কার সাহায্য করবে।

হাউপ্‌ট্‌মান এবং কার্লের মুখ্য গবেষণার সূত্র এক্স-রে ক্রিস্ট্যালোগ্রাফি। বিজ্ঞানের এই অভিনব শাখাটির প্রবর্তন ঘটে ১৯১১ সালে, উইলিয়াম ব্রাগ এবং তাঁর পুত্র লরেন্সের হাতে। পরবর্তিকালে এই পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে ধাতু এবং অধাতুর পারমাণবিক বিন্যাস এবং গঠনের ব্যাপারে বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। এই পদ্ধতিতে কেলাসের উপর নিক্ষেপ করা হয় এক্স-রশ্মি। এক্স রশ্মি যখন কেলাসের মধ্যে দিয়ে সঞ্চারিত হয়, কেলাসের বিভিন্ন পরমাণু থেকে ঘটে তার বিচ্ছুরণ। সেই বিচ্ছুরিত রশ্মির সাহায্যে ছবি তুলে কেলাসের মধ্যে সজ্জিত পরমাণুর বিন্যাস কি রকম তা জানা হয়। এ ধরনের ছবিতে কোথাও থাকে স্পষ্টতা, কোথাও অস্পষ্টতা। এ ধরনের অস্পষ্ট ছবি বিশ্লেষণ করে কেলাসের যথাযথ আকৃতি নির্ণয় খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। হাউপট্‌মান এবং কার্লে বিশেষ ধরনের পরিসংখ্যান পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে এই অসুবিধেটি দূর করতে সমর্থ হয়েছেন। এর জন্যে তাঁরা কাজে লাগিয়েছেন দ্রুত কর্মক্ষম কম্পিউটার। "আগে ক্ষুদ্রাকার কেলাসের গঠন নির্ণয় করতে সময় লাগত প্রচুর। কখনো বা কয়েক বছর। এখন এ কাজ দু' এক দিনের মধ্যেই করা সম্ভব হচ্ছে।" বলেছেন কার্লের পত্নী ইসাবেলা, যিনি নিজে একজন রাসায়নিক এবং এক্সরে ক্রিস্ট্যালোগ্রাফির বিশেষজ্ঞ। উল্লেখ্য হাউপ্‌ট্‌মান এবং কার্লের পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে সহজে এবং কম সময়ে বহু ভ্যাকসিন এবং হরমোনের পারমাণবিক গঠন জানার ব্যাপারটা সহজ হওয়ায় ওই সব বস্তুর রাসায়নিক নির্ণয়ের কাজটিও সহজ হয়েছে এখন।

হাউপট্‌মান এবং কার্লের পারস্পরিক পরিচয়ের সূচনা নিউ ইয়র্কের সিটি কলেজে। তাঁদের সঙ্গে একই শ্রেণীতে পড়তেন ১৯৫৯ সালের চিকিৎসাবিজ্ঞানের নোবেলবিজ্ঞানী আর্থার কর্নবার্গ। ১৯৩৭ সালে ওই কলেজ থেকে স্নাতক হন তাঁরা। পরে একই সঙ্গে দীর্ঘকাল তাঁরা কাজ করেছেন ওয়াশিংটনে নেভাল রিসার্চ ল্যাবোরেটরিতে। হাউপট্‌মানের স্ত্রী স্কুল শিক্ষিকা। তাঁদের দুটি কন্যা। কার্লের তিন কন্যা। তিনজনই বিজ্ঞানী। হাউপট্‌মানের বয়েস ৬৮, কার্লের ৬৭।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে

নোবেল পুরস্কার ঘোষণার প্রাক্কালে নোবেল কমিটি মন্তব্য করেছেন, "মাইকেল এস. ব্রাউন এবং জোসেফ এল. গোল্ডস্টাইনের আবিষ্কার শরীরে কোলেস্টারলের বিপাক এবং রক্তে অতিরিক্ত কোলেস্টারল জমার দরুন যে সব হৃদরোগ হয় সে ব্যাপারে যুগান্তকারী জ্ঞান ভাণ্ডার খুলে দিয়েছে।" উল্লেখ্য, হৃদ এবং রক্ত সংবহনজনিত রোগ সৃষ্টির কারণগুলির মধ্যে অন্যতম রক্তে সম্পৃক্ত স্নেহজাতীয় পদার্থ এবং কোলেস্টারল। বংশগত কারণেও কারোর কারোর শরীরে কোলেস্টারলের বিপাক ব্যাহত হয়েও দেখা দেয় হৃদরোগ এবং রক্ত-সংবহনজনিত রোগ—রক্তচাপ, ইত্যাদি।

অধ্যাপক ব্রাউনের বয়েস এখন ৪৪, অধ্যাপক গোল্ডস্টাইনের ৪৫। দুজনই চিকিৎসাবিজ্ঞানী। তাঁদের গবেষণার মুখ্য বিষয় "মলেকিউলার জেনেটিকস"। ১৯৬৬ সালে পরস্পরের সঙ্গে তাঁদের প্রথম পরিচয়। দীর্ঘ বারো বছর তাঁরা এক সঙ্গে গবেষণা করেছেন ডালাসে টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স সেণ্টারে। তাঁরা লক্ষ্য করেন, শরীরে কোলেস্টারল যোগায় খাদ্য। কারণ বিভিন্ন খাদ্যে থাকে কোলেস্টারল।

আবার জীবরাসায়নিক পদ্ধতিতে শরীরেও উৎপাদিত হয় এই বস্তু। শারীর বৃত্তিয় কাজকর্মে কোলেস্টারলের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। কোলেস্টারল কোষ-প্রাচীর তৈরিতে এবং স্টেরয়েড হরমোন এবং বাইল অ্যাসিড সংশ্লেষণে সাহায্য করে। রক্তে এক ধরনের কণার সাহায্যে সংবাহিত হয় কোলেস্টারল—যাদের বলা হয় "লো ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিনস" বা সংক্ষেপে LDL। দেখা গেছে যকৃৎ-এর কোষে শোষিত হয় LDL। সেখানে বিমুক্ত হয়ে শরীরের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয় কোলেস্টারল। এর ফলে রক্তে অথবা ধমনীতে অতিরিক্ত কোসেস্টারল জমা হতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হল, শরীরে কতটা কোলেস্টারল জমবে অথবা নিক্ষিপ্ত হবে সেটাই বা নির্ধারিত হবে কিভাবে?

ব্রাউন এবং গোল্ডস্টাইন এই প্রশ্নেরই সমাধান খুঁজতে শুরু করলেন তাঁদের যুগান্তকারী গবেষণায়। গবেষণার বিষয় হিসেবে বেছে নিলেন এক ধরনের পারিবারিক রোগ—"হাইপারকোলেস্টারোলেমিয়া।"

মারাত্মক এই রোগ কোন কোন পরিবারে দেখা দেয় বংশগত হিসেবে। অনেক সময় পরিবারের শিশুদের মধ্যেও দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে তাদের রক্তে কোলেস্টারলের মাত্রা বাড়ে স্বাভাবিকের চেয়ে ছয় থেকে দশগুণ। ফলে মাত্র বছর দুই বয়েসেই অনেকে মারা যায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। এ ধরনের রোগীদের নিয়ে পরীক্ষা চালাতে গিয়ে ১৯৭৩ সালে তাঁরা আবিষ্কার করেন, দেহ-কোষের উপরিতলে নির্দিষ্ট কিছু কিছু অংশ থাকে, যাদের বলা হয় 'রিসেপটারস'। এই রিসেপটারগুলি রক্তের সেই সব কণাগুলি শোষণ করে যাদের মধ্যে থাকে কোলেস্টারল। ব্রাউন এবং গোল্ডস্টাইন হাইপারকোলেস্টারোলেমিয়া আক্রান্ত রোগী এবং সুস্থ মানুষের ত্বকের কোষ নিয়ে পরীক্ষা চালালেন। আর তা করতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন এই দুই শ্রেণীর মানুষের দেহ-কোষের ভূমিকা। তাঁরা দেখলেন LDL রিসেপটারের সংখ্যা কম না বেশি তার উপর নির্ভর করে কার শরীরে কোলেস্টারল জমবে কি জমবে না। উল্লেখ্য, কোলেস্টারল রক্তের মধ্যে দিয়ে পরিবাহিত হয় ফ্যাট এবং প্রোটিনের গুচ্ছের মাধ্যমে—যাদের বলা হয় লাইপোপ্রোটিন। LDL রিসেপটার তাদের ফাঁদের মত গ্রহণ করে। কোষের মধ্যে লাইপোপ্রোটিন ভেঙে যায়, এবং মুক্ত হয় কোলেস্টারল। রিসেপটার ফিরে আসে কোষপ্রাচীর বা কোষআবরণীর গায়ে আবার নতুন একগুচ্ছ লাইপোপ্রোটিন শিকারের জন্যে।

ব্রাউন এবং গোল্ডস্টাইন আবিষ্কার করেছেন, দেহকোষের কোলেস্টারল গ্রহণের একটি নির্দিষ্ট ক্ষমতা আছে। অতিরিক্ত কোলেস্টারল কোষ গ্রহণ করতে পারে না। যখন পারে না তখন রক্তে জমতে থাকে অতিরিক্ত কোলেস্টারল এবং ফ্যাট বা স্নেহজাতীয় বস্তু। অবশেষে এই সব বস্তু ধমনীর মধ্যে সঞ্চিত হয়ে রক্ত সংবহনে বাধা সৃষ্টি করে। যার পরিণতি 'স্ট্রোক' এবং "হার্ট অ্যাটাক"। তাঁরা আরো আবিষ্কার করেছেন, প্রজননগত ত্রুটিই কারোর কারোর শরীরে অতিরিক্ত কোলেস্টারল জমার কারণ। তাঁরা দেখেছেন এ সব ক্ষেত্রে তাঁদের কোষে কখনো আদৌ LDL রিসেপটার থাকে না। থাকলেও কম থাকে।

"এই আবিষ্কারের ফলে চিকিৎসার পথ এখন সুগম হয়েছে অনেক। যদি দেখা যায়, প্রজননগত কারণে পরিবারের কেউ অতিরিক্ত কোলেস্টারলজনিত রোগে ভুগছে, সে ক্ষেত্রে এখন থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা যুগিয়ে তাকে আমরা হৃদরোগ থেকে রক্ষা করতে পারব।" বলেছেন সানফ্রান্সিসকোর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিনের অধ্যাপক ডঃ রবার্ট মাহলে।

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর এক সাক্ষাৎকারে ব্রাউন এবং গোল্ডস্টাইন বলেছেন, 'যারা অতিরিক্ত মাংস, ডিম, পনির, মাখন খান তাঁদের কোষপ্রাচীরে LDL রিসেপটারের সংখ্যা কমে। এর ফলে রক্তে বাড়ে কোলেস্টারল যা শেষপর্যন্ত গিয়ে জমে ধমনীর প্রাচীরে, সৃষ্টি করে হৃদরোগ। আমাদের গবেষণা ভবিষ্যতে হয়ত এমন ধরনের ওষুধ তৈরি করতে সাহায্য করবে যা কোষপ্রাচীরে উপযুক্ত সংখ্যক LDL রিসেপটার তৈরি করতে সাহায্য করবে; ব্যায়াম, স্বল্প কোলেস্টারল এবং স্বল্প-ফ্যাট বিশিষ্ট আহার নির্বাচনেও, যাতে করে রক্তে কোলেস্টারল জমার হাত থেকে রেহাই পাবেন অনেকে।"

গোল্ডস্টাইনের জন্ম দক্ষিণ ক্যারোলাইনার সুমটার-এ ১৯৪০ সালে। ওয়াশিংটন এবং ভার্জিনিয়ার লেকসিনটনস্থিত লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাভ করেন ব্যাচেলার ডিগ্রি। ১৯৬৬ সালে টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেডিসিন-এ পি এইচ ডি লাভ। ব্রাউনের জন্মস্থল নিউ ইয়র্ক সিটি, ১৯৪১ সালে। পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাচেলার অভ আর্টস। এর পর পড়াশুনা ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অভ মেডিসিন-এ। সেখান থেকেই তিনি পান চিকিৎসা বিজ্ঞানে ডিগ্রি। পরে তাঁকে "ফ্রেডরিক প্যাকার্ড প্রাইজ ইন ইনটারন্যাল মেডিসিন" দিয়ে সম্মানিত করা হয়। উভয়ের মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব। এবং গাঢ় বন্ধুত্ব "গত বারো বছর এমন একটি দিন যায়নি যে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। আমরা চাই এইভাবেই জীবন কাটুক।" ব্রাউনের মন্তব্য।

নোবেল পুরস্কার প্রদানের ব্যাপারে বিতর্ক কিন্তু থেকেই যায়। পুরস্কার ঘোষণার আগে থাকে পুরস্কার প্রাপকের যথাযথ মূল্যায়ন এবং নির্বাচনের সমস্যা। পুরস্কার ঘোষণার পর প্রশ্ন ওঠে, যিনি যে বিষয়ে সত্যিকারের পারঙ্গম নোবেল পুরস্কার দেওয়ার সময় বিষয়টির উপর কতটা গুরুত্ব আরোপ করেন নোবেল পুরস্কারের বিচারকমণ্ডলী? কেউ কেউ এমন প্রশ্নও তোলেন, না, বিচারটা যেন ঠিক হল না। অমুকের ভূমিকা তো মুখ্যত পদার্থ বিজ্ঞানীর, অথচ তাকে রসায়ন বিভাগের পুরস্কার দেওয়া হল কেন? যাঁর অবদান পদার্থ-বিজ্ঞানেই বেশি, তিনি রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেলেন কেন? পদার্থ বিজ্ঞানী হিসেবে বিশ্বপরিচিতি পাওয়া সত্ত্বেও যাঁদের রসায়ন বিভাগের নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ঃ

আর্নেস্ট রাদারফোর্ড, মেরী কুরী, ওয়ালদের নার্নস্ট, ফ্রেডারিক সডি, ফ্রান্সিস উইলিয়াম অ্যাস্টন, আরভিং ল্যাংমুইর, হ্যারল্ড সি. উরে, ফ্রেডারিক জোলিও এবং আইরিন জোলিও কুরী, পিটার জে. ডব্লু. দুবাই, জর্জ ফন্ হেভসি, অটো হান, উইলিয়াম ফ্রান্সিস গিয়াক, গ্লেন টি. সিবোর্গ এবং এডুইন এম. ম্যাকমিলান, রবার্ট এম. মুলিকেন, লারস্ ওনসাগের এবং জর্জ হের্জবার্গ।

আরও একটি প্রশ্ন ঃ নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয় নি, অথচ তাঁদের অবদান বিজ্ঞানে সর্বকালের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হবে, এমন কয়েকজন বিজ্ঞানীর নাম করুন? সম্প্রতি এই প্রশ্নটি তুলে ধরেছিলেন কয়েকজন নোবেল বিজ্ঞানীর কাছে 'পাইওনিয়ারস অভ্ সায়ান্স ঃ নোবেল প্রাইজ উইনার্স ইন ফিজিক্স' গ্রন্থের লেখক এবং পেনসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক রবার্ট এল ওয়েবার। সেই সব নোবেল বিজ্ঞানীর উত্তর এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে এ প্রসঙ্গে যাঁদের নাম সংগৃহীত হয়েছে তাঁরা হলেন ঃ

দিমিত্রি আই. মেনডেলিফ, আরনলড জোহানস ভিলহেলম্ সোমারফিল্ড, পল ল'জেভিন, হেনরি জি. জেফ্রেস মোসলে, সামুয়েল আব্রাহাম গাউদস্মিট, আরউইন ডব্লু. মুয়েলার, জন আর হুইলার, মেঘনাদ সাহা এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ঃ ১৯০১-১৯৮২

পদার্থ বিজ্ঞান

সাল	নাম	বিষয়
১৯০১	ভিলহেলম কনরাড রনট্গেন (জার্মান)	একস্ রশ্মি আবিষ্কার
১৯০২	পিটার জিমান (ডাচ্)	
	হেন্ডরিক আনতুম লোরেঞ্জ (ডাচ)	বিকিরণের উপর চৌম্বকের প্রভাব

সাল	নাম	বিষয়
১৯০৩	আঁতোন হেনরি বেকুয়েরেল (ফ্রান্স)	স্বতঃস্ফূর্ত তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কার
	পিয়েরে কুরি (ফ্রান্স)	তেজষ্ক্রিয়তার উপর গবেষণা
	মেরী স্কডোয়াস্কা কুরী (জন্ম পোলাণ্ড ফ্রান্সের নাগরিক)	রেডিয়াম এবং পোলোনিয়াম আবিষ্কার
১৯০৪	জন উইলিয়াম স্ট্রুট (বৃটিশ)	গ্যাসের ঘনত্ব এবং আর্গন আবিষ্কার
১৯০৫	ফিলিপ লেনার্দ (জন্ম হাঙ্গেরী, জার্মান)	ক্যাথোড রশ্মির উপর গবেষণা
১৯০৬	স্যার জোসেফ জন টমসন (ব্রিটেন)	গ্যাসের বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা
১৯০৭	অ্যালবার্ট আব্রাহাম মাইকেলসন (জন্ম জার্মানি, মার্কিন নাগরিক)	আবহাওয়া বিজ্ঞান এবং বর্ণালীবীক্ষণ বিষয়ক যন্ত্র
১৯০৮	গাব্রিয়েল লিপ্‌মান (জন্ম লুক্সেমবার্গ, ফরাসী)	ইনটারফারেন্সের সাহায্যে রঙীন ফোটোগ্রাফি
১৯০৯	গুগেলিয়েলমো মার্কনি (ইটালি)	বেতার টেলিগ্রাফি আবিষ্কার
	কার্ল ফার্দিনান্দ ব্রাউন (জার্মান)	
১৯১০	জোহান্‌স ডিডেরিক ভ্যান ডার ওয়াল্‌স (ডাচ্‌)	গ্যাস এবং তরলের দশার সমীকরণ
১৯১১	ভিলহেলম কার্ল ভার্নার অটো ফ্রানজ ভিয়েন (জার্মান)	তাপের বিকিরণ তত্ত্ব
১৯১২	নিলস গুস্তাফ ডালে (সুইডেন)	লাইট হাউজ এবং বয়ার স্বনিয়ন্ত্রক আলোক ব্যবস্থা
১৯১৩	হাইক কামেরলিং ওন্‌নেস (ডাচ)	নিম্ন তাপ পদার্থবিদ্যা, তরল হিলিয়াম প্রস্তুতকরণ
১৯১৪	ম্যাক্‌স থিওডর ফেলিক্‌স ফন্‌ লাউ (জার্মান)	কেলাসের দ্বারা একস্‌ রশ্মির ডিফ্রাকশন
১৯১৫	স্যার উলিয়াম হেনরী ব্রাগ (ব্রিটেন)	একস-রশ্মির দ্বারা কেলাসের গঠন বিশ্লেষণ
	স্যার উইলিয়াম লরেন্স ব্রাগ (ব্রিটেন)	
১৯১৬	পুরস্কার দেওয়া হয় নি	
১৯১৭	চার্লস গ্লোভার বার্কলা (ব্রিটেন)	মৌল পদার্থের একস-রশ্মি চরিত্র
১৯১৮	ম্যাক্‌স কার্ল অর্নাস্ট লুডভিগ প্লাঙ্ক (জার্মান)	শক্তির কোয়ান্টা আবিষ্কার
১৯১৯	জোহানস স্টার্ক (জার্মান)	'ক্যানাল' রশ্মির 'ডপলার ইফেক্ট' এবং বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মধ্যে বর্ণালী রেখার বিভক্তিকরণ আবিষ্কার
১৯২০	চার্লস-এডোয়ার্ড গুইলাউম (ফ্রান্স)	নিকেল-ইস্পাত সংকর ধাতুর সমস্যাবলী

সাল	নাম	বিষয়
১৯২১	অ্যালবার্ট আইনস্টাইন (জার্মান)	গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানে অবদান 'ফোটো ইলেকট্রিক এফেক্ট'-এর সূত্রের আবিষ্কার
১৯২২	নীলস হেনড্রিক ডেভিড বোর (ডেনমার্ক)	পারমাণবিক গঠন এবং বিকিরণ
১৯২৩	রবার্ট অ্যান্ড্রুজ মিলিকান (মার্কিন)	ইলেকট্রনের আধানের মান নির্ণয় এবং 'ফোটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট'।
১৯২৪	কার্ল মালে জর্জ সিগবন (সুইডেন)	এক্স্-রশ্মি বর্ণালীবীক্ষণ
১৯২৫	জেমস্ ফ্রাঙ্ক (জার্মান) গুস্তফ্ লুডভিগ হের্টজ (জার্মান)	পরমাণু এবং ইলেকট্রনের পারস্পরিক সংঘাতজনিত সূত্র
১৯২৬	জিন বাপটিস্টে পেরিন (ফ্রান্স)	ব্রাউনীয় গতি এবং অধঃক্ষেপণের স্থিতিস্থাপকতা
১৯২৭	আর্থার হোলি কম্পটন (মার্কিন)	'কম্টন এফেকট' ; মুক্ত ইলেকট্রনের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ায় ফোটনের শক্তি হ্রাস
	চার্লস টমসন রীজ উইলসন (ব্রিটেন)	বাষ্পীয় রেখা বা 'ভেপার ট্রেইল' এর সাহায্যে আহিত কণার গতিপথ নির্ণয়
১৯২৮	স্যার ওয়েন উইলানস রিচার্ডসন (ব্রিটেন)	তাপ-আয়ন ঘটনাবলী. রিচার্ডসনের সূত্র
১৯২৯	লুই-ভিকতর পিয়েরে রেমণ্ড, প্রিন্স দ্য ব্রগলি (ফ্রান্স)	ইলেকট্রনের তরঙ্গ চরিত্র
১৯৩০	স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন (ভারত)	আলোর বিচ্ছুরণ ; 'রামন এফেক্ট'
১৯৩১	পুরস্কার দেওয়া হয় নি।	
১৯৩২	ভার্নার কার্ল হাইজেনবার্গ (জার্মান)	'কোয়াণ্টাম মেকানিকস' বা অখণ্ড বলবিদ্যার আবিষ্কার ; হাইড্রোজেনের বহুরূপিতা আবিষ্কার
১৯৩৩	পল আঁদ্রে মরিস ডিরাক (ব্রিটেন) আরউইন শ্রোডিঙ্গার (অস্ট্রিয়া)	নবপর্যায়ে পারমাণবিক তত্ত্ব আবিষ্কার
১৯৩৪	পুরস্কার দেওয়া হয় নি	
১৯৩৫	স্যার জেমস্ চ্যাডউইক (ব্রিটেন)	নিউট্রন আবিষ্কার
১৯৩৬	ভিকতর ফ্রানজ হেস (অস্ট্রিয়া) কার্ল ডেভিড অ্যানডারসন (মার্কিন)	মহাজাগতিক রশ্মি আবিষ্কার, পজিট্রন আবিষ্কার
১৯৩৭	ক্লিনটন জোসেপ ডেভিসন (মার্কিন) স্যার জর্জ প্যাগেট টমসন (ব্রিটেন)	কেলাসের সাহায্যে এক্স্-রশ্মির ডিফ্র্যাকশন।

সাল	নাম	বিষয়
১৯৩৮	এনরিকো ফের্মি (মার্কিন, ইটালীতে জন্ম)	নিউট্রনের সাহায্যে নতুন তেজস্ক্রিয় মৌল সৃষ্টি ; ধীর-গতি নিউট্রনের সাহায্যে পারমাণবিক বিক্রিয়া।
১৯৩৯	আর্নেস্ট অর্লান্ডো লরেন্স (মার্কিন)	সাইক্লোট্রন তৈরি ; কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় মৌলের উপর গবেষণা।
১৯৪০-৪২	পুরস্কার দেওয়া হয় নি।	
১৯৪৩	অটো স্টার্ন (মার্কিন, জার্মান জাত)	আণবিক রশ্মি পদ্ধতি ; প্রোটনের ম্যাগনেটিক মোমেন্ট।
১৯৪৪	আইসিডর আইজাক রাবি (মার্কিন, অস্ট্রিয়াজাত)	অনুনাদ পদ্ধতিতে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চৌম্বক ধর্ম নির্ধারণ
১৯৪৫	ভলফগ্যাং পাউলি (মার্কিন, অস্ট্রিয়াজাত)	পাউলির 'এক্সক্লুশন প্রিন্সিপল'-এর সূত্র।
১৯৪৬	পার্সি উইলিয়ামস ব্রিজম্যান (মার্কিন)	হাই-প্রেসার ফিজিক্স-এর যন্ত্র।
১৯৪৭	স্যার এডোয়ার্ড ভিক্টর অ্যাপলটন (ব্রিটেন)	ঊর্ধ্বাকাশের বায়ুস্তরে ভৌতিক ধর্ম ; অ্যাপলটন স্তর আবিষ্কার।
১৯৪৮	ব্যারন প্যাট্রিক মেনার্ড স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকেট (ব্রিটেন)	উইলসন ক্লাউড চেম্বারের সংস্কার এবং তার সাহায্যে পরমাণু এবং মহাজাগতিক রশ্মি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণা।
১৯৪৯	হিদেকি ইউকাওয়া (জাপান)	তত্ত্বের সাহায্যে 'মেসন' কণার অস্তিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী।
১৯৫০	সেসিল ফ্রাঙ্ক পাওয়েল (ব্রিটেন)	ফোটোগ্রাফির সাহায্যে পারমাণবিক পদ্ধতি নির্ণয় ; 'মেসন' সম্পর্কিত আবিষ্কার।
১৯৫১	স্যার জন ডগলাস কক্‌ক্রফট্ (ব্রিটেন); আর্নেস্ট টমাস সিনটন ওয়ালটন (আয়ারল্যান্ড)	কৃত্রিম উপায়ে ত্বরিত পারমাণবিক কণার সাহায্যে নতুন প্রজন্মের পারমাণবিক নিউক্লিয়াস তৈরী।
১৯৫২	ফেলিক্স ব্লক (মার্কিন, সুইস)	পারমাণবিক চৌম্বক পরিমাপের পদ্ধতি আবিষ্কার এবং তৎসম্পর্কিত গবেষণা।
১৯৫৩	ফ্রিটস জের্নিক (ডাচ্) ;	'ফেজ্-কনট্রাস্ট' অনুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী।
১৯৫৪	ম্যাক্স বর্ন (ব্রিটেন, জার্মান জাত)	কোয়ান্টাম মেকানিক্সে তরঙ্গজনিত ঘটনার পরিসংখ্যানীয় ব্যাখ্যা।
	ওয়ালটার ভিলহেলম্ জর্জ বোদে (জার্মান)	কয়েনসিডেন্স মেথড অভ্ কাউন্টিং; পারমাণবিক এবং মহাজাগতিক রশ্মি বিষয়ক গবেষণা'।

সাল	নাম	বিষয়
১৯৫৫	উইলিস ইউজিন ল্যাম্ব জুনিয়ার (মার্কিন)	হাইড্রোজেন বর্ণালীতে ল্যাম্বের সরণ।
	পলিকার্প কুশ (মার্কিন, জার্মানজাত)	ইলেকট্রনের 'ম্যাগনেটিক মোমেণ্ট' নির্ণয়
১৯৫৬	জন বার্ডিন (মার্কিন) ; ওয়ালটার হাউসার ব্র্যাটেইন (মার্কিন) ; উইলিয়াম শকলে (মার্কিন)	সেমি কনডাকটার বিষয়ক গবেষণা ; ট্রানজিস্টার এফেকট আবিষ্কার।
১৯৫৭	চেন নিং ইয়াঙ (মার্কিন, চীনে জন্ম) সাং দাওলী (মার্কিন চীনে জন্ম)	দুর্বল-পারমাণবিক বিক্রিয়ায়' পারিটি সূত্রের লঙ্ঘনের কারণ আবিষ্কার।
১৯৫৮	লাভেল আলেকসিভিচ্ চেয়েনকভ (সোভিয়েত) ; ইলিয়া মিখাইলো ভিচ ফ্রাঙ্ক (সোভিয়েত) ; আইগর ইভসেনিভিচ টাম (সোভিয়েত)	'চেরেনকভ ইফেকট' এর আবিষ্কার এবং ব্যাখ্যা।
১৯৫৯	ওয়েন চেম্বারলিন (মার্কিন) ; এমিলিও গিনো সেগার (মার্কিন, ইটালি জাত) ;	অ্যাণ্টি-প্রোটন আবিষ্কার
১৯৬০	ডোনাল্ড আর্থার গ্লেসার (মার্কিন)	বাবল্ চেম্বার বিষয়ক আবিষ্কার।
১৯৬১	রবার্ট হফস্টাডাটার (মার্কিন) ;	ইলেকট্রন স্ক্যাটারিং-এর সাহায্যে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের গঠন আবিষ্কার।
১৯৬২	লেভ ডেভিডোভিচ্ ল্যানডাউ (সোভিয়েত)	ঘনীভূত বস্তু সম্পর্কিত তত্ত্ব, বিশেষ করে তরল হিলিয়ামের।
১৯৬৩	ইউজিন পল ভিগনার (মার্কিন, হাঙ্গেরী জাত) ;	'সিমেট্রি প্রিন্সিপল-এর আবিষ্কার এবং প্রয়োগ করে পরমাণুর নিউক্লিয়াস এবং পারমাণবিক কণা বিষয়ক তত্ত্ব দাঁড় করান।
	মারিয়া জিওপার্ট-মায়ার (মার্কিন, জার্মানি জাত) ; জে হানস ডি জেনসেন (জার্মান)	'নিউক্লিয়ার শেল মডেল' এর সংস্কার সাধন
১৯৬৪	চার্লস হার্ড টাউনস (মার্কিন); নিকোলাই গেনাদাইভিচ্ বাসোভ, (সোভিয়েত)	কোয়াণ্টাম ইলেকট্রোনিকসের সাহায্যে 'মেজার'/লেজার নীতির উপর নির্ভর করে 'অস্‌সিলেটারস্ এবং অ্যামপ্লিফায়ারস তৈরীতে সাহায্য।
১৯৬৫	রিচার্ড ফিলিপ্স ফাইনম্যান (মার্কিন) জুলিয়ান সেইমার শুইংগার (মার্কিন) সিন-ইতিরো তোমোনাগা (জাপান)	কোয়াণ্টাম ইলেকট্রোডায়ানমিক্স-এর উপর গবেষণার সাহায্যে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন পারমাণবিক কণার চরিত্র বিশ্লেষণ

সাল	নাম	বিষয়
১৯৬৬	অ্যালফ্রেড কাস্টলার (ফ্রান্স)	আলোক বিজ্ঞানের সাহায্যে পরমাণুর মধ্যে হার্টজীয় অনুনাদ বিষয়ক গবেষণা।
১৯৬৭	হান্স অ্যালেব্রখ্‌ট বেদে (মাকিন, জার্মান জাত)	পারমাণবিক বিক্রিয়ার তত্ত্ব, নক্ষত্রে শক্তির উৎপাদন রহস্য
১৯৬৮	লুই ওয়ালটার অ্যালভারেজ (মাকিন)	বাবল্‌ চেম্বারের সংস্কার এবং ওই সম্পর্কিত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা।

রসায়ন

১৯০১	জ্যাকোবাস এইচ ফন্ট হফ (ডাচ)	কেমিক্যাল ডায়ানামিকস এবং দ্রবণে অসমোটিক চাপের সূত্র আবিষ্কার
১৯০২	এমিল ফিশার (জার্মান)	সুগার এবং পিউরিন সংশ্লেষণ।
১৯০৩	স্বাতে এ. আরহেনিয়াস (সুইডিস)	তড়িৎ বিশ্লেষণের আবিষ্কার।
১৯০৪	স্যার উইলিয়াম র‍্যামজে (ব্রিটিশ)	বাতাসে নিষ্ক্রিয় গ্যাস আবিষ্কার এবং পিরিওডিক টেবল্‌-এ তাদের স্থান নির্ণয়
১৯০৫	জোহান ফন্‌ বায়ার (জার্মান)	জৈব রঞ্জক এবং হাইড্রোঅ্যারোমেটিক যোগ এর উপর গবেষণা
১৯০৬	হেনরী ময়সাঁ (ফরাসী)	ফ্লুওরিন প্রস্তুত এবং তার চরিত্র বিশ্লেষণ, ময়সাঁর বৈদ্যুতিক চুল্লি তৈরি
১৯০৭	এডুয়ার্ড বুকনার (জার্মান)	জীব-রাসায়নিক গবেষণা এবং 'সেল ফ্রি ফারমেনটেশন' পদ্ধতির আবিষ্কার।
১৯০৮	আর্নেস্ট রাদারফোর্ড (বৃটিশ)	মৌলিক পদার্থের অণুর চূর্ণকরণ এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থের রাসায়নিক গুণাগুণের উপর গবেষণা।
১৯০৯	উিলহেলম ওস্টওয়াল্ড (জার্মান)	অনুঘটক সম্পর্কিত গবেষণা. রাসায়নিক স্থিতিস্থাপকতা ও বিক্রিয়ার হার সম্পর্কিত সূত্র আবিষ্কার।
১৯১০	ওটো ওয়ালচ্‌ (জার্মান)	অ্যালিসাইক্লিক যোগের উপর গবেষণা।
১৯১১	মেরী কুরী (ফরাসী, পোল্যান্ডে জন্ম)	রেডিয়াম এবং পোলোনিয়াম আবিষ্কার এবং তাদের বিভিন্ন যোগের উপর গবেষণা।
১৯১২	ভিকতর গ্রিগনার্ড (ফরাসী)	গ্রিগনার্ড রিএজেন্ট আবিষ্কার
	পল সাবাটিয়ে (ফরাসী)	সূক্ষ্ম ধাতুকণার সান্নিধ্যে জৈব যোগের সঙ্গে হাইড্রোজেনের বিক্রিয়া ঘটান।

সাল	নাম	বিষয়
১৯১৩	অ্যালফ্রেড ভারনার (সুইস, জার্মানিতে জন্ম)	রাসায়নিক অণুর সঙ্গে পরমাণু সংযোগ
১৯১৪	থিওডোর উইলিয়াম রিচার্ডস (মার্কিন)	বহুসংখ্যক-মৌল পদার্থের পারমাণবিক ভর নির্ণয়।
১৯১৫	রিচার্ড এম. ভিলস্টাটের (জার্মান)	উদ্ভিদের রাসায়নিক কণা, বিশেষতঃ ক্লোরোফিল-এর উপর মৌলিক গবেষণা
১৯১৬	পুরস্কার দেওয়া হয়নি।	
১৯১৭	পুরস্কার দেওয়া হয় নি।	
১৯১৮	ফ্রিট্‌জ হেবার (জার্মান)	হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেনের মধ্যে সরাসরি মিলন ঘটিয়ে (সংশ্লেষণ) অ্যামোনিয়া তৈরি
১৯১৯	পুরস্কার দেওয়া হয় নি।	
১৯২০	ওয়ালদের এইচ. নার্নস্ট (জার্মান)	তাপ রসায়নের উপর গবেষণা
১৯২১	ফ্রেডেরিক সডি (ব্রিটিশ)	তেজস্ক্রিয় পদার্থের রাসায়নিক গুণাগুণ এবং আইসোটোপ বা সমস্থানিক পদার্থের উৎপত্তি এবং প্রকৃতি বিষয়ক গবেষণা
১৯২২	ফ্রান্সিস উইলিয়াম অ্যাসটন (ব্রিটিশ)	নিজের তৈরি 'মাস স্পেকট্রোগ্রাফে'র সাহায্যে একাধিক অ-তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আবিষ্কার
১৯২৩	ফ্রিটজ্ প্রেগল্ (অস্ট্রীয়)	জৈব-যৌগের 'মাইক্রো-অ্যানালিসিস' পদ্ধতি আবিষ্কার
১৯২৪	পুরস্কার দেওয়া হয় নি।	
১৯২৫	রিচার্ড এ. জিগমন্ডি (জার্মান, অস্ট্রীয়ায় জন্ম)	কলয়েড দ্রবণের অসমসত্ত্বিক ধর্ম পরীক্ষার দ্বারা প্রদর্শন
১৯২৬	থিওডোর স্ভেডবার্গ (সুইডিস)	'ডিসপারসন সিসটেম' এবং কলয়েড-রসায়ন
১৯২৭	হাইনরিখ ও. ভিল্যান্ড (জার্মান)	'বাইল অ্যাসিডস' বা পিত্তসংক্রান্ত অম্ল এবং সেই সংক্রান্ত বস্তুর উপর গবেষণা
১৯২৮	অ্যাডলফ্ ও. আর. ভিনডাউস (জার্মান)	স্টেরল-যৌগের উপর গবেষণা এবং ভিটামিনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নির্ধারণ
১৯২৯	আর্থার হার্ডেন (ব্রিটিশ) হানস ফন ওয়েলার চেলপিন সুইডিস, জার্মানে জন্ম)	সুগারের ফারমেনটেশন এবং ফারমেন্ট-কারী এনজাইম আবিষ্কার

সাল	নাম	বিষয়
১৯৩০	হানস ফিশার (জার্মান)	হেমিন এবং ক্লোরোফিলের গঠন বিষয়ক গবেষণা
১৯৩১	ফ্রায়েডরিখ বারগিয়াস (জার্মান)	'কেমিক্যাল হাইপ্রেসার' পদ্ধতির আবিষ্কার এবং সংস্কার
১৯৩২	আর্ভি ল্যাংমুইর (মার্কিন)	'সারফেস কেমিস্ট্রি' (বস্তুর বহির্তলের রাসায়নিক চরিত্রাবলী বিষয়ক বিজ্ঞান) আবিষ্কার এবং ওই সম্পর্কিত গবেষণা
১৯৩৩	পুরস্কার দেওয়া হয় নি।	
১৯৩৪	হ্যারল্ড সি উরে (মার্কিন)	ভারী হাইড্রোজেন আবিষ্কার
১৯৩৫	ফ্রেডেরিক জোলিও কুরী (ফরাসী) আইরিন জোলিও-কুরী (ফরাসী)	নতুন তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের সংশ্লেষণ
১৯৩৬	পিটার জে ডব্লু ডুবাই (ডাচ্)	ডাই-পোল মোমেন্টের গঠন সম্পর্কিত গবেষণা, একস্ রে ডিফ্র্যাকশন এবং ইলেকট্রন গ্যাস বিষয়ক তত্ত্ব
১৯৩৭	ওয়াল্টার এন হ্যাওয়ার্থ (ব্রিটিশ)	কার্বোহাইড্রেটস্ এবং ভিটামিন-সি-এর উপর গবেষণা
	পল কারের (সুইস, সোভিয়েত দেশে জন্ম)	ক্যারোটেনয়েডস, ভিটামিন-'এ' এবং 'বি'-এর উপর গবেষণা
১৯৩৮	রিচার্ড কুইন জার্মান)	ক্যারোটেনয়েডস এবং ভিটামিনস (পুরস্কার গ্রহণ করেন নি)
১৯৩৯	অ্যাডলফ এফ জে বুটেনানড্ট (জার্মান)	সেক্স হরমোন (রাজনৈতিক চাপে পুরস্কার গ্রহণ করেন নি)
	লিওপোল্ড রুজিকা (সুইস)	পলিমেথিলিনস এবং উচ্চতর আণবিক ভরের টার্পিনস বিষয়ক গবেষণা।
১৯৪০	পুরস্কার দেওয়া হয়নি	
১৯৪১	পুরস্কার দেওয়া হয়নি	
১৯৪২	পুরস্কার দেওয়া হয়নি	
১৯৪৩	জর্জ দ্য হেভসি (হাঙ্গেরীয়)	রসায়নে 'ট্রেসার' বা অনুসন্ধায়ক হিসেবে আইসোটোপের ব্যবহার পদ্ধতি
১৯৪৪	অটো হান (জার্মান)	ভারী নিউক্লিয়াসের বিভাজন আবিষ্কার
১৯৪৫	আরতুরি আই. ভিরতানু (ফরাসী)	কৃষি এবং পুষ্টি বিজ্ঞানে গবেষণা এবং আবিষ্কার
১৯৪৬	জেমস্ বি. সামলার (মার্কিন)	এনজাইম যে কেলাস পরিণত করা যায় তা আবিষ্কার
	জন এইচ নর্থরোপ (মার্কিন) ভেনডেল এম. স্ট্যানলি (মার্কিন)	এনজাইম এবং বিশুদ্ধ ভাইরাস প্রোটিন তৈরি

সাল	নাম	বিষয়
১৯৪৭	স্যার রবার্ট রবিনসন (ব্রিটিশ)	জৈবিক ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ রাসায়নিক যোগের উপর গবেষণা।
১৯৪৮	আর্নে ডব্লু. কে. টিসেলিয়াস (সুইডেনে জন্ম)	'ইলেকট্রোফোরেসিস' এবং 'অ্যাডজরপশন' বিষয়ক বিশ্লেষণ
১৯৪৯	উইলিয়াম এফ. গিয়াক (মার্কিন)	রাসায়নিক বলবিদ্যা বা 'কেমিক্যাল থারমোডায়ানামিকস্', বিশেষ করে নিম্ন তাপমাত্রায় পদার্থের আচরণ
১৯৫০	কুর্ট অলডের (জার্মান) অটো পি. এইচ. ডিয়েলস (জার্মান)	'ডায়েন' সংশ্লেষণ পদ্ধতি আবিষ্কার এবং তার উন্নয়ন।
১৯৫১	এডুইন এম. ম্যাকমিলান (মার্কিন) গ্লেন টি, শিবোর্গ (মার্কিন)	'ইউরেনিয়াম'-উত্তর বা ট্রান্সইউরেনিয়াম' মৌলের রাসায়নিক ধর্মাবলীর উপর গবেষণা
১৯৫২	আর্চার জে. পি মার্টিন (ব্রিটিশ) রিচার্ড এল, এম, সাইঙ্গ (ব্রিটিশ)	'পার্টিশন ক্রোমেটোগ্রাফি' আবিষ্কার এবং মিশ্রণের বিশ্লেষণ বিষয়ক পদ্ধতির উদ্ভাবনা
১৯৫৩	হারমান স্টাউডিঙ্গার (জার্মান)	অতিকায় অণু বা ম্যাক্রোমলেকিউলার রসায়ন বিষয়ক আবিষ্কার
১৯৫৪	লাইনুস সি. পাউলিং (মার্কিন)	'কেমিকেল বন্ড' বিষয়ক গবেষণা এবং তার প্রয়োগ
১৯৫৫	ভিনসেন্ট দ্যু ভিগনিউড (মার্কিন)	জীবরসায়নের গুরুত্বপূর্ণ সালফার ঘটিত যোগের উপর গবেষণা, পলিপেপটাইড হরমোনের প্রথম সংশ্লেষণ
১৯৫৬	স্যার সিরিল এন. হিনশেলউড (ব্রিটিশ) নিকোলাই এন. সেমেনভ্ (সোভিয়েত)	রাসায়নিক বিক্রিয়ার পদ্ধতি আবিষ্কার।
১৯৫৭	লর্ড টড্ (আলেকজান্ডার আর. টড) (ব্রিটিশ)	নিউক্লিওটাইডস্ এবং নিউক্লিওটাইড, কোএনজাইমের উপর গবেষণা
১৯৫৮	ফ্রেডেরিক স্যাঙ্গার (ব্রিটিশ)	প্রোটিনের অণুর গঠন, বিশেষ করে ইনস্যুলিন এর উপর গবেষণা
১৯৫৯	জারোস্লাভ হাইরভস্কি (চেক্)	'পোলারোগ্রাফিক' পদ্ধতিতে রাসায়নিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি আবিষ্কার এবং সেই পদ্ধতির উন্নয়ন

সাল	নাম	বিষয়
১৯৬০	উইলিয়াম. এফ, লিবি (মার্কিন)	তেজস্ক্রিয় কার্বন-১৪ আইসোটোপের ব্যবহার পুরাতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান এবং আরও বিভিন্ন বিজ্ঞানে।
১৯৬১	মেলভিন কেলভিন (মার্কিন)	উদ্ভিদের কার্বন ডাই-অকসাইড আত্মীকরণ পদ্ধতির উপর গবেষণা
১৯৬২	স্যার জন সি. কেনড্রু (ব্রিটিশ) ম্যাক্স এফ. পেরুটজ (ব্রিটিশ, অস্ট্রিয়ায় জন্ম)	'গ্লবিউলার প্রোটিন' অণুর গঠন বিষয়ক গবেষণা
১৯৬৩	গিউলিও নাত্তা (ইটালীয়) কার্ল জাইগলার (জার্মান)	'হাই-পলিমার' বিষয়ক রসায়ন এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আবিষ্কার
১৯৬৪	ডরোথি ক্রোফুট হজ্‌কিন (ব্রিটিশ)	গুরুত্বপূর্ণ জৈব-রাসায়নিক অণুর গঠন আবিষ্কারের ক্ষেত্রে একস-রশ্মি পদ্ধতির প্রয়োগ
১৯৬৫	রবার্ট বি. উডওয়ার্ড (মার্কিন)	নানা রকম জটিল রাসায়নিক যৌগের সংশ্লেষণ পদ্ধতি আবিষ্কার
১৯৬৬	রবার্ট এস. মুল্লিকেন (মার্কিন)	'মলেকিউলার অরবিট্যাল' পদ্ধতির সাহায্যে রাসায়নিক 'বণ্ড' এবং অণুর ইলেকট্রনীয় গঠন বিষয়ক গবেষণা
১৯৬৭	ম্যানফ্রেড আইগেন (জার্মান) রোনাল্ড জি. ডব্লু নরিশ (ব্রিটিশ) স্যার জর্জ পোর্টার (ব্রিটিশ)	তাৎক্ষণিক শক্তির (পাল্স অভ্ এনার্জি) প্রয়োগে অতিদ্রুত ঘটে এমন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপর গবেষণা
১৯৬৮	লার্স ওনসাগের (মার্কিন, নরওয়েতে জন্ম)	'থার্মোডায়ানামিক্স অভ্ ইরিভার্সিবল্ প্রসেস'-এর উপর মৌলিক আবিষ্কার

শারীর এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান

সাল	নাম	বিষয়
১৯০১	এমিল এ. ফন বেহ্‌রিং (জার্মান)	সিরাম বিষয়ক চিকিৎসা, বিশেষ করে ডিফথেরিয়ার প্রতিরোধে
১৯০২	স্যার রোনাল্ড রস (ব্রিটিশ)	মানব দেহে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটের সংক্রমণ পদ্ধতি আবিষ্কার
১৯০৩	নিলস আর. ফিনসেন (ডানিশ)	উজ্জ্বল আলোর সাহায্যে ত্বকের টিউবারকিউলোসি চিকিৎসা, বিশেষ করে লিউপাস ভালগারিস রোগ প্রসঙ্গে

সাল	নাম	বিষয়
১৯০৪	আইভান পি. প্যাভলভ (সোভিয়েত)	পরিপাক পদ্ধতিতে শারীরবৃত্তীয় ঘটনার সম্পর্কে গবেষণা
১৯০৫	রবার্ট কচ্ (জার্মান)	টিউবারকিউলোসিস সম্পর্কিত গবেষণা এবং আবিষ্কার
১৯০৬	কামিল্লো গলগি (ইটালীয়) সানতিয়ালো র‍্যামোঁ ওয়াই. কাজাল (স্প্যানিস)	স্নায়ুতন্ত্রের গঠন
১৯০৭	চার্লস এল. এ. লাভেরাঁ (ফ্রান্স)	রোগের ব্যাপারে প্রোটোজোয়ার ভূমিকা
১৯০৮	পল এহ্রলিশ (জার্মান) এলি মেচ্নিকফ্ (ফরাসী, সোভিয়েত দেশে জন্ম)	রোগ প্রতিরোধের উপর গবেষণা
১৯০৯	এমিল টি. কচার (সুইস)	থাইরয়েড গ্ল্যান্ড সম্পর্কিত শারীরবৃত্ত, রোগ এবং শল্য চিকিৎসা
১৯১০	অ্যালব্রেখ্ট কোৎসেল (জার্মান)	কোষ-রসায়ন ; প্রোটিন এবং নিউক্লিয় বস্তু সামগ্রীর সাহায্যে বিশেষ এই বিজ্ঞানের প্রসার
১৯১১	অ্যালভার গুলস্ট্রান্ড (সুইডিশ)	চোখের 'ডাইঅপট্রিকস' বিষয়ক গবেষণা
১৯১২	অ্যালেকসি কারেল (মার্কিন)	ক্ষতস্থান সেলাই, রক্তনালিকা এবং দেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের প্রতিস্থাপনের উপর গবেষণা
১৯১৩	চার্লস আর রিচেত্ (ফরাসী)	ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং অ্যালার্জি
১৯১৪	রবার্ট বারানি (হাঙ্গেরীয়)	অন্তর্কর্ণের শারীরবৃত্ত এবং রোগ।
১৯১৫-১৮	পুরস্কার দেওয়া হয় নি।	
১৯১৯	জুলে বোর্দে (বেলজিয়ান)	রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক আবিষ্কার
১৯২০	শাক এ এফ ক্রঘ ডেনিশ)	ক্যাপিলারি মোটর রেগুলেটিং পদ্ধতি আবিষ্কার
১৯২১	পুরস্কার দেওয়া হয় নি।	
১৯২২	আর্কিবল্ড ডি. হিল (ব্রিটিশ)	পেশীতে তাপ সঞ্চারের কারণ আবিষ্কার
	অটো এফ. মায়ারহফ্ (জামান)	পেশীতে অক্সিজেন এবং ল্যাকটিক অ্যাসিডের পারস্পরিক বিপাকীয় সম্পর্কে আবিষ্কার
১৯২৩	ফ্রেডরিক জি বানটিং (ক্যানাডিয়ান) জন জে আর ম্যাকলিওড (ক্যানাডিয়ান)	ইনসুলিন আবিষ্কার

সাল	নাম	বিষয়
১৯২৪	ভিলেম আইনটোভেন (ডাচ্)	ইলেকট্রোকার্ডিয়োগ্রামের পদ্ধতি আবিষ্কার
১৯২৫	পুরস্কার দেওয়া হয় নি।	
১৯২৬	জোহানেস এ. জি ফিবিগার (ড্যানিস)	ইঁদুরে ক্যানসারের অনুরূপ রোগ সৃষ্টি
১৯২৭	জুলিয়াস ভ্যাগনার-জাউরেগ (অস্ট্রিয়ান)	সিফিলিস সম্পর্কিত মানসিক রোগ এবং পক্ষাঘাত চিকিৎসায় ম্যালেরিয়ার ইনজেকশন
১৯২৮	চার্লস জে. এইচ. নিকোল (ফরাসী)	টাইফাস রোগের উপর গবেষণা
১৯২৯	ক্রিশ্চিয়ান আইসম্যান (ডাচ্)	ভিটামিন বি-এর অভাবে শরীরের ক্ষতি ;
	স্যার ফ্রেডরিক জি হপকিনস (ব্রিটিশ)	দেহের বৃদ্ধিকারী ভিটামিন আবিষ্কার।
১৯৩০	কার্ল ল্যান্ডস্টাইনার (মার্কিন, অস্ট্রিয়ায় জন্ম)	মানব রক্তের শ্রেণীবিভাগ
১৯৩১	অটো এইচ, ভারবুর্গ (জার্মান)	শ্বসনে সাহায্যকারী এনজাইম সমূহের প্রকৃতি এবং কার্যাবলীর উপর গবেষণা
১৯৩২	এডগার ডি আদ্রে* (ব্রিটিশ) স্যার চার্লস এস. শেরিংটন (ব্রিটিশ)	স্নায়ু-কোষের কার্যাবলী সম্পর্কিত আবিষ্কার
১৯৩৩	টমাস এইচ. মরগ্যান (মার্কিন)	বংশগতির ক্ষেত্রে ক্রোমোসোমের ভূমিকা
১৯৩৪	জর্জ আর মিনোট (মার্কিন) উইলিয়াম পি. মারফি (মার্কিন) জর্জ এইচ. হুইপ্‌ল (মার্কিন)	রক্তস্বল্পতা রোগ চিকিৎসায় লিভারের ব্যবহার
১৯৩৫	হানস্ স্পেমান (জার্মান)	ভ্রূণের বিকাশ সাধনে 'অরগ্যানাইজার এফেক্ট' আবিষ্কার।
১৯৩৬	স্যার হেনরি এইচ. ডেল (ব্রিটিশ) অটো লোয়েভি (মার্কিন অস্ট্রিয়ায় জন্ম)	স্নায়ুর স্পন্দন পরিবাহিতায় রাসায়নিক অণুর ভূমিকা
১৯৩৭	অ্যালবার্ট জেন্ট-গিওর্গি ফন্ নাগিরাপলট্ (মার্কিন, হাঙ্গেরীতে জন্ম)	শরীরের বিপাকীয় কাজে ভিটামিন-সি এবং ফিউমারিক অ্যাসিডের ভূমিকা
১৯৩৮	কর্নেল্লে জে. এফ. হেমানস (বেলজিয়ান)	শ্বাসকার্য পরিচালনায় 'সাইনাস' এবং 'অ্যাওরটিক'-এর কার্যাবলী।
১৯৩৯	গেরহার্ড ডোমাগ্ক (জার্মান)	ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ নিরাময়ে 'প্রনটোসিল' নামক ওষুধের ভূমিকা। (রাজনৈতিক চাপে পুরস্কার নেন নি)

সাল	নাম	বিষয়
১৯৪০-৪২	পুরস্কার দেওয়া হয় নি।	
১৯৪৩	হেনরিক সি. পি. ডাম (ডেনিশ)	ভিটামিন কে আবিষ্কার
	এডোয়ার্ড এ. ডয়সি (মার্কিন)	ভিটামিন-কে'র রাসায়নিক ধর্ম আবিষ্কার
১৯৪৪	জোসেফ্ আরল্যাঙ্গার (মার্কিন)	একক স্নায়ুতন্তুর বিশদ কার্যাবলী।
	হার্বার্ট এস. গাৎসের (মার্কিন)	
১৯৪৫	স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং (ব্রিটিশ)	পেনিসিলিন এবং বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে তার ভূমিকা আবিষ্কার
	আর্নস্ট বি চেইন (ব্রিটিশ, জার্মানিতে জন্ম)	
	স্যার হাওয়ার্ড ডব্লু. ফ্লোরি (ব্রিটিশ, অস্ট্রিয়ায় জাত)	
১৯৪৬	হারম্যান জে. মুলার (আমেরিকান)	এক্স-রশ্মির সাহায্যে 'মিউটেশন'
১৯৪৭	কার্ল এফ. কোরি (মার্কিন, চেক্ বংশ)	অনুঘটক পদ্ধতি গ্লাইকোজেনের রূপান্তর
	গোর্টি টি. কোরি (মার্কিন, চেক্ বংশ)	
	বার্নাদো এ. হাউসে (আর্জেনটাইন)	
১৯৪৮	পল এইচ মুলার (সুইস্)	কীট নাশক হিসেবে 'ডি ডি টি'র ক্ষমতা
১৯৪৯	ওয়ালটার আর হেস্ (সুইস্)	শরীরের অন্তর্বর্তী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ কর্ম চালানর ব্যাপারে মস্তিস্কের বিভিন্ন অংশের ভূমিকা
	আনতোনিও মোনিজ (পর্তুগীজ)	কোন কোন 'সাইকোসিস' রোগের ক্ষেত্রে 'প্রিফ্রন্ট্যাল লোবোটমি'র ভূমিকা কী, তা আবিষ্কার
১৯৫০	ফিলিপ এস. হেন্‌চ (মার্কিন)	'অ্যাড্রিনাল করটেক্স' সম্পর্কিত হরমোন আবিষ্কার এবং তাদের রাসায়নিক গঠন ও জৈবিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা
	এডোয়ার্ড সি. কেনডল (মার্কিন)	
	টাডিউস রাইখস্টাইন (সুইস, পোল্যান্ডে জন্ম)	
১৯৫১	ম্যাক্স থেলার (মার্কিন, দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্ম)	পীত জ্বর সম্পর্কিত আবিষ্কার এবং তার নিরাময়

সাল	নাম	বিষয়
১৯৫২	সেলমান এ. ওয়াকসমান (মার্কিন)	স্ট্রেপ্টোমাইসিন আবিষ্কার, টিবি'র প্রথম অ্যান্টিবাইওটিক ওষুধ
১৯৫৩	হানস এ. ক্রেবস (ব্রিটিশ, জার্মানিতে জন্ম)	সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র আবিষ্কার
	ফ্রিটজ এ. লিপমান (মার্কিন, জার্মানীতে জন্ম)	কোএনজাইম-এর আবিষ্কার এবং বিপাকীয় কাজকর্মে তার ভূমিকা
১৯৫৪	জন এফ. এনডারস (মার্কিন) টমাস এইচ. ওয়েলার (মার্কিন) ফ্রেডারিক সি. রবিনস (মার্কিন)	গবেষণাগারে বিভিন্ন কোষকলার কালচার-এ 'পোলিওমাইয়েলাইটিস'এ ভাইরাস-এর বংশবৃদ্ধি করার পদ্ধতি আবিষ্কার
১৯৫৫	অ্যালক্স এইচ. টি. থিওরেল (সুইডিস)	'অক্সিডেশন এনজাইম' বিষয়ক আবিষ্কার
১৯৫৬	আঁদ্রে এফ. কোরনাদ (মার্কিন, ফ্রান্সে জন্ম) ভারনার ফরৎসম্যান (জার্মান) ডিকিনসন ডব্লু. রিচার্ডস জুনিয়ার (মার্কিন)	হৃদপিণ্ডের চিকিৎসায় 'ক্যাথেটার'-এর ব্যবহার এবং রক্তসঞ্চালনে রোগসংক্রান্ত পরিবর্তন (প্যাথোলজিক্যাল চেঞ্জেস)
১৯৫৭	দানিয়েল বভেত (ইটালিয়, সুইস, বংশ)	কয়েকটি রাসায়নিক যোগের সংশ্লেষণ যা শরীরে কোন কোন বস্তু উৎপাদনে বাধা দেয়
১৯৫৮	জর্জ ডব্লু বিডল্ (মার্কিন) এডোয়ার্ড এল. টাটুন (মার্কিন) জোহুয়া লেডারব্যার্গ (মার্কিন)	শরীরে নির্দিষ্ট রাসায়নিক কাজকর্ম চালনার ব্যাপারে 'জিন'-এর নির্দিষ্ট ভূমিকা আবিষ্কার
১৯৫৯	আর্থার কর্নবার্গ (মার্কিন) সিভেরো ওকোয়া (মার্কিন, স্পেনে জন্ম)	জৈবিক পদ্ধতিতে 'আর এন এ' এবং 'ডি এন এ'র সংশ্লেষণ পদ্ধতি আবিষ্কার
১৯৬০	স্যার এফ. ম্যাকফারলেন বার্নেট (অস্ট্রেলিয়ান), পিটার বি. মেডওয়ার (ব্রিটিশ, ব্রাজিলে জন্ম)	রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আয়ত্তকরণ কী ভাবে ঘটে তার উপর গবেষণা
১৯৬১	জর্জ ফন্ বেকেসি (মার্কিন, হাঙ্গেরীতে জন্ম)	অন্তঃকর্ণের 'কক্লিয়া' (cochlea শব্দ সংবেদী যন্ত্র) কী ভাবে উদ্দীপ্ত হয় এবং কাজ করে তার উপর আবিষ্কার
১৯৬২	ফ্রান্সিস এইচ. সি. ক্রিক (ব্রিটিশ), জেমস ডি, ওয়াটসন (মার্কিন), মরিস এইচ. এফ. উইলকিনস (ব্রিটিশ)	নিউক্লিয়ার অ্যাসিডের আণবিক গঠন আবিষ্কার ও জীবদেহে জৈবিক বার্তা সরবরাহের ব্যাপারে তার তাৎপর্য কী সে সম্পর্কে আবিষ্কার

সাল	নাম	বিষয়
১৯৬৩	স্যার জন সি. এক্‌কল্‌স (অস্ট্রেলিয়ন), অ্যালান এল. হজকিন (ব্রিটিশ), অ্যানড্র, এফ হাক্‌সলে (ব্রিটিশ)	স্নায়ু কোষের আবরণ সংক্রান্ত আবিষ্কার
১৯৬৪	কনার্ড এ. ব্লক (মার্কিন) ফিওডোর লিনেন (জার্মান)	কোলেস্টারোল এবং ফ্যাটি-অ্যাসিড সম্পর্কিত বিপাকীয় কাজকর্ম কী ভাবে চলে তার উপর গবেষণা
১৯৬৫	ফ্রাঙ্কোইস জেকব (ফরাসী) আঁদ্রে লাউফ (ফরাসী) জাকুয়েস মনদ (ফরাসী)	জীব কোষের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, যা এনজাইম এবং ভাইরাস সংশ্লেষণে 'জিন'-র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বুঝে নিতে সাহায্য করেছে
১৯৬৬	চার্লস বি. হাগিনস্ (মার্কিন)	হরমোনের সাহায্যে প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ডের ক্যানসার চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার
	ফ্রান্সি পেটন রাউস (মার্কিন)	মুরগির দেহে টিউমার সৃষ্টিকারী ভাইরাসের উপর গবেষণা। ক্যানসার সৃষ্টির মূলে ভাইরাসও যে কাজ করে এই গবেষণার সাহায্যে তিনি তা আবিষ্কার করেছেন
১৯৬৭	রাগনার গ্রানিট (সুইডিস, ফিনল্যান্ড জন্ম) হলডেন কেফার হার্টলাইন (মার্কিন) জর্জ ওয়াল্ড (মার্কিন)	রাসায়নিক বস্তু এবং দৃষ্টির ব্যাপারে শারীরবৃত্তীয় ঘটনাবলীর সম্পর্ক
১৯৬৮	রবার্ট ডব্লু. হোলি (মার্কিন) হরগোবিন্দ খোরানা (মার্কিন, ভারতীয় বংশধর) মার্শাল ডব্লু. নিরেনবার্গ (মার্কিন)	'জেনেটিক কোড'-এর ব্যাখ্যা করে জীব কোষের কার্যাবলী বিশ্লেষণ

১৯৬৯—১৯৮২ সাল পর্যন্ত নোবেল পুরস্কার প্রাপকদের সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।